শ্রীইন্দিরা দেবী
২৭শে নভেম্বর ১৯৩৭

কালান্তর

কালান্তর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগ
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা

কালান্তর

প্রথম সংস্করণ বৈশাখ, ১৩৪৪

মূল্য—১৷৽

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন (বীরভূম)।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচী

কালান্তর

কালান্তর

একদিন চণ্ডীমণ্ডপে আমাদের আখড়া বসত, আলাপ জমত পাড়া-পড়শিদের জুটিয়ে, আলোচনার বিষয় ছিল গ্রামের সীমার মধ্যেই বদ্ধ। পরস্পরকে নিয়ে রাগদ্বেষে গল্পেগুজবে তাসেপাশায় এবং তার সঙ্গে ঘণ্টা তিনচার পরিমাণে দিবানিদ্রা মিশিয়ে দিনটা যেত কেটে। তার বাইরে মাঝে মাঝে চিত্তানুশীলনার যে আয়োজন হোত সে ছিল যাত্রা সংকীর্ত্তন কথকতা রামায়ণপাঠ পাঁচালি কবিগান নিয়ে। তার বিষয়বস্তু ছিল পুরাকাহিনী-ভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত। যে জগতের মধ্যে বাস সেটা সঙ্কীর্ণ এবং অতিপরিচিত। তার সমস্ত তথ্য এবং রসধারা বংশানুক্রমে বৎসরে বৎসরে বারবার হয়েছে আবর্ত্তিত অপরিবর্ত্তিত চক্রপথে, সেইগুলিকে অবলম্বন ক'রে আমাদের জীবনযাত্রার সংস্কার নিবিড় হয়ে জমে উঠেছে, সেই সকল কঠিন সংস্কারের ইঁটপাথর দিয়ে আমাদের বিশেষ সংসারের নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হয়ে গিয়েছিল। এই সংসারের বাইরে মানবব্রহ্মাণ্ডের দিক্‌দিগন্তে বিরাট ইতিহাসের অভিব্যক্তি নিরন্তর চলেছে, তার ঘূর্ণ্যমান নীহারিকা আদ্যোপান্ত সনাতন প্রথায় ও শাস্ত্রবচনে চিরকালের মতো স্থাবর হয়ে

ওঠেনি, তার মধ্যে এক অংশের সঙ্গে আর এক অংশের ঘাত সংঘাতে নব নব সমস্যার সৃষ্টি হচ্চে, ক্রমাগতই তাদের পরস্পরের সীমানার সঙ্কোচন-প্রসারণে পরিবর্ত্তিত হচ্চে ইতিহাসের রূপ, এ আমাদের গোচর ছিল না।

বাইরে থেকে প্রথম বিরুদ্ধ আঘাত লাগল মুসলমানের। কিন্তু সে মুসলমানও প্রাচীন প্রাচ্য, সেও আধুনিক নয়। সেও আপন অতীত শতাব্দীর মধ্যে বদ্ধ। বাহুবলে সে রাজ্য সংঘটন করেছে কিন্তু তার চিত্তের সৃষ্টিবৈচিত্র্য ছিল না। এইজন্যে সে যখন আমাদের দিগন্তের মধ্যে স্থায়ী বাসস্থান বাঁধলে, তখন তার সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ ঘটতে লাগল—কিন্তু সে সংঘর্ষ বাহ্য, এক চিরপ্রথার সঙ্গে আর-এক চিরপ্রথার, এক বাঁধা মতের সঙ্গে আরএক বাঁধা মতের। রাষ্ট্রপ্রণালীতে মুসলমানের প্রভাব প্রবেশ করেছে, চিত্তের মধ্যে তার ক্রিয়া সর্ব্বতোভাবে প্রবল হয়নি, তারই প্রমাণ দেখি সাহিত্যে। তখনকার ভদ্রসমাজে সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল পার্সি, তবু বাংলা কাব্যের প্রকৃতিতে এই পার্সি বিদ্যার স্বাক্ষর পড়েনি—একমাত্র ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে মার্জ্জিত ভাষায় ও অস্খলিত ছন্দে যে নাগরিকতা প্রকাশ পেয়েছে তাতে পার্সি-পড়া স্মিত-পরিহাসপটু বৈদগ্ধ্যের আভাস পাওয়া যায়। তখনকার বাংলা সাহিত্যের প্রধানত দুই ভাগ ছিল, এক মঙ্গলকাব্য আর-এক বৈষ্ণব পদাবলী। মঙ্গলকাব্যে মাঝে মাঝে মুসলমান রাজ্যশাসনের বিবরণ আছে কিন্তু তার বিষয়বস্তু কিম্বা মনস্তত্ত্বে মুসলমান সাহিত্যের কোনো ছাপ দেখিনে, বৈষ্ণব গীতিকাব্যে তো কথাই নেই। অথচ বাংলা ভাষায় পার্সি শব্দ জমেছে বিস্তর, তা ছাড়া সেদিন অন্তত সহরে রাজধানীতে পারসিক আদবকায়দার যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল। তখনকার কালে দুই সনাতন বেড়া-দেওয়া সভ্যতা ভারতবর্ষে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে,—পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে।

তাদের মধ্যে কিছুই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয়নি তা নয় কিন্তু তা সামান্য। বাহুবলের ধাক্কা দেশের উপরে খুব জোরে লেগেছে, কিন্তু কোনো নতুন চিন্তারাজ্যে কোনো নতুন সৃষ্টির উদ্যমে তার মনকে চেতিয়ে তোলেনি। তা ছাড়া আরো একটা কথা আছে। বাহির থেকে মুসলমান হিন্দুস্থানে এসে স্থায়ী বাসা বেঁধেছে কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকে বাহিরের দিকে প্রসারিত করেনি। তারা ঘরে এসে ঘর দখল করে বসল, বন্ধ করে দিলে বাহিরের দিকে দরজা। মাঝে মাঝে সেই দরজা-ভাঙাভাঙি চলেছিল কিন্তু এমন কিছু ঘটেনি যাতে বাহিরের বিশ্বে আমাদের পরিচয় বিস্তারিত হোতে পাবে। সেইজন্য পল্লীর চণ্ডীমণ্ডপেই রয়ে গেল আমাদের প্রধান আসর।

তার পরে এল ইংরেজ, কেবল মানুষরূপে নয়, নব্য য়ুরোপের চিত্তপ্রতীকরূপে। মানুষ জোড়ে স্থান, চিত্ত জোড়ে মনকে। আজ মুসলমানকে আমরা দেখি সংখ্যারূপে,—তারা সম্প্রতি আমাদের রাষ্ট্রিক ব্যাপারে ঘটিয়েছে যোগ বিয়োগের সমস্যা। অর্থাৎ এই সংখ্যা আমাদের পক্ষে গুণের অঙ্কফল না ক'ষে ভাগেরই অঙ্কফল কষছে। দেশে এরা আছে অথচ রাষ্ট্রজাতিগত ঐক্যের হিসাবে এরা না থাকার চেয়েও দারুণতর—তাই ভারতবর্ষের লোকসংখ্যাতালিকাই তার অতিবহুলত্ব নিয়ে সব চেয়ে শোকাবহ হয়ে উঠল।

ইংরেজের আগমন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিচিত্র ব্যাপার। মানুষ হিসাবে তারা রইল মুসলমানদের চেয়েও আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে—কিন্তু য়ুরোপের চিত্তদূতরূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীর ভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আর কোনো বিদেশী জাত কোনোদিন এমন করে আসতে পারেনি। য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে

বৃষ্টিধারা মাটির 'পরে; ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হোতে থাকে। এই চেষ্টা যে-ভূখণ্ডে একেবারে না ঘটে সেটা মরুভূমি, তার যে একান্ত অনন্যযোগিতা সে তো মৃত্যুর ধর্ম্ম। আমরা য়ুরোপের কার কাছ থেকে কী কতটুকু পেয়েছি তাই অতি সূক্ষ্ম বিচারে চুনে চুনে অনেক পরিমাণে কল্পনা ও কিছু পরিমাণে গবেষণা বিস্তার ক'রে আজকাল কোনো কোনো সমালোচক আধুনিক লেখকের প্রতি কলম উদ্যত ক'রে নিপুণ ভঙ্গীতে খোঁটা দিয়ে থাকেন। একদা রেনেসাঁসের চিত্তবেগ ইটালি থেকে উদ্বেল হয়ে সমস্ত য়ুরোপের মনে যখন প্রতিহত হয়েছিল তখন ইংলণ্ডের সাহিত্যস্রষ্টাদের মনে তার প্রভাব যে নানারূপে প্রকাশ পেয়েছে সেটা কিছুই আশ্চর্য্যের কথা নয়, না হোলেই সেই দৈন্যকে বর্ব্বরতা বলা যেত। সচল মনের প্রভাব সজীব মন না নিয়ে থাকতেই পারে না—এই দেওয়া-নেওয়ার প্রবাহ সেইখানেই নিয়ত চলেছে যেখানে চিত্ত বেঁচে আছে চিত্ত জেগে আছে।

বর্ত্তমান যুগের চিত্তের জ্যোতি পশ্চিম দিগন্ত থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে মানব-ইতিহাসের সমস্ত আকাশ জুড়ে উদ্ভাসিত, দেখা যাক তার স্বরূপটা কী। একটা প্রবল উদ্যমের বেগে য়ুরোপের মন ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত পৃথিবীতে, শুধু তাই নয় সমস্ত জগতে। যেখানেই সে পা বাড়িয়েছে সেইখানটাই সে অধিকার করেছে। কিসের জোরে? সত্য সন্ধানের সততায়। বুদ্ধির আলস্যে, কল্পনার কুহকে, আপাতপ্রতীয়মান সাদৃশ্যে, প্রাচীন পাণ্ডিত্যের অন্ধ অনুবর্ত্তনায় সে আপনাকে ভোলাতে চায়নি, মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যা বিশ্বাস ক'রে নিশ্চিন্ত থাকতে চায় তার প্রলোভনকেও সে নির্ম্মমভাবে দমন করেছে। নিজের সহজ ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গত ক'রে সত্যকে সে যাচাই করেনি। প্রতিদিন জয় করেছে

সে জ্ঞানের জগৎকে, কেননা তার বুদ্ধির সাধনা বিশুদ্ধ, ব্যক্তিগত মোহ থেকে নির্ম্মুক্ত।

যদিও আমাদের চারদিকে আজও পঞ্জিকার প্রাচীর খোলা আলোর প্রতি সন্দেহ উদ্যত করে আছে, তবু তার মধ্যে ফাঁক ক'রে য়ুরোপের চিত্ত আমাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছে, আমাদের সামনে এনেছে জ্ঞানের বিশ্বরূপ, মানুষের বুদ্ধির এমন একটা সর্ব্বব্যাপী ঔৎসুক্য আমাদের কাছে প্রকাশ করেছে, যা অহৈতুক আগ্রহে নিকটতম দূরতম অণুতম বৃহত্তম প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সমস্তকেই সন্ধান সমস্তকেই অধিকার করতে চায়; এইটে দেখিয়েছে যে, জ্ঞানের রাজ্যে কোথাও ফাঁক নেই, সকল তথ্যই পরস্পর অচ্ছেদ্যসূত্রে গ্রথিত, চতুরানন বা পঞ্চাননের কোনো বিশেষ বাক্য বিশ্বের ক্ষুদ্রতম সাক্ষীর বিরুদ্ধে আপন অপ্রাকৃত প্রামাণিকতা দাবী করতে পারে না।

বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে যেমন, তেমনি চরিত্রনীতি সম্বন্ধেও। নতুন শাসনে যে-আইন এল তার মধ্যে একটি বাণী আছে, সে হচ্চে এই যে, ব্যক্তিভেদে অপরাধের ভেদ ঘটে না। ব্রাহ্মণই শূদ্রকে বধ করুক বা শূদ্রই ব্রাহ্মণকে বধ করুক, হত্যা-অপরাধের পংক্তি একই, তার শাসনও সমান,—কোনো মুনিঋষির অনুশাসন ন্যায়-অন্যায়ের কোনো বিশেষ সৃষ্টি প্রবর্ত্তন করতে পারে না।

সমাজে উচিত-অনুচিতের ওজন, শ্রেণীগত অধিকারের বাট্‌খারা-যোগে আপন নিত্য আদর্শের তারতম্য ঘটাতে পারবে না, এ-কথাটা এখনো আমরা সর্ব্বত্র অন্তরে অন্তরে মেনে নিতে পেরেছি তা নয়, তবু আমাদের চিন্তায় ও ব্যবহারে অনেকখানি বিপ্লব এনেছে সন্দেহ নেই। সমাজ যাদের অস্পৃশ্যশ্রেণীতে গণ্য করেছে তাদেরও আজ দেবালয়-প্রবেশে বাধা দেওয়া উচিত নয়, এই আলোচনাটা তার প্রমাণ। যদিও একদল

লোক নিত্যধর্ম্মনীতির উপর ভর না দিয়ে এর অনুকূলে শাস্ত্রের সমর্থন আওড়াচ্চেন,তবু সেই আপ্তবাক্যের ওকালতিটাই সম্পূর্ণ জোর পাচ্চে না। আসল এই কথাটাই দেশের সাধারণের মনে বাজছে যে, যেটা অন্যায় সেটা প্রথাগত, শাস্ত্রগত বা ব্যক্তিগত গায়ের জোরে শ্রেয় হোতে পারে না, শঙ্করাচার্য্য উপাধিধারীর স্বরচিত মার্কা সত্বেও সে শ্রদ্ধেয় নয়।

মুসলমান আমলের বাংলা সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি করলে দেখা যায় যে, অবাধে অন্যায় করবার অধিকারই যে ঐশ্বর্য্যের লক্ষণ এই বিশ্বাসটা কলুষিত করেছে তখনকার দেবচরিত্রকল্পনাকে। তখনকার দিনে যেমন অত্যাচারের দ্বারা প্রবল ব্যক্তি আপন শাসন পাকা করে তুল্‌ত, তেমনি ক'রে অন্যায়ের বিভীষিকায় দেবদেবীর প্রতিপত্তি আমরা কল্পনা করেছি। সেই নিষ্ঠুর বলের হার-জিতেই তাঁদের শ্রেষ্ঠতা অশ্রেষ্ঠতার প্রমাণ হোত। ধর্ম্মের নিয়ম মেনে চলবে সাধারণ মানুষ, সেই নিয়মকে লঙ্ঘন করবার দুর্দ্দাম অধিকার অসাধারণেব। সন্ধিপত্রের সর্ত্ত অনুসারে আপনাকে সংযত করা আবশ্যক সত্যরক্ষা ও লোকস্থিতির খাতিরে, কিন্তু প্রতাপের অভিমান তাকে স্ক্র্যাপ্ অফ্ পেপারের মতো ছিন্ন করবার স্পর্দ্ধা রাখে। নীতিবন্ধন-অসহিষ্ণু অধর্ম্মসাহসিকতার ঔদ্ধত্যকে একদিন ঈশ্বরত্বের লক্ষণ ব'লে মানুষ স্বীকার কবেছে। তখনকার দিনে প্রচলিত দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা, এই কথাটার অর্থ এই যে জগদীশ্বরের জগদীশ্বরতা তাঁর অপ্রতিহত শক্তির প্রমাণে, ন্যায়পরতার বিধানে নয়, সেই পন্থায় দিল্লীশ্বরও জগদীশ্বরের তুল্য খ্যাতিব অধিকারী। তখন ব্রাহ্মণকে বলেছে ভূদেব, তার দেবত্বে মহত্বের অপরিহার্য্য দায়িত্ব নেই, আছে অকারণ শ্রেষ্ঠতার নিরর্থক দাবী। এই অকারণ শ্রেষ্ঠতা ন্যায়-অন্যায়ের উপরে, তার প্রমাণ দেখি স্মৃতিশাস্ত্রে, শূদ্রের প্রতি অধর্ম্মাচরণ করবার অব্যাহত অধিকারে। ইংরেজ সাম্রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের চেয়েও প্রবল

ও ব্যাপক সন্দেহ নেই, কিন্তু এমন কথা কোনো মূঢ়ের মুখ দিয়ে বেরোতে পারে না যে উইলিঙডনো বা জগদীশ্বরো বা। তার কারণ আকাশ থেকে বোমাবর্ষণে শত্রুপল্লী-বিধ্বংসনের নির্ম্মম শক্তির দ্বারা ঈশ্বরত্বের আদর্শের তুল্যতা আজ কেউ পরিমাপ করে না। আজ আমরা মরতে মরতেও ইংরেজ শাসনের বিচার করতে পারি ন্যায়-অন্যায়ের আদর্শে, এ-কথা মনে করিনে, কোনো দোহাই পেড়ে শক্তিমানকে অসংযত শক্তি সংহরণ করতে বলা অশক্তের পক্ষে স্পর্দ্ধা। বস্তুত ন্যায়-আদর্শের সর্ব্বভূমিনতা স্বীকার ক'রে এক জায়গায় ইংরেজরাজের প্রভূত শক্তি আপনাকে অশক্তের সমানভূমিতেই দাঁড় করিয়েছে।

যখন প্রথম ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হোলো তখন সুধু যে তার থেকে আমরা অভিনব রস আহরণ করেছিলেম তা নয়, আমরা পেয়েছিলেম মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করবার আগ্রহ, শুনতে পেয়েছিলেম রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খল মোচনের ঘোষণা, দেখেছিলেম বাণিজ্যে মানুষকে পণ্যে পরিণত করার বিরুদ্ধে প্রয়াস। স্বীকার করতেই হবে আমাদের কাছে এই মনোভাবটা নূতন। তৎপূর্ব্বে আমরা মেনে নিয়েছিলুম যে জন্মগত নিত্য বিধানে বা পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে বিশেষ জাতের মানুষ আপন অধিকারের খর্ব্বতা আপন অসম্মান শিরোধার্য্য ক'রে নিতে বাধ্য, তার হীনতার লাঞ্ছনা কেবলমাত্র দৈবক্রমে ঘুচতে পারে জন্মপরিবর্ত্তনে। আজও আমাদের দেশে শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে বহুলোক রাষ্ট্রীয় অগৌরব দূর করার জন্যে আত্মচেষ্টা মানে, অথচ সমাজবিধির দ্বারা অধঃকৃতদেরকে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে আত্মাবমাননা স্বীকার করতে বলে; এ-কথা ভুলে যায় যে ভাগ্যনির্দ্দিষ্ট বিধানকে নির্বিরোধে মানবার মনোবৃত্তিই রাষ্ট্রিক পরাধীনতার শৃঙ্খলকে হাতে পায়ে এঁটে রাখবার কাজে সকলের চেয়ে

প্রবলশক্তি। য়ুরোপের সংস্রব একদিকে আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্য্যকারণবিধির সার্ব্বভৌমিকতা, আর একদিকে ন্যায় অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্ত্রবাক্যের নির্দ্দেশে, কোনো চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হোতে পারে না। আজ আমরা সকল দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও আমাদের রাষ্ট্রজাতিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্যে যে-কোনো চেষ্টা করছি, সে এই তত্ত্বের উপরে দাঁড়িয়ে, এবং যে সকল দাবী আমরা কোনোদিন মোগলসম্রাটের কাছে উত্থাপন করবার কল্পনাও মনে আনতে পারিনি, তাই নিয়ে প্রবল রাজশাসনের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বিরোধ বাধিয়েছি এই তত্ত্বেরই জোরে যে-তত্ত্ব কবিবাক্যে প্রকাশ পেয়েছে—"A man is a man for a' that"।

আজ আমার বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। বর্ত্তমান যুগে—অর্থাৎ যাকে য়ুরোপীয় যুগ বলতেই হবে, সেই যুগে যখন প্রথম প্রবেশ করলুম সময়টা তখন আঠারো শো খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি। এইটিকে ভিক্টোরীয় যুগ নাম দিয়ে এখনকার যুবকেরা হাসাহাসি ক'রে থাকে। য়ুরোপের যে-অংশের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ, সেই ইংলণ্ড তখন ঐশ্বর্য্যের ও রাষ্ট্রীয় প্রতাপের উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত। অনন্তকালে কোনো ছিদ্র দিয়ে তার অন্নভাণ্ডারে যে অলক্ষ্মী প্রবেশ করতে পারে, এ-কথা কেউ সেদিন মনেও করেনি। প্রাচীন ইতিহাসে যাই ঘটে থাকুক, আধুনিক ইতিহাসে যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার কর্ণধার তাদের সৌভাগ্য যে কোনো-দিন পিছু হঠতে পারে, বাতাস বইতে পারে উল্‌টো দিকে, তার কোনো আশঙ্কা ও লক্ষণ কোথাও ছিল না। রিফর্ম্মেশন্ যুগে, ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশন যুগে য়ুরোপ যে-মতস্বাতন্ত্র্যের জন্যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্যে লড়েছিল, সেদিন তার সেই আদর্শে বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয়নি। সেদিন আমেরিকার

যুক্তরাষ্ট্রে ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ বেধেছিল দাসপ্রথার বিরুদ্ধে। ম্যাট্‌সিনি-গারিবালডির বাণীতে কীর্ত্তিতে সেই যুগ ছিল গৌরবান্বিত, সেদিন তুর্কির সুলতানের অত্যাচারকে নিন্দিত ক'রে মন্দ্রিত হয়েছিল গ্ল্যাড্‌স্টোনের বজ্রস্বর। আমরা সেদিন ভারতের স্বাধীনতার প্রত্যাশা স্পষ্টভাবে লালন করতে আরম্ভ করেছি। সেই প্রত্যাশার মধ্যে একদিকে যেমন ছিল ইংরেজের প্রতি বিরুদ্ধতা, আর একদিকে ইংরেজচরিত্রের প্রতি অসাধারণ আস্থা। কেবলমাত্র মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়ে ভারতের শাসনকর্ত্তৃত্বে ইংরেজের সরিক হোতেও পারি এমন কথা মনে করা যে সম্ভব হয়েছিল—সেই জোর কোথা থেকে পেয়েছিলেম! কোন্ যুগ থেকে সহসা কোন্ যুগান্তরে এসেছি? মানুষের মূল্য, মানুষের শ্রদ্ধেয়তা হঠাৎ এত আশ্চর্য্য বড়ো হয়ে দেখা দিল কোন্ শিক্ষায়! অথচ আমাদের নিজের পরিবারে প্রতিবেশে, পাড়ায় সমাজে, মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বা সম্মানের দাবী, শ্রেণীনির্ব্বিচারে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের সমান অধিকারতত্ত্ব এখনো সম্পূর্ণরূপে আমাদের চরিত্রে প্রবেশ করতে পারেনি। তা হোক্ আচরণে পদে পদে প্রতিবাদসত্ত্বেও য়ুরোপের প্রভাব অল্পে অল্পে আমাদের মনে কাজ করছে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসম্বন্ধেও ঠিক সেই একই কথা। পাঠশালার পথ দিয়ে বিজ্ঞান এসেছে আমাদের দ্বারে, কিন্তু ঘরের মধ্যে পাঁজিপুঁথি এখনো তার সম্পূর্ণ দখল ছাড়েনি। তবু য়ুরোপের বিদ্যা প্রতিবাদের মধ্য দিয়েও আমাদের মনের মধ্যে সম্মান পাচ্চে।

তাই ভেবে দেখলে দেখা যাবে এই যুগ য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের গভীর সহযোগিতারই যুগ। বস্তুত যেখানে তার সঙ্গে আমাদের চিত্তের, আমাদের শিক্ষার অসহযোগ সেইখানেই আমাদের পরাভব। এই সহযোগ সহজ হয়, যদি আমাদের শ্রদ্ধায় আঘাত না লাগে। পূর্ব্বেই

বলেছি য়ুরোপের চরিত্রের প্রতি আস্থা নিয়েই আমাদের নবযুগের আরম্ভ হয়েছিল, দেখেছিলুম জ্ঞানের ক্ষেত্রে য়ুরোপ মানুষের মোহমুক্ত বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করেছে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বীকার করেছে তার ন্যায়-সঙ্গত অধিকারকে। এতে করেই সকল প্রকার অভাব-ত্রুটি সত্ত্বেও আমাদের আত্মসম্মানের পথ খুলে গিয়েছে। এই আত্মসম্মানের গৌরব-বোধেই আজ পর্য্যন্ত আমরা স্বজাতিসম্বন্ধে দুঃসাধ্যসাধনের আশা করছি, এবং প্রবল পক্ষকে বিচার করতে সাহস করছি সেই প্রবল পক্ষেরই বিচারের আদর্শ নিয়ে। বলতেই হবে এই চিত্তগত চরিত্রগত সহযোগ ছিল না আমাদের পূর্ব্বতন রাজদরবারে। তখন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের সেই মূলগত দূরত্ব ছিল যাতে ক'রে আমরা আকস্মিক শুভাদৃষ্টক্রমে শক্তিশালীর কাছে কদাচিৎ অনুগ্রহ পেতেও পারতুম, কিন্তু সে তারই নিজ গুণে, বল্‌তে পারতুম না যে সর্ব্বজনীন ন্যায়ধর্ম্ম অনুসারেই, মানুষ ব'লেই মানুষের কাছে আনুকূল্যের দাবী আছে।

ইতিমধ্যে ইতিহাস এগিয়ে চল্‌ল। বহুকালের সুপ্ত এসিয়ায় দেখা দিল জাগরণের উদ্যম। পাশ্চাত্যেরই সংঘাতে সংস্রবে জাপান অতি অল্পকালের মধ্যেই বিশ্বজাতিসংঘের মধ্যে জয় ক'রে নিলে সম্মানের অধিকার। অর্থাৎ জাপান বর্ত্তমান কালের মধ্যেই বর্ত্তমান, অতীতে ছায়াচ্ছন্ন নয়, সে তা সম্যকরূপে প্রমাণ করল। দেখতে পেলেম প্রাচ্য জাতিরা নবযুগের দিকে যাত্রা করেছে। অনেকদিন আশা করেছিলুম, বিশ্বইতিহাসের সঙ্গে আমাদেরও সামঞ্জস্য হবে, আমাদেরও রাষ্ট্রজাতিক রথ চলবে সামনের দিকে, এবং এও মনে ছিল যে এই চলার পথে টান দেবে স্বয়ং ইংরেজও। অনেকদিন তাকিয়ে থেকে অবশেষে দেখলুম চাকা বন্ধ। আজ ইংরেজ শাসনের প্রধান গর্ব্ব ল এবং অর্ডর, বিধি এবং ব্যবস্থা নিয়ে। এই সুবৃহৎ দেশে শিক্ষার বিধান, স্বাস্থ্যের

বিধান অতি অকিঞ্চিৎকর, দেশের লোকের দ্বারা নব নব পথে ধন উৎপাদনের সুযোগ সাধন কিছুই নেই। অদূর ভবিষ্যতে তার যে সম্ভাবনা আছে, তাও দেখতে পাইনে, কেননা দেশের সম্বল সমস্তই তলিয়ে গেল ল এবং অর্ডরের প্রকাণ্ড কবলের মধ্যে। য়ুরোপীয় নবযুগের শ্রেষ্ঠদানের থেকে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হয়েছে য়ুরোপেরই সংস্রবে। নবযুগের সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে কলঙ্কের মতো রয়ে গেল ভারতবর্ষ।

আজ ইংলণ্ড ফ্রান্স জার্ম্মানি আমেরিকার কাছে ঋণী। ঋণের অঙ্ক খুব মোটা। কিন্তু এর দ্বিগুণ মোটাও যদি হোত, তবু সম্পূর্ণ শোধ করা অসাধ্য হোত না, দেনদার দেশে যদি কেবলমাত্র ল এবং অর্ডর বজায় রেখে তাকে আর সকল বিষয়ে বঞ্চিত রাখতে আপত্তি না থাকত। যদি তার অন্নসংস্থান রইত আধপেটা পরিমাণ, তার পানযোগ্য জলের বরাদ্দ হোত সমস্ত দেশের তৃষ্ণার চেয়ে বহুগুণ স্বল্পতর, যদি দেশে শতকরা পাঁচ সাত জন মানুষের মতো শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও চলত, যদি চিরস্থায়ী রোগে প্রজনানুক্রমে দেশের হাড়ে হাড়ে দুর্ব্বলতা নিহিত ক'রে দেওয়া সত্ত্বেও নিশ্চেষ্টপ্রায় থাক্‌ত তার আরোগ্যবিধান। কিন্তু যেহেতু জীবনযাত্রার সভ্য আদর্শ বজায় রাখবার পক্ষে এ-সকল অভাব একেবারেই মারাত্মক, এইজন্যে পাওনাদারকে এমন কথা বলতে শুনলুম যে আমরা দেনাশোধ করব না। সভ্যতার দোহাই দিয়ে ভারতবর্ষ কি এমন কথা বলতে পারে না যে এই প্রাণ-দেউলে-করা তোমাদের দুর্ম্মূল্য শাসনতন্ত্রের এত অসহ্য দেনা আমরা বহন করতে পারব না যাতে বর্ব্বর-দশার জগদ্দল পাথর চিরদিনের মতো দেশের বুকের উপর চেপে থাকে। বর্ত্তমান যুগে য়ুরোপ যে-সভ্যতার আদর্শকে উদ্ভাবিত করেছে য়ুরোপই কি স্বহস্তে তার দাবীকে ভূমণ্ডলের পশ্চিম সীমানাতেই আবদ্ধ ক'রে রাখবে? সর্ব্বজনের সর্ব্বকালের কাছে সেই সভ্যতার মহৎ দায়িত্ব কি য়ুরোপের নেই?

ক্রমে ক্রমে দেখা গেল য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয় মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে। তাই একদিন কামানের গোলা আর আফিমের পিণ্ড একসঙ্গে বর্ষিত হোলো চীনের মর্ম্মস্থানের উপর। ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত এমন সর্ব্বনাশ আর কোনোদিন কোথাও হয়নি,—এক হয়েছিল য়ুরোপীয় সভ্যজাতি যখন নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় স্বর্ণপিণ্ডের লোভে ছলে বলে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ক'রে দিয়েছে "মায়া" জাতির অপূর্ব্ব সভ্যতাকে। মধ্য-যুগে অসভ্য তাতার বিজিত দেশে নরমুণ্ডের স্তূপ উঁচু ক'রে তুলেছিল; তার বেদনা অনতিকালপরে লুপ্ত হয়েছে। সভ্য য়ুরোপ চীনের মতো এত বড়ো দেশকে জোর ক'রে যে বিষ গিলিয়েছে, তাতে চিরকালের মতো তার মজ্জা জর্জ্জরিত হয়ে গেল। একদিন তরুণ পারসিকের দল দীর্ঘকালের অসাড়তার জাল থেকে পারস্যকে উদ্ধার করবার জন্যে যখন প্রাণপণ করে দাঁড়িয়েছিল, তখন সভ্য য়ুরোপ কী রকম ক'রে দুই হাতে তার টুঁটি চেপে ধরেছিল, সেই অমার্জ্জনীয় শোকাবহ ব্যাপার জানা যায় পারস্যের তদানিন্তন পরাহত আমেরিকান রাজস্বসচিব শুস্টারের "Strangling of Persia" বইখানা পড়লে। ওদিকে আফ্রিকার কন্‌গো প্রদেশে য়ুরোপীয় শাসন যে কী রকম অকথ্য বিভীষিকায় পরিণত হয়েছিল সে সকলেরই জানা। আজও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোজাতি সামাজিক অসম্মানে লাঞ্ছিত, এবং সেই জাতীয় কোনো হতভাগ্যকে যখন জীবিত অবস্থায় দাহ করা হয়, তখন শ্বেতচর্ম্মী নরনারীরা সেই পাশব দৃশ্য উপভোগ করবার জন্যে ভিড় করে আসে।

তার পরে মহাযুদ্ধ এসে অকস্মাৎ পাশ্চাত্য ইতিহাসের একটা পর্দ্দা তুলে দিলে। যেন কোন্ মাতালের আব্রু গেল ঘুচে। এত মিথ্যা এত বীভৎস হিংস্রতা নিবিড় হয়ে বহু পূর্ব্বকার অন্ধ যুগে ক্ষণকালের জন্যে

হয়তো মাঝে মাঝে উৎপাত করেছে, কিন্তু এমন ভীষণ উদগ্র মূর্ত্তিতে আপনাকে প্রকাশ করেনি। তা'রা আসত কালো আঁধির মতো ধূলায় আপনাকে আবৃত ক'রে, কিন্তু এ এসেছে যেন অগ্নিগিরির আগ্নেয়স্রাব, অবরুদ্ধ পাপের বাধামুক্ত উৎস উচ্ছ্বাসে দিগ্‌দিগন্তকে রাঙিয়ে তুলে, দগ্ধ ক'রে দিয়ে দূরদূরান্তের পৃথিবীর শ্যামলতাকে। তার পর থেকে দেখছি য়ুরোপের শুভবুদ্ধি আপনার 'পরে বিশ্বাস হারিয়েছে, আজ সে স্পর্দ্ধা ক'রে কল্যাণের আদর্শকে উপহাস করতে উদ্যত। আজ তার লজ্জা গেছে ভেঙে; একদা ইংরেজের সংস্রবে আমরা যে-য়ুরোপকে জানতুম, কুৎসিতের সম্বন্ধে তার একটা সঙ্কোচ ছিল, আজ সে লজ্জা দিচ্চে সেই সঙ্কোচকেই। আজকাল দেখছি আপনাকে ভদ্র প্রমাণ করবার জন্যে সভ্যতার দায়িত্ববোধ যাচ্চে চলে। অমানবিক নিষ্ঠুরতা দেখা দিচ্চে প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে। সভ্য য়ুরোপের সর্দ্দার পোড়ো জাপানকে দেখলুম কোরিয়ায়, দেখলুম চীনে, তার নিষ্ঠুর বলদৃপ্ত অধিকার-লঙ্ঘনকে নিন্দা করলে সে অট্টহাস্যে নজীর বের করে য়ুরোপের ইতিহাস থেকে। আয়র্লণ্ডে রক্ত-পিঙ্গলের যে-উন্মত্ত বর্ব্বরতা দেখা গেল, অনতিপূর্ব্বেও আমরা তা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারতুম না। তার পরে চোখের সামনে দেখলুম জালিয়ানওয়ালাবাগের বিভীষিকা। যে-য়ুরোপ একদিন তৎকালীন তুর্কিকে অমানুষ ব'লে গঞ্জনা দিয়েছে তারই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকাশ পেল ফ্যাসিজ্‌মের নির্ব্বিচার নিদারুণতা। একদিন জেনেছিলুম আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা য়ুরোপের একটা শ্রেষ্ঠ-সাধনা, আজ দেখছি য়ুরোপে এবং আমেরিকায় সেই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ প্রতিদিন প্রবল হয়ে উঠছে। ব্যক্তিগত শ্রেয়োবুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করবার কথা অল্পবয়সে আমরা য়ুরোপের বেদী থেকে শুন্‌তে পেতুম, আজ সেখানে যারা খৃষ্টের উপদেশকে সত্য ব'লে বিশ্বাস করে, যারা

শত্রুকেও হিংসা করা মনে করে অধর্ম্ম, তাদের কী দশা ঘটে তার একটা দৃষ্টান্ত থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

যুদ্ধবিরোধী ফরাসী যুবক রেনে রেইম্‌ লিখছেন—

"So after the war I was sent to Guiana. * * * Condemned to fifteen years' penal servitude I have drained to the dregs the cup of bitterness, but the term of penal servitude being completed, there remains always the accessory punishment—banishment for life. One arrives in Guiana sound in health, young, vigourous, one leaves (if one leaves), weakly, old, ill. * * * One arrives in Guiana honest—a few months later one is corrupted * * * They (the transportees) are an easy prey to all the maladies of this land—fever, dysentery, tuberculosis and most terrible of all leprosy."

পোলিটিকাল মতভেদের জন্যে ইটালী যে দ্বীপান্তরবাসের বিধান করেছে, সে কী রকম দুঃসহ নরকবাস, সে-কথা সকলেরই জানা আছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার আলোক যে-সব দেশ উজ্জ্বলতম করে জ্বালিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রধান স্থান নিতে পারে জর্ম্মনি। কিন্তু আজ সেখানে সভ্যতার সকল আদর্শ টুক্‌রো করে দিয়ে এমন অকস্মাৎ, এত সহজে উন্মত্ত দানবিকতা সমস্ত দেশকে অধিকার করে নিলে, এও তো অসম্ভব হোলো না। যুদ্ধপরবর্ত্তীকালীন য়ুরোপের বর্ব্বর নির্দ্দয়তা যখন আজ এমন নির্লজ্জভাবে চারিদিকে উদ্‌ঘাটিত হোতে থাকল তখন এই কথাই বারবার মনে আসে, কোথায় রইল মানুষের সেই দরবার যেখানে মানুষের শেষ আপিল পৌঁছবে আজ। মনুষ্যত্বের 'পরে বিশ্বাস কি ভাঙতে হবে—

বর্ব্বরতা দিয়েই কি চিরকাল ঠেকাতে হবে বর্ব্বরতা? কিন্তু সেই নৈরাশ্যের মধ্যেই এই কথাও মনে আসে যে, দুর্গতি যতই উদ্ধতভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠুক, তবু তাকে মাথা তুলে বিচার করতে পারি, ঘোষণা করতে পারি তুমি অশ্রদ্ধেয়, অভিসম্পাত দিয়ে বলতে পারি "বিনিপাত", বলবার জন্যে পণ করতে পারে প্রাণ এমন লোকও দুর্দ্দিনের মধ্যে দেখা দেয়, এইতো সকল দুঃখের, সকল ভয়ের উপরের কথা। আজ পেয়াদার পীড়নে হাড় গুঁড়িয়ে যেতে পারে, তবুও তো আগেকার মতো হাতজোড় করে বলতে পারিনে, দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা, বলতে পারিনে, তেজীয়ান যে তার কিছুই দোষের নয়। বরঞ্চ মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, তারই দায়িত্ব বড়ো, তারই আদর্শে তারই অপরাধ সকলের চেয়ে নিন্দনীয়। যে-দুঃখী, যে-অবমানিত, সে যেদিন ন্যায়ের দোহাইকে অত্যাচারের সিংহগর্জ্জনের উপরে তুলে আত্মবিস্মৃত প্রবলকে ধিক্কার দেবার ভরসা ও অধিকার সম্পূর্ণ হারাবে, সেইদিনই বুঝব এই যুগ আপন শ্রেষ্ঠসম্পদে শেষকড়া পর্য্যন্ত দেউলে হোলো। তার পরে আসুক কল্লান্ত।

১৩৪০

বিবেচনা ও অবিবেচনা

বাংলা দেশে একদিন স্বদেশপ্রেমের বান ডাকিল ; আমাদের প্রাণের ধারা হঠাৎ অসম্ভব রকম ফুলিয়া উঠিয়া পাড়ি ছাপাইয়া পড়ে আর কি। সেই বেগটা যে সত্য তাহার প্রমাণ এই যে, তাহার চাঞ্চল্যে কেবল আমাদের কাগজের নৌকাগুলাকে দোলা দেয় নাই, কেবল সভাতলেই করতালির তুফান উঠিয়া সমস্ত চুকিয়া গেল না।

সেদিন সমাজটাও যেন আগাগোড়া নড়িয়া উঠিল এমনতরো বোধ হইয়াছিল। এক মুহূর্তেই তাঁতের কাজে ব্রাহ্মণের ছেলেদের বাধা ছুটিয়া গেল ; ভদ্রসন্তান কাপড়ের মোট বহিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল, এমন কি, হিন্দুমুসলমানে একত্রে বসিয়া আহার করার অয়োজনটাও হয়-হয় করিতে লাগিল।

তর্ক করিয়া এসব হয় নাই—কেহ বিধান লইবার জন্য অধ্যাপক-পাড়ায় যাতায়াত করে নাই। প্রাণ জাগিলেই কাহারো পরামর্শ না লইয়া আপনি সে চলিতে প্রবৃত্ত হয় ; তখন সে চলার পথের সমস্ত বাধাগুলাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহাতে গম্ভীরভাবে সিঁদুর চন্দন মাখাইতে বসে না, কিম্বা তাহাকে লইয়া বসিয়া বসিয়া সুনিপুণ তত্ত্ব বা সুচারু কবিত্বের সূক্ষ্ম বুনানি বিস্তার করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হয় না। যেমনি চলিতে যায় অমনি সে আপনিই বুঝিতে পারে কোন্‌গুলা লইয়া তাহার চলিবে না ; তখন যাহা গায়ে ঠেকে তাহাকেই সমস্ত গা দিয়া সে ঠেলা দিতে সুরু করে। সেই সাবেক পাথরগুলা যখন ঠেলার চোটে টলিতে থাকে তখন বোঝা যায় প্রাণ জাগিয়াছে বটে, ইহা মায়া নহে স্বপ্ন নহে।

সেই বন্যার বেগ কমিয়া আসিয়াছে। সমাজের মধ্যে যে চলার ঝোঁক আসিয়াছিল সেটা কাটিয়া গিয়া আজ আবার বাঁধি বোলের বেড়া বাঁধিবার দিন আসিয়াছে।

আজ আবার সমাজকে বাহবা দিবার পালা আরম্ভ হইল। জগতের মধ্যে কেবলমাত্র ভারতেরই জলবাতাসে এমন একটি অদ্ভুত জাদু আছে যে এখানে রীতি আপনিই নীতিকে বরণ করিয়া লয়, আচারের পক্ষে বিচারের কোনো প্রয়োজনই হয় না। আমাদের কিছুই বানাইবার দরকার নাই কেবল মানিয়া গেলেই চলে, এই বলিয়া নিজেকে অভিনন্দন করিতে বসিয়াছি।

যে লোক কাজের উৎসাহে আছে, স্তবের উৎসাহে তাহার প্রয়োজনই থাকে না। ইহার প্রমাণ দেখো, আমরাও পশ্চিম সমুদ্রপারে গিয়া সেখানকার মানুষদের মুখের উপর বলিয়া আসিয়াছি, "তোমরা মরিতে বসিয়াছ! আত্মা বলিয়া পদার্থকে কেবলি বস্তুচাপা দিয়া তাহার দম বন্ধ করিবার জো করিয়াছ,—তোমরা স্থূলের উপাসক।" এসব কঠোর কথা শুনিয়া তাহারা তো মারমূর্তি ধরে নাই। বরঞ্চ ভালো-মানুষের মতো মানিয়া লইয়াছে; মনে মনে বলিয়াছে, "হবেও বা! আমাদের বয়স অল্প, আমরা কাজ বুঝি—ইহারা অত্যন্ত প্রাচীন, অতএব কাজ কামাই করা সম্বন্ধে ইহারা যে তত্ত্বকথাগুলা বলে নিশ্চয় সেগুলা ইহারা আমাদের চেয়ে ভালোই বোঝে।" এই বলিয়া ইহারা আমাদিগকে দক্ষিণা দিয়া খুসি করিয়া বিদায় করিয়াছে এবং তাহার পরে আস্তিন গুটাইয়া যেমন কাজ করিতেছিল তেমনিই কাজ করিতে লাগিয়াছে।

কেননা, হাজারই ইহাদিগকে নিন্দা করি আর ভয় দেখাই ইহারা যে চলিতেছে; ইহারা যে প্রাণবান তাহার প্রমাণ যে ইহাদের

নিজেরই মধ্যে। মরার বাড়া গালি নাই, একথা ইহাদের পক্ষে খাটে না। ইহারা জানে মরার বাড়াও গালি আছে—বাঁচিয়া মরা। ইহাদের জীবনযাত্রায় সঙ্কটের সীমা নাই, সমস্যার গ্রন্থিও বিস্তর, কিন্তু সকলের উপরে ইহাদিগকে ভরসা দিতেছে ইহাদের প্রাণ। এইজন্য ইহারা নিন্দা অনায়াসে সহিতে পারে এবং নৈরাশ্যের কথাটাকে লইয়া ক্ষণকালের জন্য খেলা করে মাত্র, তাহাতে তাহাদের প্রাণের বেগে আর একটু উত্তেজনার সঞ্চার করে।

আমরাও তেমনি নিন্দা সহজে সহিতে পারিতাম যদি পুরাদমে কাজের পথে চলিতাম। কারণ তাহা হইলে আপনিই বুঝিতে পারিতাম প্রাণের গতিতে সমস্ত গ্লানিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। পঙ্ক যখন অচল হইয়া থাকে তখন সেটা নিন্দিত, কিন্তু জোয়ারের গঙ্গাকে পঙ্কিল বলিয়া দোষ দিলেও যাহারা স্নান করে তাহাদের তাহাতে বাধা হয় না।

এই জন্য, নিষ্কর্ম্মণ্য যে তাহারই অহোরাত্র স্তবের দরকার হয়। যে ধনীর কীর্ত্তিও নাই, হাতে কোনো কর্ম্মও নাই, চাটুকারের প্রয়োজন সব চেয়ে তাহারই অধিক, নহিলে সে আপনার জড়ত্বের বোঝা বহিবে কেমন করিয়া? তাহাকে পরামর্শ দেওয়া উচিত যে, তোমার এই বনেদী স্থাবরত্ব গৌরব করিবার জিনিষ নয়, যেমন করিয়া পারো একটা কর্ম্মে লাগিয়া যাও। কিন্তু এস্থলে পরামর্শদাতার কাজটা নিরাপদ নহে, বাবুর পারিষদবর্গ তখনি হাঁ হাঁ করিয়া আসিবে। সুতরাং বক্‌শিসের প্রত্যাশা থাকিলে বলিতে হয় "হুজুর, আপনি যে সনাতন তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়াছেন উহার তুলার স্তূপ জগতে অতুল, অতএব বংশের গৌরব যদি রাখিতে চান তো নড়িবেন না।"

আমাদের সমাজে যে পরিমাণে কর্ম্ম বন্ধ হইয়া আসিয়াছে সেই পরিমাণে বাহবার ঘটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। চলিতে গেলেই দেখি

সকল বিষয়েই পদে পদে কেবলি বাধে। এমন স্থলে হয় বলিতে হয় খাঁচাটাকে ভাঙো, কারণ ওটা আমাদের ঈশ্বরদত্ত পাখাদুটাকে অসাড় করিয়া দিল ; নয় বলিতে হয় ঈশ্বরদত্ত পাখার চেয়ে খাঁচার লোহার শলাগুলো পবিত্র, কারণ, পাখা তো আজ উঠিতেছে আবার কাল পড়িতেছে কিন্তু লোহার শলাগুলো চিরকাল স্থির আছে। বিধাতার সৃষ্টি পাখা নূতন, আর কামারের সৃষ্টি খাঁচা সনাতন ; অতএব ঐ খাঁচার সীমাটুকুর মধ্যে যতটুকু পাখাঝাপট সম্ভব সেইটুকুই বিধি, তাহাই ধর্ম্ম, আর তাহার বাহিরে অনন্ত আকাশভরা নিষেধ। খাঁচার মধ্যে যদি নিতান্তই থাকিতে হয় তবে খাঁচার স্তব করিলে নিশ্চয়ই মন ঠাণ্ডা থাকে।

আমাদের সামাজিক কামারে যে শলাটি যেমন করিয়া বানাইয়াছে শিশুকাল হইতে তাহারই স্তবের বুলি পড়িয়া পড়িয়া আমরা অন্য সকল গান ভুলিয়াছি, কেননা অন্যথা করিলে বিপদের অন্ত নাই। আমাদের এখানে সকল দিকেই ঐ কামারেরই হইল জয়, আর সব চেয়ে বিড়ম্বিত হইলেন বিধাতা, যিনি আমাদিগকে কর্ম্মশক্তি দিয়াছেন, যিনি মানুষ বলিয়া আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

যাঁহারা বলিতেছেন যেখানে যাহা আছে সমস্তই বজায় থাক্, তাঁহারা সকলেই আমাদের প্রণম্য,—কারণ, তাঁহাদের বয়স অল্পই হউক্ আর বেশিই হউক্ তাঁহারা সকলেই প্রবীণ। সংসারে তাঁহাদের প্রয়োজন আমরা অস্বীকার করি না। পৃথিবীতে এমন সমাজ নাই যেখানে তাঁহারা দণ্ড ধরিয়া বসিয়া নাই। কিন্তু বিধাতার বরে যে সমাজ বাঁচিয়া থাকিবে সে সমাজে তাঁহাদের দণ্ডই চরম বলিয়া মান পায় না।

সেদিন একটি কুকুরছানাকে দেখা গেল, মাটির উপর দিয়া একটি

কীট চলিতেছে দেখিয়া তাহার ভারি কৌতূহল। সে তাহাকে শুঁকিতে শুঁকিতে তাহার অনুসরণ করিয়া চলিল। যেমনি পোকাটা একটু ধড়ফড় করিয়া উঠিতেছে অমনি কুকুরশাবক চমকিয়া পিছাইয়া আসিতেছে।

দেখা গেল তাহার মধ্যে নিষেধ এবং তাগিদ দুটা জিনিষই আছে। প্রাণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই যে, সমস্তকেই সে পরখ করিয়া দেখে। নূতন নূতন অভিজ্ঞতার পথ ধরিয়া সে আপনার অধিকার বিস্তার করিয়া চলিতে চায়। প্রাণ দুঃসাহসিক—বিপদের ঠোকর খাইলেও সে আপনার জয়যাত্রার পথ হইতে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইতে চায় না। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি প্রবীণও আছে, বাধার বিকট চেহারা দেখিবামাত্রই সে বলে, কাজ কী! বহু পুরাতন যুগ হইতে পুরুষানুক্রমে যত কিছু বিপদের তাড়না আপনার ভয়ের সংবাদ রাখিয়া গিয়াছে তাহাকে পুঁথির আকারে বাঁধাইয়া রাখিয়া একটি বৃদ্ধ তাহারি খবরদারি করিতেছে। নবীন প্রাণ এবং প্রবীণ ভয়, জীবের মধ্যে উভয়েই কাজ করিতেছে। ভয় বলিতেছে, "রোস রোস", প্রাণ বলিতেছে, "দেখাই যাক না!"

অতএব এই প্রবীণতার বিরুদ্ধে আমরা আপত্তি করিবার কে? আপত্তি করিও না। তাঁহার বৈঠকে তিনি গদীয়ান হইয়া থাকিবেন, সেখান হইতে তাঁহাকে আমরা নড়িয়া বসিতে বলি এমন বেআদব আমরা নই। কিন্তু প্রাণের রাজ্যে তাঁহাকেই একেশ্বর করিবার যখন ষড়যন্ত্র হয় তখনই বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া বাহির হইবার দিন আসে। দুর্ভাবনা এবং নির্ভাবনা উভয়কেই আমরা খাতির করিয়া চলিতে রাজি আছি।

প্রাণের রাজ্যাধিকারে এই উভয়েই সরিক বটে কিন্তু উভয়ের

অংশ যে সমান তাহাও আমরা মানিতে পারি না। নির্ভাবনার অংশটাই বেশি হওয়া চাই নহিলে স্রোত এতই মন্দ বহে যে শেওলা জমিয়া জলটা চাপা পড়ে। মৃত্যুসংখ্যার চেয়ে জন্মসংখ্যা বেশি হওয়াই কল্যাণের লক্ষণ।

পৃথিবীতে বারো আনা জল চার আনা স্থল। এরূপ বিভাগ না হইলে বিপদ ঘটিত। কারণ জলই পৃথিবীতে গতি সঞ্চার করিতেছে, প্রাণকে বিস্তারিত করিয়া দিতেছে। জলই খাদ্যকে সচল করিয়া গাছপালা পশুপক্ষীকে স্তন্য দান করিতেছে। জলই সমুদ্র হইতে আকাশে উঠিতেছে, আকাশ হইতে পৃথিবীতে নামিতেছে, মলিনকে ধৌত করিতেছে, পুরাতনকে নূতন ও শুষ্ককে সরস করিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর উপর দিয়া যে জীবের প্রবাহ নব নব ধারায় চলিয়াছে তাহার মূলে এই জলেরই ধারা। স্থলের একাধিপত্য যে কী ভয়ঙ্কর তাহা মধ্য-এসিয়ার মরুপ্রান্তরের দিকে তাকাইলেই বুঝা যাইবে। তাহার অচলতার তলে কত বড়ো বড়ো সহর লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে পুরাতন পথ বাহিয়া ভারতবর্ষ হইতে চীনে জাপানে পণ্য ও চিত্ত বিনিময় চলিত, এই রুদ্র মরু সে পথের চিহ্ন মুছিয়া দিল; কত যুগের প্রাণচঞ্চল ইতিহাসকে বালুচাপা দিয়া সে কঙ্কালসার করিয়া দিয়াছে। উলঙ্গ ধূর্জ্জটী সেখানে একা স্থাণু হইয়া ঊর্দ্ধনেত্রে বসিয়া আছেন; উমা নাই। দেবতারা তাই প্রমাদ গণিতেছেন,—কুমারের জন্ম হইবে কেমন করিয়া? নূতন প্রাণের বিকাশ হইবে কী উপায়ে?

জোর করিয়া চোখ বুজিয়া যদি না থাকি তবে নিজের সমাজের দিকে তাকাইলেও এই চেহারাই দেখিতে পাইব। এখানে স্থলের স্থাবরতা ভয়ঙ্কর হইয়া বসিয়া আছে—এ যে পক্ককেশের শুভ্র মরুভূমি। এখানে এককালে যখন প্রাণের রস বহিত তখন ইতিহাস সজীব হইয়া

সচল হইয়া কেবল যে এক প্রদেশ হইতে আর এক প্রদেশে ব্যাপ্ত হইত তাহা নহে,—মহতী স্রোতস্বিনীর মতো দেশ হইতে দেশান্তরে চলিয়া যাইত। বিশ্বের সঙ্গে সেই প্রাণ বিনিময়ের সেই পণ্য বিনিময়ের ধারা ও তাহার বিপুল রাজপথ কবে কোন্‌কালে বালুচাপা পড়িয়া গেছে। এখানে সেখানে মাটি খুঁড়িয়া বাহনদের কঙ্কাল খুঁজিয়া পাওয়া যায়, পুরাতত্ত্ববিদের খনিত্রের মুখে পণ্যসামগ্রীর দুটো একটা ভাঙাটুক্‌রা উঠিয়া পড়ে। গুহাগহ্বরে গহনে সেকালের শিল্প-প্রবাহিনীর কিছু কিছু অংশ আটকা পড়িয়া গেছে, কিন্তু আজ তাহা স্থির, তাহার ধারা নাই। সমস্ত স্বপ্নের মতো মনে হয়। আমাদের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ কী? সমস্ত সৃষ্টির স্রোত বন্ধ। যাহা আছে তাহা আছে, যাহা ছিল তাহা কেবলি তলাইয়া যাইতেছে।

চারিদিক এমনি নিস্তব্ধ নিশ্চল যে মনে ভ্রম হয় ইহাই সনাতন। কখনই নহে, ইহাই নূতন। এই মরুভূমি সনাতন নহে, ইহার বহু-পূর্ব্বে এখানে প্রাণের নব নব লীলা চলিত—সেই লীলায় কত বিজ্ঞান দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, রাজ্য সাম্রাজ্য, কত ধর্ম্ম ও সমাজবিপ্লব তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে। কিছু না করিয়া একবার মহাভারতটা পড়িয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, সমাজটা কোনো সংহিতার কারখানাঘরের ঢালাই-পেটাইকরা ও কারিগরের ছাপমারা সামগ্রী ছিল না—তাহাতে বিধাতার নিজের সৃষ্টির সমস্ত লক্ষণ ছিল, কেননা তাহাতে প্রাণ ছিল। তাহা নিখুঁৎ নয়, নিটোল নয়; তাহা সজীব, তাহা প্রবল, তাহা কৌতূহলী, তাহা দুঃসাহসিক।

ইজিপ্টের প্রকাণ্ড কবরগুলার তলায় যে সমস্ত "মমি" মৃত্যুকে অমর করিয়া দাঁত মেলিয়া জীবনকে ব্যঙ্গ করিতেছে তাহাদিগকেই কি বলিবে সনাতন? তাহাদের সিন্ধুকের গায়ে যত প্রাচীন তারিখের চিহ্নই

খোদা থাক্ না কেন, সেই ইজিপ্টের নীল-নদীর পলিপড়া মাঠে আজ যে "ফেলাহীন্" চাষা চাস করিতেছে তাহারই প্রাণ যথার্থ সনাতন। মৃত্যু যে প্রাণের ছোটো ভাই; আগে প্রাণ তাহার পরে মৃত্যু। যাহা কিছু চলিতেছে তাহারই সঙ্গে জগতের চিরন্তন চলার যোগ আছে —যাহা থামিয়া বসিয়াছে তাহার সঙ্গে সনাতন প্রাণের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। আজ ক্ষুদ্র ভারতের প্রাণ একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া স্থির হইয়া গেছে, তাহার মধ্যে সাহস নাই, সৃষ্টির কোনো উদ্যম নাই, এই জন্যই মহাভারতের সনাতন প্রাণের সঙ্গে তাহার যোগই নাই। যে যুগ দর্শন চিন্তা করিয়াছিল, যে যুগ শিল্প সৃষ্টি করিয়াছিল, যে যুগ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল তাহার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন। অথচ আমরা তারিখের হিসাব করিয়া বলিতেছি জগতে আমাদের মতো সনাতন আর কিছুই নাই;—কিন্তু তারিখ তো কেবল অঙ্কের হিসাব, তাহা তো প্রাণের হিসাব নয়। তাহা হইলে তো ভস্মও অঙ্ক গণনা করিয়া বলিতে পারে সেই সকলের চেয়ে প্রাচীন অগ্নি।

পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি। শক্তির দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস, আকাঙ্ক্ষার দুঃসাহস। শক্তি কোথাও বাধা মানিতে চায় নাই বলিয়া মানুষ সমুদ্র পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া গিয়াছে, বুদ্ধি আপাতপ্রতীয়মানকে ছাড়াইয়া অন্ধসংস্কারের মোহজালকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া মহৎ হইতে মহীয়ানে, অণু হইতে অণীয়ানে, দূর হইতে দূরান্তরে, নিকট হইতে নিকটতমে সগৌরবে বিহার করিতেছে; ব্যাধি দৈন্য অভাব অবজ্ঞা কিছুকেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা অপ্রতিহার্য্য মনে করিয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়া নাই, কেবলি পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিয়া চলিতেছে। যাহাদের সে দুঃসাহস নাই তাহারা আজও মধ্য

আফ্রিকার অরণ্যতলে মূঢ়তায় স্বকপোলকল্পিত বিভীষিকার কাঁটার বেড়াটুকুর মধ্যে যুগযুগান্তর গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া আছে।

এই দুঃসাহসের মধ্যে একটা প্রবল অবিবেচনা আছে। আজ যাহারা আকাশযানে উড়িতে উড়িতে আকাশ হইতে পড়িয়া চুরমার হইয়া মরিতেছে তাহাদের মধ্যে সেই দুরন্ত অবিবেচনা কাজ করিতেছে। এমনি করিয়াই একদিন যাহারা সমুদ্র পার হইবার সাধনা করিতে করিতে হাজার হাজার জলে ডুবিয়া মরিয়াছে সেই অবিবেচনাই তাহাদিগকে তাড়া করিয়াছিল। সেই দুর্দ্ধর্ষ অবিবেচনার উত্তেজনাতেই আজও মানুষ তুষারদৈত্যের পাহারা এড়াইয়া কখনো উত্তর মেরু কখনো দক্ষিণ মেরুতে কেবলমাত্র দিগ্বিজয় করিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে। এমনি করিয়া যাহারা নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া তাহারাই লক্ষ্মীকে দুর্গম অন্তঃপুর হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছে।

এই দুঃসাহসিকের দল নিজের সমাজের মধ্যেও যে লক্ষ্মীছেলে হইয়া ঠাণ্ডা হইযা বসিয়া আছে তাহা নহে। যাহা আছে তাহাই যে চূড়ান্ত একথা কোনো মতেই তাহাদের মন মানিতে চায় না। বিজ্ঞ মানুষদের নিয়ত ধমকানি খাইয়াও এই অশান্তের দল জীর্ণ বেড়া ভাঙিয়া পুরাতন বেড়া সরাইয়া কত উৎপাত করিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। প্রাণের চাঞ্চল্য তাহাদের স্বভাবতই প্রবল বলিয়াই, তাহাদের সাহসের অন্ত নাই বলিয়াই, সেই বিপুল বেগেতেই তাহারা সমস্ত সীমাকে কেবলি ধাক্কা মারিয়া বেড়ায়। ইহা তাহাদের স্বভাব। এমনি করিয়াই আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে যেখানে সীমা দেখা যাইতেছিল বস্তুতই সেখানে সীমা নাই। ইহারা দুঃখ পায়, দুঃখ দেয়, মানুষকে অস্থির করিয়া তোলে এবং মরিবার বেলায় ইহারাই মরে। কিন্তু বাঁচিবার পথ ইহারাই বাহির করিয়া দেয়।

আমাদের দেশে সেই জন্ম-লক্ষ্মীছাড়া কি নাই? নিশ্চয়ই আছে। কারণ তাহারাই যে প্রাণের স্বাভাবিক সৃষ্টি, প্রাণ যে আপনার গরজেই তাহাদিগকে জন্ম দেয়। কিন্তু পৃথিবীতে যে-কোনো শক্তিই মানুষকে সম্পূর্ণ আপনার তাঁবেদার করিতে চায় সে প্রাণের লীলাকেই সব চেয়ে ভয় করে—সেই কারণেই আমাদের সমাজ ঐ সকল প্রাণবহুল দুরন্ত ছেলেকে শিশুকাল হইতে নানাপ্রকার শাসনে এমনই ঠাণ্ডা করিতে চায় যাহাতে তাহাদের ভালোমানুষি দেখিলে একেবারে চোখ জুড়াইয়া যায়। মানা, মানা, মানা; শুইতে বসিতে কেবলি তাহাদিগকে মানা মানিয়া চলিতে হইবে। যাহার কোনো কারণ নাই যুক্তি নাই তাহাকে মানাই যাহাদের নিয়ত অভ্যাস, মানিয়া চলা তাহাদের এমনি আশ্চর্য্য দুরন্ত হইয়া উঠে, যে, যেখানে কাহাকেও মানিবার নাই সেখানে তাহারা চলিতেই পারে না। এইপ্রকার হতবুদ্ধি হতোদ্যম মানুষকে আপন তর্জ্জনি সঙ্কেতে ওঠ্ বোস্ করানো সহজ। আমাদের সমাজ সমাজের মানুষগুলাকে লইয়া এই প্রকারের একটা প্রকাণ্ড পুতুলবাজির কারখানা খুলিয়াছে! তারে তারে আপাদমস্তক কেমন করিয়া বাঁধিয়াছে, কী আশ্চর্য্য তাহার কৌশল! ইহাকে বাহবা দিতে হয় বটে। বিধাতাকে এমন সম্পূর্ণরূপে হার মানানো, প্রাণীকে এমন কলের পুতুল করিয়া তোলা জগতে আর কোথায় ঘটিয়াছে!

তবু হাজার হইলেও যাহাদের মধ্যে প্রাণের প্রাচুর্য্য আছে তাহাদিগকে সকল দিক হইতে চাপিয়া পিষিয়াও তাহাদের তেজ একেবারে নষ্ট করা যায় না। এইজন্য আর কোনো কাজ না পাইয়া সেই উদ্যম সেই তেজ তাহারা সমাজের বেড়ি গড়িবার জন্যই প্রবলবেগে খাটাইতে থাকে। স্বভাবের বিকৃতি না ঘটিলে যাহারা সর্ব্বাগ্রে চলার পথে ছুটিত তাহারাই পথের মধ্যে প্রাচীর তুলিবার জন্য সব চেয়ে উৎসাহের সঙ্গে

লাগিয়া থাকে। কাজ করিবার জন্যই তাহাদের জন্ম, কিন্তু কাজের ক্ষেত্র বন্ধ বলিয়া কাজ বন্ধ করিবার কাজেই তাহারা কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগে।

ইহারা কুন্তীসুত কর্ণের মতো। পাণ্ডবের দলে কর্ণের যথার্থ স্থান ছিল কিন্তু সেখানে অদৃষ্টক্রমে কোনো অধিকার না পাওয়াতে পাণ্ডবদিগকে উচ্ছেদ করাই তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা যাঁহাদের কথা বলিতেছি তাঁহারা স্বভাবতই চলিষ্ণু, কিন্তু এদেশে জন্মিয়া সে কথাটা তাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া বসিয়াছেন—এই জন্য যাঁহারা ঠিক তাঁহাদের একদলের লোক, তাঁহাদের সঙ্গেই অহরহ হাতাহাতি করিতে পারিলে ইঁহারা আর কিছু চান না।

এই শ্রেণীর লোক আজকাল অনেক দেখা যায়। ইঁহারা তাল ঠুকিয়া বলেন, "স্বাধীনতায়-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে," আক্ষেপ করিয়া বলেন, আমাদের প্রভুদের মানা আছে বলিয়াই আমরা পৌরুষ দেখাইতে পারি না। অথচ সমাজের চোখে ঠুলি দিয়া তাহাকে সরু মোটা হাজার বাঁধনে বাঁধিয়া মানার প্রকাণ্ড ঘানিতে জুড়িয়া একই চক্রপথে ঘুরাইবার সব চেয়ে বড়ো ওস্তাদ ইঁহারাই। বলেন, এ ঘানি সনাতন, ইহার পবিত্র স্নিগ্ধ তৈলে প্রকুপিত বায়ু একেবারে শান্ত হইয়া যায়। ইঁহারা প্রচণ্ড তেজের সঙ্গেই দেশের তেজ নিবৃত্তির জন্যই লাগিয়াছেন; সমাজের মধ্যে কোথাও কিছু ব্যস্ততার লক্ষণ না দেখা দেয় সেজন্য ইঁহারা ভয়ঙ্কর ব্যস্ত।

কিন্তু পারিয়া উঠিবেন না। অস্থিরতার বিরুদ্ধে যে চাঞ্চল্য ইঁহাদিগকে এমন অস্থির করিয়া তুলিয়াছে সেটা দেশের নাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে তাহার প্রমাণ তাঁহারা নিজেই। সকাল বেলায় জাগিয়া উঠিয়া যদি কেহ কেহ ঘরে আলো আসিতেছে বলিয়া বিরক্ত হইয়া

হুড়্দাড়্ শব্দে ঘরের দরজা জানালাগুলো বন্ধ করিয়া দিতে চায় তবে নিশ্চয় আরো অনেক লোক জাগিবে যাহারা দরজা খুলিয়া দিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিবে। জাগরণের দিনে দুই দলই জাগে এইটেই আমাদের সকলের চেয়ে আশার কথা।

যাঁহারা দেশকে ঠাণ্ডা করিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহারা অনেকদিন একাধিপত্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই একেশ্বর রাজত্বের কীর্ত্তিগুলি চারিদিকেই দেখা যাইতেছে; তাহা লইয়া আলোচনা করিতে গেলেই রাগারাগি হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু দেশের নবযৌবনকে তাঁহারা আর নির্ব্বাসিত করিয়া রাখিতে পারিবেন না। তাঁহারা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া থাকুন, আর বাকি সবাই পথে ঘাটে বাহির হইয়া পড়ুক। সেখানে তারুণ্যের জয় হউক! তাহার পায়ের তলায় জঙ্গল মরিয়া যাক্, জঞ্জাল সরিয়া যাক, কাঁটা দলিয়া যাক্, পথ খোলসা হৌক, তাহার অবিবেচনার উদ্ধত বেগে অসাধ্যসাধন হইতে থাক্।

চলার পদ্ধতির মধ্যে অবিবেচনার বেগও দরকার, বিবেচনার সংযমও আবশ্যক; কিন্তু অবিবেচনার বেগও বন্ধ করিব আবার বিবেচনা করিতেও অধিকার দিব না,—মানুষকে বলিব, তুমি শক্তিও চালাইয়ো না, বুদ্ধিও চালাইয়ো না, তুমি কেবলমাত্র ঘানি চালাও, এ বিধান কখনই চিরদিন চলিবে না। যে পথে চলাফেরা বন্ধ, সে পথে ঘাস জন্মায় এবং ঘাসের মধ্যে নানা রঙের ফুলও ফোটে। সে ঘাস সে ফুল সুন্দর একথা কেহই অস্বীকার করিবে না কিন্তু পথের সৌন্দর্য্য ঘাসেও নহে ফুলেও নহে, তাহা বাধাহীন বিচ্ছেদহীন বিস্তারে; তাহা ভ্রমরগুঞ্জনে নহে কিন্তু পথিকদলের অক্লান্ত পদধ্বনিতেই রমণীয়।

১৩২১

লোকহিত

লোক-সাধারণ বলিয়া একটা পদার্থ আমাদের দেশে আছে এটা আমরা কিছুদিন হইতে আন্দাজ করিতেছি এবং এই লোক-সাধারণের জন্য কিছু করা উচিত হঠাৎ এই ভাবনা আমাদের মাথায় চাপিয়াছে। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। এই কারণে, ভাবনার জন্যই ভাবনা হয়।

আমরা পরের উপকার করিব মনে করিলেই উপকার করিতে পারি না। উপকার করিবার অধিকার থাকা চাই। যে বড়ো সে ছোটোর অপকার অতি সহজে করিতে পারে কিন্তু ছোটোর উপকার করিতে হইলে কেবল বড়ো হইলে চলিবে না, ছোটো হইতে হইবে, ছোটোর সমান হইতে হইবে। মানুষ কোনোদিন কোনো যথার্থ হিতকে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিবে না, ঋণরূপেও না, কেবলমাত্র প্রাপ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিবে।

কিন্তু আমরা লোকহিতের জন্য যখন মাতি তখন অনেক স্থলে সেই মত্ততার মূলে একটি আত্মাভিমানের মদ থাকে। আমরা লোক-সাধারণের চেয়ে সকল বিষয়ে বড়ো এই কথাটাই রাজকীয় চালে সম্ভোগ করিবার উপায় উহাদের হিত করিবার আয়োজন। এমন স্থলে উহাদেরও অহিত করি, নিজেদেরও হিত করি না।

হিত করিবার একটিমাত্র ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে সেটি প্রীতি। প্রীতির দানে কোনো অপমান নাই কিন্তু হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়। মানুষকে সকলের চেয়ে নত করিবার উপায় তাহার হিত করা অথচ তাহাকে প্রীতি না করা।

এ কথা অনেক সময়েই শোনা যায় যে, মানুষ স্বভাবতই অকৃতজ্ঞ—যাহার কাছে সে ঋণী তাহাকে পরিহার করিবার জন্য তাহার চেষ্টা। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ—এ উপদেশ পারতপক্ষে কেহ মানে না। তাহার মহাজনটি যে রাস্তা দিয়া চলে মানুষ সে রাস্তায় চলা একেবারে ছাড়িয়া দেয়।

ইহার কারণ এ নয় যে, স্বভাবতই মানুষের মনটা বিকৃত। ইহার কারণ এই যে, মহাজনকে সুদ দিতে হয়; সে সুদ আসলকে ছাড়াইয়া যায়। হিতৈষী যে সুদটি আদায় করে সেটি মানুষের আত্মসম্মান;—সেটিও লইবে আবার কৃতজ্ঞতাও দাবী করিবে সে যে শাইলকের বাড়া হইল।

সেইজন্য, লোক-হিত করায় লোকের বিপদ আছে সে কথা ভুলিলে চলিবে না। লোকের সঙ্গে আপনাকে পৃথক রাখিয়া যদি তাহার হিত করিতে যাই তবে সেই উপদ্রব লোকে সহ্য না করিলেই তাহাদের হিত হইবে।

অল্পদিন হইল এ সম্বন্ধে আমাদের একটা শিক্ষা হইয়া গেছে। যে কারণেই হউক্ যেদিন স্বদেশী নিমকের প্রতি হঠাৎ আমাদের অত্যন্ত একটা টান হইয়াছিল সেদিন আমরা দেশের মুসলমানদের কিছু অস্বাভাবিক উচ্চস্বরেই আত্মীয় বলিয়া ভাই বলিয়া ডাকাডাকি সুরু করিয়াছিলাম।

সেই স্নেহের ডাকে যখন তাহারা অশ্রুগদগদ কণ্ঠে সাড়া দিল না তখন আমরা তাহাদের উপর ভারি রাগ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম এটা নিতান্তই ওদের সয়তানি। একদিনের জন্যও ভাবি নাই আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল কিন্তু সত্য ছিল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা সাধারণ সামাজিকতা আছে,—যে সামাজিকতার

টানে আমরা সহজ প্রীতির বশে মানুষকে ঘরে ডাকিয়া আনি, তাহার সঙ্গে বসিয়া খাই, যদিবা তাহার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য থাকে সেটাকে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখিতে দিই না,—সেই নিতান্ত সাধারণ সামাজিকতার ক্ষেত্রে যাহাকে আমরা ভাই বলিয়া আপন বলিয়া মানিতে না পারি দায়ে পড়িয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভাই বলিয়া যথোচিত সতর্কতার সহিত তাহাকে বুকে টানিবার নাট্যভঙ্গী করিলে সেটা কখনই সফল হইতে পারে না।

এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের, এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর-এক সম্প্রদায়ের তো পার্থক্য থাকেই, কিন্তু সাধারণ সামাজিকতার কাজই এই—সেই পার্থক্যটাকে রূঢ়ভাবে প্রত্যক্ষগোচর না করা। ধনী দরিদ্রে পার্থক্য আছে—কিন্তু দরিদ্র তাহার ঘরে আসিলে ধনী যদি সেই পার্থক্যটাকে চাপা না দিয়া সেইটেকেই অত্যুগ্র করিয়া তোলে তবে আর যাই হউক দায়ে ঠেকিলে সেই দরিদ্রের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে যাওয়া ধনীর পক্ষে না হয় সত্য, না হয় শোভন।

হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বে-আব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্ব্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী-প্রচারক একগ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। কাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার বশে মানুষ মানুষকে ঠেলিয়া রাখে, অপমানও করে—তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কুস্তির সময়ে কুস্তিগিরদের গায়ে পরস্পরের পা ঠেকে তাহার হিসাব কেহ জমাইয়া রাখে না, কিন্তু সামাজিকতার স্থলে কথায় কথায় কাহারো গায়ে পা ঠেকাইতে থাকিলে তাহা ভোলা শক্ত হয়।

আমরা বিদ্যালয়ে ও আপিসে প্রতিযোগিতার ভিড়ে মুসলমানকে জোরের সঙ্গে ঠেলা দিয়াছি; সেটা সম্পূর্ণ প্রীতিকর নহে তাহা মানি; তবু সেখানকার ঠেলাঠেলিটা গায়ে লাগিতে পারে, হৃদয়ে লাগে না। কিন্তু সমাজের অপমানটা গায়ে লাগে না, হৃদয়ে লাগে। কারণ, সমাজের উদ্দেশ্যই এই যে, পরস্পরের পার্থক্যের উপর সুশোভন সামঞ্জস্যের আস্তরণ বিছাইয়া দেওয়া।

বঙ্গবিচ্ছেদ-ব্যাপারটা আমাদের অন্নবস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। সেই হৃদয়টা যতদূর পর্য্যন্ত অখণ্ড ততদূর পর্য্যন্ত তাহার বেদনা অপরিচ্ছিন্ন ছিল। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনোদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।

সংস্কৃত ভাষায় একটা কথা আছে, ঘরে যখন আগুন লাগিয়াছে তখন কূপ খুঁড়িতে যাওয়ার আয়োজন বৃথা। বঙ্গবিচ্ছেদের দিনে হঠাৎ যখন মুসলমানকে আমাদের দলে টানিবার প্রয়োজন হইল তখন আমরা সেই কূপ-খননেরও চেষ্টা করি নাই—আমরা মনে করিয়াছিলাম, মাটির উপরে ঘটি ঠুকিলেই জল আপনি উঠিবে। জল যখন উঠিল না কেবল ধূলাই উড়িল তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না। আজ পর্য্যন্ত সেই কূপ-খননের কথা ভুলিয়া আছি। আরও বারবার মাটিতে ঘটি ঠুকিতে হইবে, সেই সঙ্গে সে ঘটি আপনার কপালে ঠুকিব।

লোক-সাধারণের সম্বন্ধেও আমাদের ভদ্রসম্প্রদায়ের ঠিক ঐ অবস্থা। তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে অপমানিত করা আমাদের চিরদিনের অভ্যাস। যদি নিজেদের হৃদয়ের দিকে তাকাই তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতবর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি। বাংলা দেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা যে বাড়িয়া গিয়াছে

তাহার একমাত্র কারণ হিন্দুভদ্রসমাজ এই শ্রেণীয়-দিগকে হৃদয়ের সহিত আপন বলিয়া টানিয়া রাখে নাই।

আমাদের সেই মনের ভাবের কোনো পরিবর্ত্তন হইল না অথচ এই শ্রেণীর হিতসাধনের কথা আমরা কষিয়া আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তাই এ কথা স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে যে, আমরা যাহাদিগকে দূরে রাখিয়া অপমান করি তাহাদের মঙ্গল-সাধনের সমারোহ করিয়া সেই অপমানের মাত্রা বাড়াইয়া কোনো ফল নাই।

একদিন যখন আমরা দেশহিতের ধ্বজা লইয়া বাহির হইয়াছিলাম তখন তাহার মধ্যে দেশের অংশটা প্রায় কিছুই ছিল না, হিতের অভিমানটাই বড়ো ছিল। সেদিন আমরা য়ুরোপের নকলে দেশহিত সুরু করিয়াছিলাম, অন্তরের একান্ত তাগিদে নয়। আজও আমরা লোকহিতের জন্য যে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছি তাহার মধ্যে অনেকটা নকল আছে। সম্প্রতি য়ুরোপে লোক-সাধারণ সেখানকার রাষ্ট্রীয় রঙ্গভূমিতে প্রধান-নায়কের সাজে দেখা দিয়াছে। আমরা দর্শকরূপে এত দূরে আছি যে, আমরা তাহার হাত-পা নাড়া যতটা দেখি তাহার বাণীটা সে পরিমাণে শুনিতে পাই না। এই জন্যই নকল করিবার সময় ঐ অঙ্গভঙ্গীটাই আমাদের একমাত্র সম্বল হইয়া উঠে।

কিন্তু সেখানে কাণ্ডটা কী হইতেছে সেটা জানা চাই।

য়ুরোপে যাহারা একদিন বিশিষ্ট-সাধারণ বলিয়া গণ্য হইত তাহারা সেখানকার ক্ষত্রিয় ছিল। তখন কাটাকাটি মারামারির অন্ত ছিল না। তখন য়ুরোপের প্রবল বহিঃশত্রু ছিল মুসলমান; আর ভিতরে ছোটো ছোটো রাজ্যগুলা পরস্পরের গায়ের উপর পড়িয়া কেবলি মাথা ঠোকাঠুকি করিত। তখন দুঃসাহসিকের দল চারিদিকে আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া বেড়াইত—কোথাও শান্তি ছিল না।

সে সময়ে সেখানকার ক্ষত্রিয়েরাই ছিল দেশের রক্ষক। তখন তাহাদের প্রাধান্য স্বাভাবিক ছিল। তখন লোক-সাধারণের সঙ্গে তাহাদের যে সম্বন্ধ ছিল সেটা কৃত্রিম নহে। তাহারা ছিল রক্ষাকর্ত্তা এবং শাসনকর্ত্তা। লোক-সাধারণে তাহাদিগকে স্বভাবতই আপনাদের উপরিবর্ত্তী বলিয়া মানিয়া লইত।

তাহার পরে ক্রমে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন য়ুরোপে রাজার জায়গাটা রাষ্ট্রতন্ত্র দখল করিতেছে, এখন লড়াইয়ের চেয়ে নীতি-কৌশল প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের আয়োজন পূর্ব্বের চেয়ে বাড়িয়াছে বই কমে নাই কিন্তু এখন যোদ্ধার চেয়ে যুদ্ধবিদ্যা বড়ো; এখন বীর্য্যের আসনে বিজ্ঞানের অভিষেক হইয়াছে। কাজেই য়ুরোপে সাবেক-কালের ক্ষত্রিয়-বংশীয়েরা এবং সেই সকল ক্ষত্রিয়-উপাধি-ধারীরা যদিও এখনো আপনাদের আভিজাত্যের গৌরব করিয়া থাকে তবু লোক-সাধারণের সঙ্গে তাহাদের স্বাভাবিক সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেছে। তাই রাষ্ট্রচালনার কাজে তাহাদের আধিপত্য কমিয়া আসিলেও সেটাকে জাগাইয়া তুলিবার জোর তাহাদের নাই।

শক্তির ধারাটা এখন ক্ষত্রিয়কে ছাড়িয়া বৈশ্যের কূলে বহিতেছে। লোক-সাধারণের কাঁধের উপরে তাহারা চাপিয়া বসিয়াছে। মানুষকে লইয়া তাহারা আপনার ব্যবসায়ের যন্ত্র বানাইতেছে। মানুষের পেটের জ্বালাই তাহাদের কলের ষ্টীম উৎপন্ন করে।

পূর্ব্বকালের ক্ষত্রিয়-নায়কের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ ছিল সেটা ছিল মানব-সম্বন্ধ। দুঃখ কষ্ট অত্যাচার যতই থাক্, তবু পরস্পরের মধ্যে হৃদয়ের আদান-প্রদানের পথ ছিল। এখন বৈশ্য মহাজনদের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যান্ত্রিক। কর্ম্মপ্রণালী নামক প্রকাণ্ড একটা জাঁতা

মানুষের আর সমস্তই গুঁড়া করিয়া দিয়া কেবল মজুরটুকুমাত্র বাকি রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।

ধনের ধর্ম্মই অসাম্য। জ্ঞান ধর্ম্ম কলা-সৌন্দর্য্য পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করিলে বাড়ে বই কমে না,—কিন্তু ধন জিনিষটাকে পাঁচজনের কাছ হইতে শোষণ করিয়া লইয়া পাঁচজনের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা না করিলে সে টেঁকে না। এই জন্য ধনকামী নিজের গরজে দারিদ্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে।

তাই ধনের বৈষম্য লইয়া যখন সমাজে পার্থক্য ঘটে তখন ধনীর দল সেই পার্থক্যকে সমূলে ঘুচাইতে ইচ্ছা করে না, অথচ সেই পার্থক্যটা যখন বিপদজনক হইয়া উঠে তখন বিপদটাকে কোনোমতে ঠেকো দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে চায়।

তাই ওদেশে শ্রমজীবীর দল যতই গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে ততই তাহাদিগকে ক্ষুধার অন্ন না দিয়া ঘুম-পাড়াইবার গান গাওয়া হইতেছে; তাহাদিগকে অল্পস্বল্প এটা-ওটা দিয়া কোনোমতে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা। কেহ বলে উহাদের বাসা একটু ভালো করিয়া দাও, কেহ বলে যাহাতে উহারা দু চামচ সুপ খাইয়া কাজে যাইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করো, কেহবা তাহাদের বাড়িতে গিয়া মিষ্টমুখে কুশল জিজ্ঞাসা করে, শীতের দিনে কেহবা আপন উদ্বৃত্ত গরম কাপড়টা তাহাদিগকে পাঠাইয়া দেয়।

এমনি করিয়া ধনের প্রকাণ্ড জালের মধ্যে আট্‌কা পড়িয়া লোক-সাধারণ ছটফট করিয়া উঠিয়াছে। ধনের চাপটা যদি এত জোরের সঙ্গে তাহাদের উপর না পড়িত তবে তাহারা জমাট বাঁধিত না—এবং তাহারা যে, কেহ বা কিছু তাহা কাহারো খবরে আসিত না। এখন ওদেশে লোক-সাধারণ কেবল সেন্সস্‌-রিপোর্টের তালিকাভুক্ত নহে;

সে একটা শক্তি। সে আর ভিক্ষা করে না, দাবি করে। এই জন্য তাহার কথা দেশের লোকে আর ভুলিতে পারিতেছে না; সকলকে সে বিষম ভাবাইয়া তুলিয়াছে।

এই লইয়া পশ্চিমদেশে নিয়ত যে সব আলোচনা চলিতেছে আমরা তাহাদের কাগজে পত্রে তাহা সর্ব্বদাই পড়িতে পাই। ইহাতে হঠাৎ এক একবার আমাদের ধর্ম্ম-বুদ্ধি চমক খাইয়া উঠে। বলে, তবে তো আমাদেরও ঠিক এই রকম আলোচনা কর্ত্তব্য।

ভুলিয়া যাই ওদেশে কেবলমাত্র আলোচনার নেশায় আলোচনা নহে, তাহা নিতান্তই প্রাণের দায়ে। এই আলোচনার পশ্চাতে নানা বোঝাপড়া, নানা উপায়-অন্বেষণ আছে। কারণ সেখানে শক্তির সঙ্গে শক্তির লড়াই চলিতেছে,—যাহারা অক্ষমকে অনুগ্রহ করিয়া চিত্ত-বিনোদন ও অবকাশ-যাপন করিতে চায় এ তাহাদের সেই বিলাসকলা নহে।

আমাদের দেশে লোক-সাধারণ এখনো নিজেকে লোক বলিয়া জানে না, সেইজন্য জানান্ দিতেও পারে না। আমরা তাহাদিগকে ইংরেজি বই পড়িয়া জানিব এবং অনুগ্রহ করিয়া জানিব, সে জানায় তাহারা কোনো জোর পায় না, ফলও পায় না। তাহাদের নিজের অভাব ও বেদনা তাহাদের নিজের কাছে বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত। তাহাদের একলার দুঃখ যে একটি বিরাট দুঃখের অন্তর্গত এইটি জানিতে পারিলে তবে তাহাদের দুঃখ সমস্ত সমাজের পক্ষে একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইত। তখন সমাজ, দয়া করিয়া নহে, নিজের গরজে সেই সমস্যার মীমাংসায় লাগিয়া যাইত। পরের ভাবনা ভাবা তখনি সত্য হয়, পর যখন আমাদিগকে ভাবাইয়া তোলে। অনুগ্রহ করিয়া

ভাবিতে গেলে কথায় কথায় অন্যমনস্ক হইতে হয় এবং ভাবনাটা নিজের দিকেই বেশি করিয়া ঝোঁকে।

সাহিত্য সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। আমরা যদি আপনার উচ্চতার অভিমানে পুলকিত হইয়া মনে করি যে ঐ সব সাধারণ লোকদের জন্য আমরা লোকসাহিত্য সৃষ্টি করিব তবে এমন জিনিষের আমদানি করিব যাহাকে বিদায় করিবার জন্য দেশে ভাঙা কুলা দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিবে। ইহা আমাদের ক্ষমতায় নাই। আমরা যেমন অন্য মানুষের হইয়া খাইতে পারি না, তেমনি আমরা অন্য মানুষের হইয়া বাঁচিতে পারি না। সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ, তাহা তো প্রয়োজনের প্রকাশ নহে। চিরদিনই লোকসাহিত্য লোক আপনি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। দয়ালু বাবুদের উপর বরাৎ দিয়া সে আমাদের কলেজের দোতলার ঘরের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া বসিয়া নাই। সকল সাহিত্যেরই যেমন এই লোকসাহিত্যেরও সেই দশা। অর্থাৎ ইহাতে ভালো মন্দ মাঝারি সকল জাতেরই জিনিষ আছে। ইহার যাহা ভালো তাহা অপরূপ ভালো—জগতের কোনো রসিক সভায় তাহার কিছুমাত্র লজ্জা পাইবার কারণ নাই। অতএব দয়ার তাগিদে আমাদের কলেজের কোনো ডিক্রীধারীকেই লোকসাহিত্যের মুরুব্বিয়ানা করা সাজিবে না। স্বয়ং বিধাতাও অনুগ্রহের জোরে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন না, তিনি অহেতুক আনন্দের জোরেই এই যাহা কিছু রচিয়াছেন। যেখানেই হেতু আসিয়া মুরুব্বি হইয়া বসে সেইখানেই সৃষ্টি মাটি হয়। এবং যেখানেই অনুগ্রহ আসিয়া সকলের চেয়ে বড়ো আসনটা লয় সেইখান হইতেই কল্যাণ বিদায় গ্রহণ করে।

আমাদের ভদ্রসমাজ আরামে আছে কেননা আমাদের লোক-সাধারণ নিজেকে বোঝে নাই। এই জন্যই জমিদার তাহাদিগকে মারিতেছে,

মহাজন তাহাদিগকে ধরিতেছে, মনিব তাহাদিগকে গালি দিতেছে, পুলিস তাহাদিগকে শুষিতেছে, গুরুঠাকুর তাহাদের মাথায় হাত বুলাইতেছে, মোক্তার তাহাদের গাঁট কাটিতেছে, আর তাহারা কেবল সেই অদৃষ্টের নামে নালিশ করিতেছে যাহার নামে সমন-জারি করিবার জো নাই। আমরা বড়ো জোর ধর্ম্মের দোহাই দিয়া জমিদারকে বলি তোমার কর্ত্তব্য করো, মহাজনকে বলি তোমার সুদ কমাও, পুলিসকে বলি তুমি অন্যায় করিয়ো না—এমন করিয়া নিতান্ত দুর্ব্বলভাবে কতদিন ঠেকাইব। চালুনিতে করিয়া জল আনাইব আর বাহককে বলিব যতটা পারো তোমার হাত দিয়া ছিদ্র সামলাও—সে হয় না; তাহাতে কোনো এক সময়ে এক মুহূর্ত্তের কাজ চলে কিন্তু চিরকালের এ ব্যবস্থা নয়। সমাজে দয়ার চেয়ে দায়ের জোর বেশি।

অতএব সব প্রথমে দরকার, লোকেরা আপনাদের পরস্পরের মধ্যে যাহাতে একটা যোগ দেখিতে পায়। অর্থাৎ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা রাস্তা থাকা চাই। সেটা যদি রাজপথ না হয় তো অন্তত গলি রাস্তা হওয়া চাই।

লেখাপড়া শেখাই এই রাস্তা। যদি বলি জ্ঞান শিক্ষা, তাহা হইলে তর্ক উঠিবে, আমাদের চাষাভুষারা যাত্রার দল ও কথকঠাকুরের কৃপায় জ্ঞান শিক্ষায় সকল দেশের অগ্রগণ্য। যদি বলি উচ্চ শিক্ষা, তাহা হইলে ভদ্রসমাজে খুব একটা উচ্চহাস্য উঠিবে,—সেটাও সহিতে পারিতাম যদি আশু এই প্রস্তাবটার কোনো উপযোগিতা থাকিত।

আমি কিন্তু সব চেয়ে কম করিয়াই বলিতেছি কেবলমাত্র লিখিতে পড়িতে শেখা। তাহা কিছু লাভ নহে তাহা কেবলমাত্র রাস্তা—সেও পাড়াগাঁয়ের মেটে রাস্তা। আপাতত এই যথেষ্ট— কেননা এই রাস্তাটা না হইলেই মানুষ আপনার কোণে আপনি বদ্ধ হইয়া থাকে। তখন

তাহাকে যাত্রা কথকতার যোগে সাংখ্য যোগ বেদান্ত পুরাণ ইতিহাস সমস্তই শুনাইয়া যাইতে পারো, তাহার আঙিনায় হরিনাম-সঙ্কীর্তনেরও ধুম পড়িতে পারে কিন্তু এ কথা তাহার স্পষ্ট বুঝিবার উপায় থাকে না যে সে একা নহে, তাহার যোগ কেবলমাত্র অধ্যাত্মযোগ নহে—একটা বৃহৎ লৌকিক যোগ।

দূরের সঙ্গে নিকটের, অনুপস্থিতের সঙ্গে উপস্থিতের সম্বন্ধপথটা সমস্ত দেশের মধ্যে অবাধে বিস্তীর্ণ হইলে তবেই তো দেশের অনুভব-শক্তিটা ব্যাপ্ত হইয়া উঠিবে। মনের চলাচল যতখানি, মানুষ ততখানি বড়ো। মানুষকে শক্তি দিতে হইলে মানুষকে বিস্তৃত করা চাই।

তাই আমি এই বলি, লিখিতে পড়িতে শিখিয়া মানুষ কী শিখিবে ও কতখানি শিখিবে সেটা পরের কথা, কিন্তু সে যে অন্যের কথা আপনি শুনিবে ও আপনার কথা অন্যকে শোনাইবে; এমনি করিয়া সে যে আপনার মধ্যে বৃহৎ মানুষকে ও বৃহৎ মানুষের মধ্যে আপনাকে পাইবে —তাহার চেতনার অধিকার যে চারিদিকে প্রশস্ত হইয়া যাইবে এইটেই গোড়াকার কথা।

য়ুরোপে লোক-সাধারণ আজ যে এক হইয়া উঠিবার শক্তি পাইয়াছে তাহার কারণ এ নয় যে তাহারা সকলেই পরম পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। হয়তো আমাদের দেশাভিমানীরা প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন যে পরা-বিদ্যা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা আমাদের দেশের সাধারণ লোকে তাহাদের চেয়ে বেশি বোঝে, কিন্তু ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই যে য়ুরোপের সাধারণ লোকে লিখিতে পড়িতে শিখিয়া পরস্পরের কাছে পৌঁছিবার উপায় পাইয়াছে, হৃদয়ে হৃদয়ে গতিবিধির একটা মস্ত বাধা দূর হইয়া গেছে। এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, য়ুরোপে লোকশিক্ষা আপাততঃ অগভীর হইলেও তাহা যদি ব্যাপ্ত না হইত তবে আজ সেখানে লোক-

সাধারণ নামক যে সত্তা আপনার শক্তির গৌরবে জাগিয়া উঠিয়া আপন প্রাপ্য দাবি করিতেছে তাহাকে দেখা যাইত না। তাহা হইলে যে গরীব সে ক্ষণে ক্ষণে ধনীর প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইত, যে ভৃত্য সে মনিবের পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া পড়িয়া থাকিত এবং যে মজুর সে মহাজনের লাভের উচ্ছিষ্টকণামাত্র খাইয়া ক্ষুধাদগ্ধ পেটের একটা কোণ-মাত্র ভরাইত।

লোকহিতৈষীরা বলিবেন, আমরা তো সেই কাজেই লাগিয়াছি—আমরা তো নাইট স্কুল খুলিয়াছি। কিন্তু ভিক্ষার দ্বারা কেহ কখনো সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না। আমরা ভদ্রলোকেরা যে শিক্ষা লাভ করিতেছি সেটাতে আমাদের অধিকার আছে বলিয়া আমরা অভিমান করি,—সেটা আমাদিগকে দান করা অনুগ্রহ করা নয়, কিন্তু সেটা হইতে বঞ্চিত করা আমাদের প্রতি অন্যায় করা। এই জন্য আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় কোনো খর্ব্বতা ঘটিলে আমরা উত্তেজিত হইয়া উঠি। আমরা মাথা তুলিয়া শিক্ষা দাবী করি। সেই দাবী ঠিক গায়ের জোরের নহে, তাহা ধর্ম্মের জোরের। কিন্তু লোক-সাধারণেরও সেই জোরের দাবী আছে; যতদিন তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা না হইতেছে ততদিন তাহাদের প্রতি অন্যায় জমা হইয়া উঠিতেছে এবং সেই অন্যায়ের ফল আমরা প্রত্যেকে ভোগ করিতেছি একথা যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা স্বীকার না করিব ততক্ষণ দয়া করিয়া তাহাদের জন্য এক-আধটা নাইট স্কুল খুলিয়া কিছুই হইবে না। সকলের গোড়ায় দরকার লোক-সাধারণকে লোক বলিয়া নিশ্চিতরূপে গণ্য করা।

কিন্তু সমস্যাটা এই যে, দয়া করিয়া গণ্য করাটা টেঁকে না। তাহারা শক্তি লাভ করিয়া যেদিন গণ্য করাইবে সেই দিনই সমস্যার মীমাংসা হইবে। সেই শক্তি যে তাহাদের নাই তাহার কারণ তাহারা অজ্ঞতার

দ্বারা বিচ্ছিন্ন। রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি তাহাদের মনের রাস্তা তাহাদের যোগের রাস্তা খুলিয়া না দেয় তবে দয়ালু লোকের নাইট স্কুল খোলা অশ্রু বর্ষণ করিয়া অগ্নিদাহ নিবারণের চেষ্টার মতো হইবে। কারণ, এই লিখিতে পড়িতে শেখা তখনি যথার্থ ভাবে কাজে লাগিবে যখন তাহা দেশের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী হইবে। সোনার আঙটি কড়ে আঙুলের মাপে হইলেও চলে কিন্তু একটা কাপড় সেই মাপের হইলে তাহা ঠাট্টার পক্ষেও নেহাৎ ছোটো হয়—দেহটাকে এক-আবরণে আবৃত করিতে পারিলেই তবে তাহা কাজে দেখে। সামান্য লিখিতে পড়িতে শেখা দুই চার জনের মধ্যে বদ্ধ হইলে তাহা দামী জিনিষ হয় না, কিন্তু সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হইলে তাহা দেশের লজ্জা রক্ষা করিতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শক্তির সঙ্গে শক্তির বোঝাপড়া হইলে তবেই সেটা সত্যকার কারবার হয়। এই সত্যকার কারবারে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। য়ুরোপে শ্রমজীবীরা যেমনি বলিষ্ঠ হইয়াছে অমনি সেখানকার বণিকরা জবাবদিহির দায়ে পড়িয়াছে। ইহাতেই দুইপক্ষের সম্বন্ধ সত্য হইয়া উঠিবে—অর্থাৎ যেটা বরাবর সহিবে সেইটেই দাঁড়াইয়া যাইবে, সেইটেই উভয়েরই পক্ষে কল্যাণের। স্ত্রীলোককে সাধ্বী রাখিবার জন্য পুরুষ সমস্ত সামাজিক শক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে খাড়া করিয়া রাখিয়াছে—তাই স্ত্রীলোকের কাছে পুরুষের কোনো জবাবদিহি নাই—ইহাতেই স্ত্রীলোকের সহিত সম্বন্ধে পুরুষ সম্পূর্ণ কাপুরুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; স্ত্রীলোকের চেয়ে ইহাতে পুরুষের ক্ষতি অনেক বেশি। কারণ দুর্ব্বলের সঙ্গে ব্যবহার করার মতো এমন দুর্গতিকর আর কিছুই নাই। আমাদের সমাজ লোক-সাধারণকে যে শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে এইখানেই সে নিজের শক্তিকে অপহরণ করিতেছে। পরের অস্ত্র কাড়িয়া লইলে নিজের অস্ত্র নির্ভয়ে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে—এইখানেই মানুষের পতন।

আমাদের দেশের জনসাধারণ আজ জমিদারের, মহাজনের, রাজপুরুষের, মোটের উপর সমস্ত ভদ্রসাধারণের দয়ার অপেক্ষা রাখিতেছে, ইহাতে তাহারা ভদ্রসাধারণকে নামাইয়া দিয়াছে। আমরা ভৃত্যকে অনায়াসে মারিতে পারি, প্রজাকে অনায়াসে অতিষ্ঠ করিতে পারি, গরীব মূর্খকে অনায়াসে ঠকাইতে পারি ;—নিম্নতনদের সহিত ন্যায়-ব্যবহার করা, মানহীনদের সহিত শিষ্টাচার করা নিতান্তই আমাদের ইচ্ছার পরে নির্ভর করে, অপর পক্ষের শক্তির পরে নহে, এই নিরন্তর সঙ্কট হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্যই আমাদের দরকার হইয়াছে নিম্নশ্রেণীয়দের শক্তিশালী করা। সেই শক্তি দিতে গেলেই তাহাদের হাতে এমন একটি উপায় দিতে হইবে যাহাতে ক্রমে তাহারা পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারে—সেই উপায়টিই তাহাদের সকলকেই লিখিতে-পড়িতে শেখানো।

১৩২১

লড়াইয়ের মূল

অগ্রহায়ণের সবুজপত্রে সম্পাদক বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে যে কয়টি কথা বলিয়াছেন তাহা পাকা কথা, সুতরাং তাহাতে শাঁসও আছে রসও আছে। ইহার উপরে আর বেশি কিছু বলিবার দরকার নাই—সেই ভরসাতেই লিখিতে বসিলাম।

সম্পাদক বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, এবারকার যে লড়াই তাহা সৈনিকে বণিকে লড়াই, ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে। পৃথিবীতে চিরকালই পণ্য-জীবির পরে অস্ত্রধারীর একটা স্বাভাবিক অবজ্ঞা আছে—বৈশ্যের কর্ত্তৃত্ব ক্ষত্রিয় সহিতে পারে না। তাই জর্ম্মনি আপন ক্ষত্রতেজের দর্পে ভারি একটা অবজ্ঞার সহিত এই লড়াই করিতে লাগিয়াছে।

য়ুরোপে যে চার বর্ণ আছে তার মধ্যে ব্রাহ্মণটি তাঁর যজন যাজন ছাড়িয়া দিয়া প্রায় সরিয়া পড়িয়াছেন। যে খৃষ্টসঙ্ঘ বর্ত্তমান য়ুরোপের শিশু-বয়সে উঁচু চৌকিতে বসিয়া বেত-হাতে গুরুমহাশয়-গিরি করিয়াছে আজ সে তার বয়ঃপ্রাপ্ত শিষ্যের দেউড়ির কাছে বসিয়া থাকে—সাবেক কালের খাতিরে কিছু তার বরাদ্দ বাঁধা আছে কিন্তু তার সেই চৌকিও নাই, তার সেই বেতগাছটাও নাই। এখন তাহাকে এই শিষ্যটির মন জোগাইয়া চলিতে হয়। তাই যুদ্ধে বিগ্রহে, পরজাতির সহিত ব্যবহারে, য়ুরোপ যত কিছু অন্যায় করিয়াছে খৃষ্টসঙ্ঘ তাহাতে আপত্তি করে নাই বরঞ্চ ধর্ম্মকথার ফোড়ঙ দিয়া তাহাকে উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে।

এদিকে ক্ষত্রিয়ের তলোয়ার প্রায় বেবাক গলাইয়া ফেলিয়া লাঙলের

ফলা তৈরি হইল। তাই ক্ষত্রিয়ের দল বেকার বসিয়া বৃথা গোঁফে চাড়া দিতেছে। তাহারা শেঠজির মালখানার দ্বারে দরোয়ানগিরি করিতেছে মাত্র। বৈশ্যই সব চেয়ে মাথা তুলিয়া উঠিল।

এখন সেই ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে "অন্তযুদ্ধস্ত্বয়াময়া"। দ্বাপর যুগে আমাদের হলধর বলরাম দাদা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগ দেন নাই। কলিযুগে তাঁর পরিপূর্ণ মদের ভাঁড়টিতে হাত পড়িবামাত্র তিনি হুঙ্কার দিয়া ছুটিয়াছেন। এবারকার কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রধান সর্দ্দার কৃষ্ণ নহেন, বলরাম। রক্তপাতে তাঁর রুচি নাই—রজতফেনোচ্ছল মদের ঢোঁক গিলিয়া এতকাল ধরিয়া তাঁর নেশা কেবলি চড়িয়া উঠিতেছিল; এবারকার এই আচম্‌কা উৎপাতে সেই নেশা কিছু ছুটিতে পারে কিন্তু আবার সময়কালে দ্বিগুণ বেগে মৌতাত জমিবে সে আশঙ্কা আছে।

ইহার পরে আর একটা লড়াই সাম্‌নে রহিল সে বৈশ্যে শূদ্রে মহাজনে মজুরে—কিছুদিন হইতে তার আয়োজন চলিতেছে। সেইটে চুকিলেই বর্ত্তমান মনুর পালা শেষ হইয়া নূতন মন্বন্তর পড়িবে।

বণিকে সৈনিকে লড়াই তো বাধিল কিন্তু এই লড়াইয়ের মূল কোথায় সেটা জিজ্ঞাসা করিবার বিষয়। সাবেক-কালের ইতিহাসে দেখা যায় যারা কারবারী তারা রাজশক্তির আশ্রয় পাইয়াছে, কখনো বা প্রশয় পাইয়াছে, কখনো বা অত্যাচার ও অপমান সহিয়াছে কিন্তু লড়াইয়ের আসরে তাহাদিগকে নামিতে হয় নাই। সেকালে ধন এবং মান স্বতন্ত্র ছিল, কাজেই ব্যবসায়ীকে তখন কেহ খাতির করিত না বরঞ্চ অবজ্ঞাই করিত।

কেননা জিনিষ লইয়া মানুষের মূল্য নহে, মানুষ লইয়াই মানুষের মূল্য। তাই যেকালে ক্ষত্রিয়েরা ছিল গণপতি এবং বৈশ্যেরা ছিল ধনপতি তখন তাহাদের মধ্যে ঝগড়া ছিল না।

তখন ঝগড়া ছিল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে। কেননা তখন ব্রাহ্মণ তো কেবলমাত্র যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন লইয়া ছিল না,—মানুষের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল। তাই ক্ষত্রিয় প্রভু ও ব্রাহ্মণ প্রভুতে সর্ব্বদাই ঠেলাঠেলি চলিত;—বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রে আপস্ করিয়া থাকা শক্ত। য়ুরোপেও রাজায় পোপে বাঁও-কষাকষির অন্ত ছিল না।

কারবার জিনিষটা দেনাপাওনার জিনিষ; তাহাতে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েরই উভয়ের মন রাখিবার গরজ আছে। প্রভুত্ব জিনিষটা ঠিক তার উল্টা, তাহাতে গরজ কেবল এক পক্ষের। তাহাতে এক পক্ষ বোঝা হইয়া চাপিয়া বসে অন্য পক্ষই তাহা বহন করে।

প্রভুত্ব জিনিষটা একটা ভার, মানুষের সহজ চলাচলের সম্বন্ধের মধ্যে একটা বাধা। এই জন্য প্রভুত্বই যত কিছু বড়ো বড়ো লড়াইয়ের মূল। বোঝা নামাইয়া ফেলিতে যদি না পারি অন্তত বোঝা সরাইতে না পারিলে বাঁচি না। পাল্কীর বেহারা তাই বারবার কাঁধ বদল করে। মানুষের সমাজকেও এই প্রভুত্বের বোঝা লইয়া বারবার কাঁধ বদল করিতে হয়—কেননা তাহা তাহাকে বাহির হইতে চাপ দেয়। বোঝা অচল হইয়া থাকিতে চায় বলিয়াই মানুষের প্রাণ-শক্তি তাহাকে সচল করিয়া তোলে। এই জন্যই লক্ষ্মী চঞ্চলা। লক্ষ্মী যদি অচঞ্চল হইতেন তবে মানুষ বাঁচিত না।

ইতিপূর্ব্বে মানুষের উপর প্রভুত্বচেষ্টা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের মধ্যেই বদ্ধ ছিল এই কারণে তখনকার যত কিছু শস্ত্রের ও শাস্ত্রের লড়াই তাহাদিগকে লইয়া। কারবারীরা হাটে মাঠে গোঠে ঘাটে ফিরিয়া বেড়াইত, লড়াইয়ের ধার ধারিত না।

সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব্ব বিবাহ ঘটিয়া গেছে।

এক সময়ে জিনিষই ছিল বৈশ্যের সম্পত্তি, এখন মানুষ তার সম্পত্তি হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সাবেককালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাৎ কী তাহা বুঝিয়া দেখা যাক্। সে আমলে যেখানে রাজত্ব রাজাও সেই-খানেই—জমাখরচ সব এক জায়গাতেই।

কিন্তু এখন বাণিজ্যপ্রবাহের মতো রাজত্বপ্রবাহের দিনরাত আমদানি রফতানি চলিতেছে। ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নূতন কাণ্ড ঘটিতেছে—তাহা এক দেশের উপর আর এক দেশের রাজত্ব এবং সেই দুই দেশ সমুদ্রের দুই পারে।

এত বড়ো বিপুল প্রভুত্ব জগতে আর কখনো ছিল না।

য়ুরোপের সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এসিয়া ও আফ্রিকা।

এখন মুস্কিল হইয়াছে জর্ম্মনির। তার ঘুম ভাঙিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে ভোজের শেষবেলায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত। ক্ষুধা যথেষ্ট, মাছেরও গন্ধ পাইতেছে অথচ কাঁটা ছাড়া আর বড়ো কিছু বাকি নাই। এখন রাগে তার শরীর গস্‌গস্ করিতেছে। সে বলিতেছে আমার জন্য যদি পাত পাড়া না হইয়া থাকে আমি নিমন্ত্রণ-পত্রের অপেক্ষা করিব না। আমি গায়ের জোরে যার পাই তার পাত কাড়িয়া লইব।

এক সময় ছিল যখন কাড়িয়া কুড়িয়া লইবার বেলায় ধর্ম্মের দোহাই পাড়িবার কোনো দরকার ছিল না। এখন তার দরকার হইয়াছে। জর্ম্মনির নীতিপ্রচারক পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, যারা দুর্ব্বল, ধর্ম্মের দোহাই তাদেরই দরকার; যারা প্রবল, তাদের ধর্ম্মের প্রয়োজন নাই, নিজের গায়ের জোরই যথেষ্ট।

আজ ক্ষুধিত জর্ম্মনির বুলি এই যে, প্রভু এবং দাস এই দুই জাতের মানুষ আছে। প্রভু সমস্ত আপনার জন্য লইবে, দাস সমস্তই প্রভুর জন্য

জোগাইবে—যার জোর আছে সে রথ হাঁকাইবে, যার জোর নাই সে পথ করিয়া দিবে।

য়ুরোপের বাহিরে যখন এই নীতির প্রচার হয় তখন য়ুরোপ ইহার কটুত্ব বুঝিতে পারে নাই।

আজ তাহা নিজের গায়ে বাজিতেছে। কিন্তু জর্ম্মন পণ্ডিত যে তত্ত্ব আজ প্রচার করিতেছে এবং যে তত্ত্ব আজ মদের মতো জর্ম্মনিকে অন্যায় যুদ্ধে মাতাল করিয়া তুলিল সে তত্ত্বের উৎপত্তি তো জর্ম্মন পণ্ডিতের মগজের মধ্যে নহে, বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে।

১৩২১

কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম

একটু বাদলার হাওয়া দিয়াছে কি, অম্‌নি আমাদের গলি ছাপাইয়া সদর রাস্তা পর্য্যন্ত বন্যা বহিয়া যায়, পথিকের জুতাজোড়াটা ছাতার মতোই শিরোধার্য্য হইয়া উঠে, এবং অন্তত এই গলি-চর জীবেরা উভচর জীবের চেয়ে জীবনযাত্রায় যোগ্যতর নয় শিশুকাল হইতে আমাদের বারান্দা হইতে এইটে বছর বছর লক্ষ্য করিতে করিতে আমার চুল পাকিয়া গেল।

ইহার মধ্যে প্রায় ষাট বছর পার হইল। তখন বাষ্প ছিল কলীয় যুগের প্রধান বাহন, এখন বিদ্যুৎ তাহাকে কটাক্ষ করিয়া হাসিতে সুরু করিয়াছে; তখন পরমাণুতত্ত্ব পৌঁছিয়াছিল অদৃশ্যে, এখন তাহা অভাব্য হইয়া উঠিল; ওদিকে মরিবার কালের পিঁপড়ার মতো মানুষ আকাশে পাখা মেলিয়াছে, একদিন এই আকাশেরও ভাগবখ্‌রা লইয়া সরিকদের মধ্যে মামলা চলিবে এটর্ণি তার দিন গণিতেছে; চীনের মানুষ একরাত্রে তাদের সনাতন টিকি কাটিয়া সাফ করিল, এবং জাপান কালসাগরে এমন এক বিপর্য্যয় লাফ মারিল যে, পঞ্চাশ বছরে পাঁচশো বছর পার হইয়া গেল। কিন্তু বর্ষার জলধারা সম্বন্ধে আমাদের রাস্তার আতিথেয়তা যেমন ছিল তেমনই আছে। যখন কন্‌গ্রেসের ক অক্ষরেরও পত্তন হয় নাই তখনো এই পথের পথিকবধূদের বর্ষার গান ছিল—

কতকাল পরে পদচারী ওরে
দুখসাগর সাঁতরি পার হবে?

আর আজ যখন হোমরুলের পাকা ফলটা প্রায় আমাদের গোঁফের কাছে ঝুলিয়া পড়িল—আজও সেই একই গান—মেঘমল্লার রাগেণ, যতিতালাভ্যাং।

ছেলেবেলা হইতেই কাণ্ডটা দেখিয়া আসিতেছি সুতরাং ব্যাপারটা আমাদের কাছে অভাবনীয় নয়! যা অভাবনীয় নয় তা লইয়া কেহ ভাবনাই করে না। আমরাও ভাবনা করি নাই, সহ্যই করিয়াছি। কিন্তু চিঠিতে যে-কথাটা অমনিতে চোখ এড়াইয়া যায় সেটার নিচে লাইন কাটা দেখিলে যেমন বিশেষ করিয়া মনে লাগে, আমাদের রাস্তার জলাশয়তার নিচে তেমনি জোড়া লাইন কাটা দেখিয়া, শুধু মনটার মধ্যে নয় আমাদের গাড়ির চাকাতেও, ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগিল। বর্ষাও নামিয়াছে ট্রাম লাইনের মেরামতও সুরু। যার আরম্ভ আছে তার শেষও আছে ন্যায়শাস্ত্রে এই কথা বলে, কিন্তু ট্র্যামওয়ালাদের অন্যায় শাস্ত্রে মেরামতের আর শেষ দেখি না। তাই এবার লাইন কাটার সহযোগে যখন চিৎপুর রোডে জলস্রোতের সঙ্গে জনস্রোতের দ্বন্দ্ব দেখিয়া দেহমন আর্দ্র হইতে লাগিল তখন অনেক দিন পরে গভীরভাবে ভাবিতে লাগিলাম, সহ্য করি কেন?

সহ্য না করিলে যে চলে এবং না করিলেই যে ভালো চলে চৌরঙ্গী অঞ্চলে একবার পা বাড়াইলেই তা বোঝা যায়। একই সহর, একই ম্যুনিসিপালিটি, কেবল তফাৎটা এই, আমাদের সয় ওদের সয় না। যদি চৌরঙ্গী রাস্তার পনেরো আনার হিস্‌সা ট্র্যামেরই থাকিত, এবং রাস্তা উৎখাত করিয়া লাইন মেরামত এমন সুমধুর গজগমনে চলিত আজ তবে ট্র্যাম কোম্পানীর দিনে আহার রাত্রে নিদ্রা থাকিত না।

আমাদের নিরীহ ভালোমানুষটি বলেন, "সে কি কথা! আমাদের একটু অসুবিধা হইবে বলিয়াই কি ট্র্যামের রাস্তা মেরামত হইবে না?"

"হইবে বই কি! কিন্তু এমন আশ্চর্য্য সুস্থ মেজাজে এবং দীর্ঘ মেয়াদে নয়।"

নিরীহ ভালোমানুষটি বলেন—"সে কি সম্ভব?"

যা হইতেছে তার চেয়ে আরো ভালো হইতে পারে এই ভরসা ভালোমানুষদের নাই বলিয়াই অহরহ চক্ষের জলে তাদের বক্ষ ভাসে এবং তাদের পথঘাটেরও প্রায় সেই দশা। এমনি করিয়া দুঃখকে আমরা সর্ব্বাঙ্গে মাখি এবং ভাঙা পিপের আলকাৎরার মতো সেটাকে দেশের চারদিকে গডাইয়া ছড়াইয়া পড়িতে দিই।

কথাটা শুনিতে ছোটো, কিন্তু আসলে ছোটো নয়। কোথাও আমাদের কোনো কর্ত্তৃত্ব আছে এটা আমরা কিছুতেই পূরামাত্রায় বুঝিলাম না। বইয়ে পড়িয়াছি, মাছ ছিল কাঁচের টবের মধ্যে; সে অনেক মাথা খুঁড়িয়া অবশেষে বুঝিল যে কাঁচটা জল নয়। তার পরে সে বড়ো জলাশয়ে ছাড়া পাইল, তবু তার এটা বুঝিতে সাহস হইল না যে, জলটা কাঁচ নয়; তাই সে একটুখানি জায়গাতেই ঘুরিতে লাগিল। ঐ মাথা ঠুকিবার ভয়টা আমাদেরও হাড়েমাসে জড়ানো, তাই যেখানে সাঁতার চলিতে পারে সেখানেও মন চলে না। অভিমন্যু মায়ের গর্ভেই ব্যূহে প্রবেশ করিবার বিদ্যা শিখিল, বাহির হইবার বিদ্যা শিখিল না, তাই সে সর্ব্বাঙ্গে সপ্তরথীর মারটা খাইয়াছে। আমরাও জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই বাঁধা-পড়িবার বিদ্যাটাই শিখিলাম, গাঁঠ-খুলিবার বিদ্যাটা নয়; তারপর জন্মমাত্রই বুদ্ধিটা হইতে সুরু করিয়া চলা-ফেরাটা পর্য্যন্ত পাকে পাকে জড়াইলাম, আর সেই হইতেই জগতে যেখানে যত রথী আছে, এমন কি পদাতিক পর্য্যন্ত সকলের মার খাইয়া মরিতেছি। মানুষকে, পুঁথিকে, ইসারাকে, গণ্ডীকে বিনাবাক্যে পুরুষে পুরুষে মানিয়া চলাই এমনি আমাদের অভ্যস্ত যে, জগতে কোথাও যে আমাদের কর্ত্তৃত্ব আছে

তাহা চোখের সামনে সশরীরে উপস্থিত হইলেও কোনো মতেই ঠাহর হয় না, এমন কি, বিলাতী চষমা পরিলেও না।

মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো কথাটাই এই যে, কর্ত্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার। নানা মন্ত্রে, নানা শ্লোকে, নানা বিধিবিধানে এই কথাটা যে-দেশে চাপা পড়িল, বিচারে পাছে এতটুকু ভুল হয় এইজন্য যে-দেশে মানুষ আচারে আপনাকে আষ্টেপিষ্টে বাঁধে, চলিতে গেলে পাছে দূরে গিয়া পড়ে এইজন্য নিজের পথ নিজেই ভাঙিয়া দেয়, সেই দেশে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মানুষকে নিজের পরে অপরিসীম অশ্রদ্ধা করিতে শেখানো হয় এবং সেই দেশে দাস তৈরি করিবার জন্য সকলের চেয়ে বড়ো কারখানা খোলা হইয়াছে।

আমাদের রাজপুরুষেরাও শাস্ত্রীয় গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে এই কথাই বলিয়া থাকেন—"তোমরা ভুল করিবে, তোমরা পারিবে না, অতএব তোমাদের হাতে কর্ত্তৃত্ব দেওয়া চলিবে না।"

আর যাই হোক, মনু-পরাশরের এই আওয়াজটা ইংরেজি গলায় ভারি বেসুর বাজে, তাই আমরা তাঁদের যে-উত্তরটা দিই সেটা তাঁদেরই সহজ সুরের কথা। আমরা বলি, ভুল করাটা তেমন সর্ব্বনাশ নয় স্বাধীনকর্ত্তৃত্ব না-পাওয়াটা যেমন। ভুল করিবার স্বাধীনতা থাকিলে তবেই সত্যকে পাইবার স্বাধীনতা থাকে। নিখুঁৎ নির্ভুল হইবার আশায় যদি নিরঙ্কুশ নির্জ্জীব হইতে হয় তবে তার চেয়ে না হয় ভুলই করিলাম।

আমাদের বলিবার আরো কথা আছে। কর্ত্তৃপক্ষদের এ-কথাও স্মরণ করাইতে পারি যে, আজ তোমরা আত্মকর্ত্তৃত্বের মোটর গাড়ি চালাইতেছ কিন্তু একদিন রাত-থাকিতে যখন গোরুর গাড়িতে যাত্রা সুরু হইয়াছিল তখন খাল-খন্দর মধ্য দিয়া চাকা দুটোর আর্ত্তনাদ ঠিক জয়ধ্বনির মতো শোনাইত না। পার্লামেণ্ট বরাবরই ডাইনে বাঁয়ে প্রবল ঝাঁকানি খাইয়া

এক নজির হইতে আর এক নজিরের লাইন কাটিতে কাটিতে আসিয়াছে, গোড়াগুড়িই ষ্টিমরোলার-টানা পাকা রাস্তা পান নাই। কত ঘুষঘাষ, ঘুষাঘুষি, দলাদলি, অবিচার এবং অব্যবস্থার মধ্য দিয়া সে হেলিয়া হেলিয়া চলিয়াছে। কখনো রাজা, কখনো গির্জ্জা, কখনো জমিদার, কখনো বা মদওয়ালারও স্বার্থ বহিয়াছে। এমন-এক সময় ছিল সদস্যেরা যখন জরিমানা ও শাসনের ভয়েই পার্লামেণ্টে হাজির হইত। আর গলদের কথা যদি বলো, কবেকার কালে সেই আয়র্লণ্ড আমেরিকার সম্বন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া আজকের দিনে বোয়ার যুদ্ধ এবং ডার্ডানেলিস মেসোপোটেমিয়া পর্য্যন্ত গলদের লম্বা ফর্দ্দ দেওয়া যায়; ভারতবিভাগের ফর্দ্দটাও নেহাৎ ছোটো নয়—কিন্তু সেটার কথায় কাজ নাই। আমেরিকার রাষ্ট্রতন্ত্রে কুবের দেবতার চরগুলি যে-সকল কুকীর্ত্তি করে সেগুলো সামান্য নয়। ড্রেফুসের নির্য্যাতন উপলক্ষ্যে ফ্রান্সের রাষ্ট্রতন্ত্রে সৈনিক-প্রাধান্যের যে-অন্যায় প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাতে রিপুর অন্ধশক্তিরই তো হাত দেখা যায়। এ-সকল সত্ত্বেও আজকের দিনে এ-কথায় কারো মনে সন্দেহ লেশমাত্র নাই যে, আত্ম-কর্ত্তৃত্বের চির-সচলতার বেগেই মানুষ ভুলের মধ্য দিয়াই ভুলকে কাটায়, অন্যায়ের গর্ত্তে ঘাড়-মোড় ভাঙিয়া পড়িয়াও ঠেলাঠেলি করিয়া উপরে ওঠে। এইজন্য মানুষকে পিছমোড়া বাঁধিয়া তার মুখে পায়সান্ন তুলিয়া দেওয়ার চেয়ে তাকে স্বাধীনভাবে অন্ন উপার্জ্জনের চেষ্টায় উপবাসী হইতে দেওয়াও ভালো।

এর চেয়েও একটা বড়ো কথা আমাদের বলিবার আছে,—সে এই যে, রাষ্ট্রীয় আত্মকর্ত্তৃত্বে কেবল যে সুব্যবস্থা বা দায়িত্ববোধ জন্মে তা নয়, মানুষের মনের আয়তন বড়ো হয়। কেবল পল্লীসমাজে, বা ছোটোছোটো সামাজিক শ্রেণীবিভাগে যাদের মন বদ্ধ, রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্বের অধিকার পাইলে তবেই মানুষকে বড়ো পরিধির মধ্যে দেখিবার তারা

সুযোগ পায়। এই সুযোগের অভাবে প্রত্যেক মানুষ মানুষ-হিসাবে ছোটো হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সে যখন মনুষ্যত্বের বৃহৎ ভূমিকার উপরে আপন জীবনকে না ছড়াইয়া দেখে তখন তার চিন্তা তার শক্তি তার আশাভরসা সমস্তই ছোটো হইয়া যায়। মানুষের এই আত্মার খর্ব্বতা তার প্রাণনাশের চেয়ে ঢের বেশি বড়ো অমঙ্গল। "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।" অতএব ভুল-চুকের সমস্ত আশঙ্কা মানিয়া লইয়াও আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। আমরা পড়িতে পড়িতে চলিব—দোহাই তোমার, আমাদের এই পড়ার দিকেই তাকাইয়া আমাদের চলার দিকে বাধা দিয়ো না।

এই জবাবই সত্য জবাব। যদি নাছোড়বান্দা হইয়া কোনো এক-গুঁয়ে মানুষ এই জবাব দিয়া কর্তৃপক্ষকে বেজার করিয়া তোলে তবে সেদিক হইতে সে interned হইতে পাবে কিন্তু এদিক হইতে বাহবা পায়। অথচ ঠিক এই জবাবটাই যদি আমাদের সমাজকর্ত্তাদের কাছে দাখিল করি, যদি বলি, "তোমরা বলো, যুগটা কলি, আমাদের বুদ্ধিটা কম, স্বাধীন বিচারে আমাদের ভুল হয়, স্বাধীন ব্যবহারে আমরা অপরাধ করি, অতএব মগজটাকে অগ্রাহ্য করিয়া পুঁথিটাকে শিরোধার্য্য করিবার জন্যই আমাদের নতশিরটা তৈরি, কিন্তু এতবড়ো অপমানের কথা আমরা মানিব না," তবে চণ্ডীমণ্ডপের চক্ষু রাঙা হইয়া ওঠে এবং সমাজকর্ত্তা তখনি সামাজিক internment-এর হুকুম জারি করেন। যাঁরা পোলিটিকাল আকাশে উড়িবার জন্য পাখা ঝটপট করেন তাঁরাই সামাজিক দাঁড়ের উপর পা-দুটোকে শক্ত শিকলে জড়াইয়া রাখেন।

আসল কথা, নৌকাটাকে ডাইনে চালাইবার জন্যও যে হাল, বাঁয়ে চালাইবার জন্যও সেই হাল। একটা মূলকথা আছে সেইটেকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই সমাজেও মানুষ সত্য হয়, রাষ্ট্রব্যাপারেও মানুষ সত্য

হয়। সেই মূলকথাটার ধারণা লইয়াই চিৎপুরের সঙ্গে চৌরঙ্গীর তফাৎ। চিৎপুর একেবারেই ঠিক করিয়া আছে যে, সমস্তই উপরওয়ালার হাতে। তাই সে নিজের হাত খালি করিয়া চিৎ হইয়া রহিল। চৌরঙ্গী বলে, কিছুতে আমাদের হাত নাই এ যদি সত্যই হইত তবে আমাদের হাত দুটোই থাকিত না। উপরওয়ালার হাতের সঙ্গে আমাদের হাতের একটা অবিচ্ছিন্ন যোগ আছে চৌরঙ্গী এই কথা মানে বলিয়াই জগৎ-টাকে হাত করিয়াছে, আর চিৎপুর তাহা মানে না বলিয়াই জগৎটাকে হাতছাড়া করিয়া দুই চক্ষুব তারা উল্টাইয়া শিবনেত্র হইয়া রহিল।

আমাদের ঘর-গড়া কুণো নিয়মকেই সব চেয়ে বড়ো মনে করিতে হইলে চোখ বুজিতে হয়। চোখ চাহিলে দেখি, বিশ্বের আগাগোড়া একটা বৃহৎ নিয়ম আছে। নিজের চেষ্টায় সেই নিয়মকে দখল করাই শক্তিলাভ সমৃদ্ধিলাভ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ—এই নিশ্চিত বোধটাই বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার পাকা ভিৎ। ব্যক্তি-বিশেষের সফলতা কোনো বিশেষ বিধানে নয়, বিশ্ববিধানে—এইটে শক্ত করিয়া জানাতেই শক্তির ক্ষেত্রে য়ুরোপের এতবড়ো মুক্তি।

আমরা কিন্তু দুই হাত উল্টাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছি—কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। সেই কর্ত্তাটিকে,—ঘরের বাপদাদা, বা পুলিসের দারোগা, বা পাণ্ডা পুরোহিত, বা স্মৃতিরত্ন, বা শীতলা, মনসা ওলাবিবি, দক্ষিণরায়, শনি, মঙ্গল, রাহু, কেতু—প্রভৃতি হাজার রকম নাম দিয়া নিজের শক্তিকে হাজার টুক্‌রা করিয়া আকাশে উড়াইয়া দিই।

কালেজী পাঠক বলিবেন—আমরা তো এ-সব মানি না! আমরা তো বসন্তর টিকা লই; ওলাউঠা হইলে নুনের জলের পিচকিরি লইবার আয়োজন করি; এমন কি, মশাবাহিনী ম্যালেরিয়াকে আজো আমরা দেবী বলিয়া খাড়া করি নাই, তাকে আমরা কীটস্য কীট বলিয়াই গণ্য

করি ;—এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রভরা তাবিজটাকে পেটভরা পিলের উপর ঝুলাইয়া রাখি।

মুখে কোন্‌টাকে মানি বা নাই মানি তাতে কিছু আসে যায় না কিন্তু ঐ মানার বিষে আমাদের মনের ভিতরটা জর্জ্জরিত। এই মানসিক কাপুরুষতার ভিত্তি একটা চরাচরব্যাপী অনিশ্চিত ভয়ের উপর। অখণ্ড বিশ্বনিয়মের মধ্যে প্রকাশিত অখণ্ড বিশ্বশক্তিকে মানি না বলিয়াই হাজার রকম ভয়ের কল্পনায় বুদ্ধিটাকে আগেভাগে বরখাস্ত করিয়া বসি। ভয় কেবলি বলে, কী জানি, কাজ কী! ভয় জিনিসটাই এই রকম। আমাদের রাজপুরুষদের মধ্যেও দেখি, রাজ্যশাসনের কোনো একটা ছিদ্র দিয়া ভয় ঢুকিলেই তারা পাশ্চাত্য স্বধর্ম্মকেই ভুলিয়া যায়,—যে ধ্রুব আইন তাদের শক্তির ধ্রুব নির্ভর তারই উপর চোখ বুজিয়া কুড়াল চালাইতে থাকে। তখন ন্যায়-রক্ষার উপর ভরসা চলিয়া যায়, প্রেষ্টিজ রক্ষাকে তার চেয়ে বড়ো মনে করে,—এবং বিধাতার উপর টেক্কা দিয়া ভাবে প্রজার চোখের জলটাকে গায়ের জোরে আণ্ডামানে পাঠাইতে পারিলেই তাদের পক্ষে লঙ্কার ধোঁয়াটাকে মনোরম করা যায়। এইটেই তো বিশ্ববিধানের প্রতি অবিশ্বাস, নিজের বিশেষ বিধানের প্রতি ভরসা। এর মূলে ছোটো ভয়, কিম্বা ছোটো লোভ, কিম্বা কাজকে সোজা করিবার অতি ছোটো চাতুরী। আমরাও অন্ধভয়ের তাড়ায় মনুষ্য-ধর্ম্মটাকে বিসর্জ্জন দিতে রাজি। ব্যতিব্যস্ত হইয়া, যেখানে যা-কিছু আছে এবং নাই, সমস্তকেই জোড়হাত করিয়া মানিতে লাগিয়াছি। তাই আমরা জীববিজ্ঞান বা বস্তুবিজ্ঞানই পড়ি আর রাষ্ট্রতন্ত্রের ইতিহাসে পরীক্ষাই পাশ করি—"কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম"—এই বীজমন্ত্রটাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি না। তাই যদিচ আমাদের একালের ভাগ্যে দেশে অনেকগুলি দশের কাজের পত্তন হইয়াছে তবু আমাদের সেকালের

ভাগ্যে সেই দশের কাজ একের কাজ হইয়া উঠিবার জন্য কেবলি ঠেলা মারিতে থাকে। কোথা হইতে খামকা একটা-না-একটা কর্ত্তা ফুঁড়িয়া ওঠে। তার একমাত্র কারণ, যে-দশের কথা হইতেছে তারা ওঠে বসে, খায় দায়, বিবাহ ও চিতারোহণ করে এবং পরকালে পিণ্ড লইতে হাত বাড়ায় কর্ত্তার ইচ্ছায়; কিসে পাপ কিসে পুণ্য, কে ঘরে ঢুকিলে হুঁকার জল ফেলিতে হইবে, ক-হাত ঘেরের কুয়ার জলে স্নান করা যায়, ভোক্তার ধর্ম্মরক্ষার পক্ষে ময়রার হাতের লুচিরই বা কী গুণ রুটিরই বা কী, ম্লেচ্ছের তৈরি মদেরই বা কী আর ম্লেচ্ছের ছোঁয়া জলেরই বা কী, কর্ত্তার ইচ্ছার উপর বরাৎ দিয়া সে-বিচার তারা চিরকালের মতো সারিয়া রাখিয়াছে। যদি বলি পানি-পাঁড়ে নোংরা ঘটি ডুবাইয়া যে-জল বাল্‌তিতে লইয়া ফিরিতেছে সেটা পানের অযোগ্য, আর পানি মিঞা ফিল্‌টার হইতে যে-জল আনিল সেটাই শুচি ও স্বাস্থ্যকর, তবে উত্তর শুনিব, ওটা তো তুচ্ছ যুক্তির কথা, কিন্তু ওটা তো কর্ত্তার ইচ্ছা নয়। যদি বলি, নাই হইল কর্ত্তার ইচ্ছা, তবে নিমন্ত্রণ বন্ধ। শুধু অতিথিসৎকার নয়, অন্ত্যেষ্টিসৎকার পর্য্যন্ত অচল। এত নিষ্ঠুর জবর্দস্তি দ্বারা যাদের অতি সামান্য খাওয়া-ছোঁওয়ার অধিকার পর্য্যন্ত পদে পদে ঠেকানো হয়, এবং সেটাকে যারা কল্যাণ বলিয়াই মানে তারা রাষ্ট্রব্যাপারে অবাধ অধিকার দাবি করিবার বেলায় সঙ্কোচ বোধ করে না কেন?

যখন আপন শক্তির মূলধন লইয়া জনসাধারণের কারবার না চলে তখন সকল ব্যাপারেই মানুষ দৈবের কাছে, গ্রহের কাছে, পরের কাছে হাত পাতিয়া ভয়ে ভয়ে কাটায়। এই ভাবটার বর্ণনা যদি কোথাও খুব স্পষ্ট করিয়া ফুটিয়া থাকে তাহা বাংলার প্রাচীন মঙ্গল কাব্যে। চাঁদ সদাগরের মনের আদর্শ মহৎ তাই যে-দেবতাকে নিকৃষ্ট বলিয়া কিছুতে সে মানিতে চায় নাই বহুদুঃখে তারই শক্তির কাছে তাকে হার মানিতে

হইল। এই যে শক্তি, এর সঙ্গে জ্ঞান বা ন্যায়ধর্মের যোগ নাই। মানিবার পাত্র যতই যথেচ্ছাচারী ততই সে ভয়ঙ্কর, ততই তার কাছে নতিস্তুতি। বিশ্বকর্তৃত্বের এই ধারণার সঙ্গে তখনকার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের যোগ ছিল। কবিকঙ্কণের ভূমিকাতেই তার খবর মেলে। আইন নাই, বিচার নাই, জোর যার মুলুক তার; প্রবলের অত্যাচারে বাধা দিবার কোনো বৈধ পথ নাই; দুর্বলের একমাত্র উপায় স্তবস্তুতি, ঘুষঘাষ এবং অবশেষে পলায়ন। দেব-চরিত্র-কল্পনাতেও যেমন, সমাজেও তেমন, রাষ্ট্রতন্ত্রেও সেইরূপ।

অথচ একদিন উপনিষদে বিধাতার কথা বলা হইয়াছিল, যাথাতথ্যতোঽর্থান ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। অর্থাৎ তাঁর বিধান যথাতথ, এলোমেলো নয় এবং সে-বিধান শাশ্বত কালের। তাহা নিত্যকাল হইতে এবং নিত্যকালের জন্য বিহিত, তাহা মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন নূতন খেয়াল নয়। সুতরাং সেই নিত্য বিধানকে আমরা প্রত্যেকেই জ্ঞানের দ্বারা আপন করিয়া লইতে পারি। তাকে যতই পাইব ততই নূতন নূতন বাধা কাটাইয়া চলিব। কেন না, যে-বিধানে নিত্যতা আছে কোথাও সে একেবারে ঠেকিয়া যাইতে পারে না, বাধা সে অতিক্রম করিবেই! এই নিত্য এবং যথাতথ বিধানকে যথাতথ রূপে জানাই বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞানের জোরে য়ুরোপের মনে এত বড়ো একটা ভরসা জন্মিয়াছে যে, সে বলিতেছে, ম্যালেরিয়াকে বিদায় করিবই, কোনো রোগকেই টিঁকিতে দিব না, জ্ঞানের অভাব অন্নের অভাব লোকালয় হইতে দূর হইবেই, মানুষের ঘরে যে-কেহ জন্মিবে সকলেই দেহে মনে সুস্থ সবল হইবে এবং রাষ্ট্রতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সহিত বিশ্বকল্যাণের সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

আধ্যাত্মিক অর্থে ভারতবর্ষ একদিন বলিয়াছিল, অবিদ্যাই বন্ধন,

মুক্তি জ্ঞানে; সত্যকে পাওয়াতেই আমাদের পরিত্রাণ। অসত্য কাকে বলে? নিজেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া জানাই অসত্য। সর্ব্বভূতের সঙ্গে আত্মার মিল জানিয়া পরমাত্মার সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগটিকে জানাই সত্য জানা। এত বড়ো সত্যকে মনে আনিতে পারা যে কী পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার তা আজ আমরা বুঝিতেই পারিব না।

এদিকে আধিভৌতিক ক্ষেত্রে য়ুরোপ যে-মুক্তির সাধনা করিতেছে তারও মূল কথাটা এই একই। এখানেও দেখা যায় অবিদ্যাই বন্ধন, সত্যকে পাওয়াতেই মুক্তি। সেই বৈজ্ঞানিক সত্য মানুষের মনকে বিচ্ছিন্নতা হইতে বিশ্বব্যাপিকতায় লইয়া যাইতেছে এবং সেই পথে মানুষের বিশেষ শক্তিকে বিশ্বশক্তির সহিত যোগযুক্ত করিতেছে।

ভারতে ক্রমে ঋষিদের যুগ, অর্থাৎ গৃহস্থ তাপসদের যুগ গেল; ক্রমে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর যুগ আসিল। ভারতবর্ষ যে মহাসত্য পাইয়াছিল তাহাকে জীবনের ব্যবহারের পথ হইতে তফাৎ করিয়া দিল। বলিল, সন্ন্যাসী হইলে তবেই মুক্তির সাধনা সম্ভবপর হয়। তার ফলে এদেশের বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যার একটা অপোস হইয়া গেছে; বিষয়বিভাগের মতো উভয়ের মহল-বিভাগ হইয়া মাঝখানে একটা দেয়াল উঠিল। সংসারে তাই ধর্ম্মে কর্ম্মে আচারে বিচারে যত সঙ্কীর্ণতা, যত স্থূলতা, যত মূঢ়তাই থাক্ উচ্চতম সত্যের দিক হইতে তার প্রতিবাদ নাই, এমন কি, সমর্থন আছে। গাছতলায় বসিয়া জ্ঞানী বলিতেছে, "যে-মানুষ আপনাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে ও সর্ব্বভূতকে আপনার মধ্যে এক করিয়া দেখিয়াছে সেই সত্যকে দেখিয়াছে," অমনি সংসারী ভক্তিতে গলিয়া তার ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া দিল। ওদিকে সংসারী তার দরদালানে বসিয়া বলিতেছে, "যে-বেটা সর্ব্বভূতকে যতদূর সম্ভব তফাতে রাখিয়া না চলিয়াছে তার ধোবা নাপিত বন্ধ,"—আর জ্ঞানী আসিয়া তার মাথায় পায়ের ধুলা

দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল—"বাবা বাঁচিয়া থাকো!" এই জন্যই এদেশে কর্ম্মসংসারে বিচ্ছিন্নতা জড়তা পদে পদে বাড়িয়া চলিল, কোথাও তাকে বাধা দিবার কিছু নাই। এইজন্যই শত শত বছর ধরিয়া কর্ম্মসংসারে আমাদের এত অপমান, এত হার!

য়ুরোপে ঠিক ইহার উল্টো। য়ুরোপের সত্যসাধনার ক্ষেত্র কেবল জ্ঞানে নহে ব্যবহারে। সেখানে রাজ্যে সমাজে যে কোনো খুঁৎ দেখা যায় এই সত্যের আলোতে সকলে মিলিয়া তার বিচার, এই সত্যের সাহায্যে সকলে মিলিয়া তার সংশোধন। এইজন্য সেই সত্য যে-শক্তি যে-মুক্তি দিতেছে সমস্ত মানুষের তাহাতে অধিকার, তাহা সকল মানুষকে আশা দেয়, সাহস দেয়—তাহার বিকাশ তন্ত্রমন্ত্রের কুয়াশায় ঢাকা নয়, মুক্ত আলোকে সকলের সামনে তাহা বাড়িয়া উঠিতেছে। এবং সকলকেই বাড়াইয়া তুলিতেছে।

এই যে কর্ম্মসংসারে শত শত বছর ধরিয়া অপমানটা সহিলাম সেটা আমাদের কাছে দেখা দিয়াছে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার আকারে। যেখানে ব্যথা সেইখানেই হাত পড়ে। এইজন্যই যে-য়ুরোপীয় জাতি প্রভুত্ব পাইল তাদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার দিকেই আমাদের সমস্ত মন গেল। আমরা আর সব কথা ভুলিয়া কেবলমাত্র এই কথাই বলিতেছি যে, ভারতের শাসন তন্ত্রের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছাব যোগসাধন হোক—উপর হইতে যেমন-খুসি নিয়ম হানিবে আর আমরা বিনা খুসিতে সে-নিয়ম মানিব এমনটা না হয়। কর্তৃত্বকে কাঁধে চাপাইলেই বোঝা হইয়া উঠে, ওটাকে এমন একটা চাকাওয়ালা ঠেলাগাড়ির উপর নামানো হোক যেটাকে আমরাও নিজের হাতে ঠেলিতে পারি।

আজকের দিনে এই প্রার্থনা পৃথিবীর সব দেশেই জাগিয়া উঠিয়াছে যে, বাহিরের কর্ত্তার সম্পূর্ণ একতরফা শাসন হইতে মানুষ ছুটি লইবে।

এই প্রার্থনায় আমরা যে যোগ দিয়াছি তাহা কালের ধর্ম্মে—না যদি দিতাম, যদি বলিতাম রাষ্ট্রব্যাপারে আমরা চিরকালই কর্ত্তাভজা, সেটা আমাদের পক্ষে নিতান্ত লজ্জার কথা হইত। অন্তত একটা ফাটল দিয়াও সত্য আমাদের কাছে দেখা দিতেছে এটাও শুভলক্ষণ।

সত্য দেখা দিল বলিয়াই আজ এতটা জোর করিয়া বলিতেছি যে, দেশের যে-আত্মাভিমানে আমাদের শক্তিকে সম্মুখের দিকে ঠেলা দিতেছে তাকে বলি সাধু, কিন্তু যে আত্মাভিমান পিছনের দিকের অচল-খোঁটায় আমাদের বলির পাঁঠার মতো বাঁধিতে চায় তাকে বলি ধিক্! এই আত্মাভিমানে বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বলিতেছি, রাষ্ট্রতন্ত্রের কর্তৃত্বসভায় আমাদের আসন পাতা চাই, আবার সেই অভিমানেই ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাঁকিয়া বলিতেছি, "খবরদার ধর্ম্মতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে, এমন কি ব্যক্তিগত ব্যবহারে কর্ত্তার হুকুম ছাড়া এক পা চলিবে না"—ইহাকেই বলি হিন্দুয়ানির পুনরুজ্জীবন। দেশাভিমানের তরফ হইতে আমাদের উপর হুকুম আসিল আমাদের এক চোখ জাগিবে আর-এক চোখ ঘুমাইবে। অমন হুকুম তামিল করাই দায়।

বিধাতার শাস্তিতে আমাদের পিঠের উপর যখন বেত পড়িল তখন দেশাভিমান ধড়ফড় করিয়া বলিয়া উঠিল, "পোড়াও ঐ বেত-বনটাকে!" ভুলিয়া গেছে বেত-বনটা গেলেও বাঁশ-বনটা আছে। অপরাধ বেতেও নাই বাঁশেও নাই, আছে আপনার মধ্যেই, অপরাধটা এই যে সত্যের জায়গায় আমরা কর্ত্তাকে মানি, চোখের চেয়ে চোখের ঠুলিকে শ্রদ্ধা করাই আমাদের চিরাভ্যাস। যতদিন এমনি চলিবে ততদিন কোনো না কোনো ঝোপে-ঝাড়ে বেত-বন আমাদের জন্য অমর হইয়া থাকিবে।

সমাজের সকল বিভাগেই ধর্ম্মতন্ত্রের শাসন একসময় য়ুরোপেও প্রবল ছিল। তা'রই বেড়-জালটাকে কাটিয়া যখন বাহির হইল তখন

হইতেই সেখানকার জনসাধারণ আত্মকর্তৃত্বের পথে যথেষ্ট লম্বা করিয়া পা ফেলিতে পারিল। ইংরেজের দ্বৈপায়নতা ইংরেজের পক্ষে বড়ো একটা সুযোগ ছিল। কেননা য়ুরোপীয় ধর্ম্মতন্ত্রের প্রধান আসন রোমে। সেই রোমের পূর্ণপ্রভাব অস্বীকার করা বিচ্ছিন্ন ইংলণ্ডের পক্ষে কঠিন হয় নাই। ধর্ম্মতন্ত্র বলিতে যা বোঝায় ইংলণ্ডে আজও তার কোনো চিহ্ন নাই এমন কথা বলি না। কিন্তু বড়ো ঘরের গৃহিণী বিধবা হইলে যেমন হয় তার অবস্থা তেমনি। এক সময়ে যাদের কাছে সে নথ-নাড়া দিয়াছে, ন্যায়ে অন্যায়ে আজ তাদেরই মন জোগাইয়া চলে; পাশের ঘরে তার বাসের জায়গা, খোরপোষের জন্য সামান্য কিছু মাসহারা বরাদ্দ। হালের ছেলেরা পূর্ব্বদস্তুরমতো বুড়িকে হপ্তায় হপ্তায় প্রণাম করে বটে কিন্তু মান্য করে না। এই গৃহিণীর দাব-রাব যদি পূর্ব্বের মতো থাকিত তবে ছেলে-মেয়েদের কারো আজ টুঁশব্দ করিবার জো থাকিত না।

ইংলণ্ড এই বুড়ির শাসন অনেকদিন হইল কাটাইয়াছে কিন্তু স্পেন এখনো সম্পূর্ণ কাটায় নাই। একদিন স্পেনের পালে খুব জোর হাওয়া লাগিয়াছিল; সে-দিন পৃথিবীর ঘাটে আঘাটায় সে আপনার জয়ধ্বজা উড়াইল। কিন্তু তার হালটার দিকে সেই বুড়ি বসিয়াছিল, তাই আজ সে একেবারে পিছাইয়া পড়িয়াছে। প্রথম দমেই সে এতটা দৌড় দিল তবু একটু পরেই সে যে আর দম রাখিতে পারিল না, তার কারণ কী? তার কারণ, বুড়িটা বরাবর ছিল তার কাঁধে চড়িয়া। অনেকদিন আগেই সে-দিন স্পেনের হাঁপের লক্ষণ দেখা গেল, যে-দিন ইংরেজের সঙ্গে স্পেনের রাজা ফিলিপের নৌযুদ্ধ বাধিল। সে-দিন হঠাৎ ধরা পড়িল স্পেনের ধর্ম্মবিশ্বাসও যেমন সনাতন প্রথায় বাঁধা তার নৌ-যুদ্ধ-বিদ্যাও তেমনি। ইংরেজের যুদ্ধজাহাজ চঞ্চল জলহাওয়ার নিয়মকে ভালো করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল কিন্তু স্পেনীয়দের যুদ্ধজাহাজ নিজের অচল বাঁধি নিয়মকে

ছাড়িতে পারে নাই। যার নৈপুণ্য বেশি তার কৌলিন্য যেম্নি থাক্ সে ইংরেজ যুদ্ধজাহাজের সর্দ্দার হইতে পারিত কিন্তু কুলীন ছাড়া স্পেনীয় রণতরীর পতিপদে কারো অধিকার ছিল না।

আজ য়ুরোপের ছোটোবড়ো যে-কোনো দেশেই জনসাধারণ মাথা তুলিতে পারিয়াছে, সর্ব্বত্রই ধর্ম্মতন্ত্রের অন্ধ কর্ত্তৃত্ব আল্‌গা হইয়া মানুষ নিজেকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে। গণ-সমাজে যেখানে এই শ্রদ্ধা ছিল না—যেমন জার-কর্ত্তার রাশিয়ায়—সেখানকার সমাজ বেওয়ারিশ ক্ষেত্রের মতো নানা কর্ত্তার কাঁটাগাছে জঙ্গল হইয়া উঠিয়াছিল। সেখানে একালের পেয়াদা হইতে সেকালেব পুঁথি পর্য্যন্ত সকলেই মনুষ্যত্বের কান মলিয়া অন্যায় খাজনা আদায় করিয়াছে।

মনে রাখা দরকার, ধর্ম্ম আর ধর্ম্মতন্ত্র এক জিনিষ নয়। ও যেন আগুন আর ছাই। ধর্ম্মতন্ত্রের কাছে ধর্ম্ম যখন খাটো হয় তখন নদীর বালি নদীর জলের উপর মোড়লি করিতে থাকে। তখন স্রোত চলে না, মরুভূমি ধূধূ করে। তার উপরে, সেই অচলতাটাকে লইয়াই মানুষ যখন বুক ফোলায় তখন গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং।

ধর্ম্ম বলে,মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না করো তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারো কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দ্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁৎ করিয়া না মানো তবে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র বলে, যত অসহ্য কষ্টই হোক্, বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ মা বিশেষ তিথিতে অন্নজল তুলিয়া দেয় সে পাপকে লালন করে। ধর্ম্ম বলে, অনুশোচনা ও কল্যাণকর্ম্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয়, চোদ্দপুরুষের পাপ উদ্ধার। ধর্ম্ম বলে,

সাগরগিরি পার হইয়া পৃথিবীটাকে দেখিয়া লও, তাতেই মনের বিকাশ। ধর্ম্মতন্ত্র বলে, সমুদ্র যদি পারাপার করো তবে খুব লম্বা করিয়া নাকে খৎ দিতে হইবে। ধর্ম্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ, সে যে-ঘরেই জন্মাক পূজনীয়, ধর্ম্মতন্ত্র বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যত বড়ো অভাজনই হোক মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম্ম আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্ম্মতন্ত্র।

আমি জানি একদিন একজন রাজা কলিকাতায় আর-এক রাজার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। বাড়ি যাঁর তিনি কলেজে পাশ-করা সুশিক্ষিত। অতিথি যখন দেখা সারিয়া গাড়িতে উঠিবেন এমন সময় বাড়ি যাঁর তিনি রাজার কাপড় ধরিয়া টানিলেন, বলিলেন—"আপনার মুখে পান!" গাড়ি যাঁর তিনি দায়ে পড়িয়া মুখের পান ফেলিলেন, কেননা সারথি মুসলমান। এ-কথা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার নাই—"সারথি যেই হোক্ মুখের পান ফেলা যায় কেন?" ধর্ম্মবুদ্ধিতে বা কর্ম্মবুদ্ধিতে কোথাও কিছুমাত্র আটক না খাইলেও গাড়িতে বসিয়া স্বচ্ছন্দে পান খাইবার স্বাধীনতাটুকু যে-দেশের মানুষ অনায়াসে বর্জ্জন করিতে প্রস্তুত সে-দেশের লোক স্বাধীনতার অন্ত্যেষ্টি সৎকার করিয়াছে। অথচ দেখি যারা গোড়ায় কোপ দেয় তারাই আগায় জল ঢালিবার জন্য ব্যস্ত।

নিষ্ঠা পদার্থের একটা শোভা আছে। কোনো কোনো বিদেশী এদেশে আসিয়া সেই শোভার ব্যাখ্যা করেন। এটাকে বাহির হইতে তাঁরা সেই-ভাবেই দেখেন একজন আর্টিষ্ট পুরানো ভাঙা বাড়ির চিত্র-যোগ্যতা যেমন করিয়া দেখে,—তার বাসযোগ্যতার খবর লয় না। স্নানযাত্রার পরবে বরিশাল হইতে কলিকাতায় আসিতে গঙ্গাস্নানের যাত্রী দেখিয়াছি, তার বেশির ভাগ স্ত্রীলোক। ষ্টীমারের ঘাটে ঘাটে রেলোয়ের ষ্টেশনে ষ্টেশনে তাদের কষ্টের অপমানের সীমা ছিল না। বাহিরের দিক

হইতে এই ব্যাকুল সহিষ্ণুতার সৌন্দর্য্য আছে। কিন্তু আমাদের দেশের অন্তর্যামী এই অন্ধ নিষ্ঠার সৌন্দর্য্যকে গ্রহণ করেন নাই। তিনি পুরস্কার দিলেন না, শাস্তিই দিলেন। দুঃখ বাড়িতেই চলিল। এই মেয়েরা মানৎস্বস্ত্যয়নের বেড়ার মধ্যে যে-সব ছেলে মানুষ করিয়াছে ইহকালের সমস্ত বস্তুর কাছেই তারা মাথা হেঁট করিল এবং পরকালের সমস্ত ছায়ার কাছেই তারা মাথা খুঁড়িতে লাগিল। নিজের কাজের বাধাকে রাস্তার বাঁকে বাঁকে গাড়িয়া দেওয়াই এদের কাজ, এবং নিজের উন্নতির অন্তরায়কে আকাশ-পরিমাণ উঁচু করিয়া তোলাকেই এরা বলে উন্নতি। সত্যের জন্য মানুষ কষ্ট সহিবে এইটেই সুন্দর। কানা-বুদ্ধি কিম্বা খোঁড়া-শক্তির হাত হইতে মানুষ লেশমাত্র কষ্ট যদি সয় তবে সেটা কুদৃশ্য। কারণ, বিধাতা আমাদের সব চেয়ে বড়ো যে-সম্পদ দিয়াছেন—ত্যাগ-স্বীকারের বীরত্ব—এই কষ্ট তারই বেহিসাবী বাজে খরচ। আজ তারই নিকাস আমাদের চলিতেছে—ইহার ঋণের ফর্দ্দটাই মোটা। চোখের সামনে দেখিয়াছি হাজার হাজার মেয়ে পুরুষ পুণ্যের সন্ধানে যে-পথ দিয়া স্নানে চলিয়াছে ঠিক তারই ধারে মাটিতে পড়িয়া একটি বিদেশী রোগী মরিল, সে কোন্ জাতের মানুষ জানা ছিল না বলিয়া কেহ তাহাকে ছুঁইল না। এই তো ঋণদায়ে দেউলিয়ার লক্ষণ। এই কষ্টসহিষ্ণু পুণ্য-কামীদের নিষ্ঠা দেখিতে সুন্দর কিন্তু ইহার লোকসান সর্ব্বনেশে। যে-অন্ধতা মানুষকে পুণ্যের জন্য জলে স্নান করিতে ছোটায় সেই অন্ধতাই তাকে অজানা মুমূর্ষুর সেবায় নিরস্ত করে। একলব্য পরম নিষ্ঠুর দ্রোণাচার্য্যকে তার বুড়া আঙুল কাটিয়া দিল, কিন্তু এই অন্ধ নিষ্ঠার দ্বারা সে নিজের চিরজীবনের তপস্যাফল হইতে তার সমস্ত আপন জনকে বঞ্চিত করিয়াছে। এই যে মূঢ় নিষ্ঠার নিরতিশয় নিষ্ফলতা, বিধাতা ইহাকে সমাদর করেন না—কেননা ইহা তাঁর দানের অবমাননা। গয়া তীর্থে

দেখা গেছে, যে-পাণ্ডার না আছে বিদ্যা, না আছে চরিত্র, ধনী স্ত্রীলোক রাশি রাশি টাকা ঢালিয়া দিয়া তার পা পূজা করিয়াছে। সেই সময়ে তার ভক্তিবিহ্বলতা ভাবুকের চোখে সুন্দর কিন্তু এই অবিচলিত নিষ্ঠা, এই অপরিমিত বদান্যতা কি সত্য দয়ার পথে এই স্ত্রীলোককে এক-পা অগ্রসর করিয়াছে? ইহার উত্তর এই যে, তবুত সে টাকাটা খরচ করিতেছে; সে যদি পাণ্ডাকে পবিত্র বলিয়া না মানিত তবে টাকা খরচ করিতই না, কিম্বা নিজের জন্য করিত। সে-কথা ঠিক,—কিন্তু তার একটা মস্ত লাভ হইত এই যে, সেই খরচ-না করাটাকে কিম্বা নিজের জন্য খরচ-করাটাকে সে ধর্ম্ম বলিয়া নিজেকে ভোলাইত না,—এই মোহের দাসত্ব হইতে তার মন মুক্ত থাকিত। মনের এই মুক্তির অভাবেই দেশের শক্তি বাহিরে আসিতে পারিতেছে না। কেননা যাকে চোখ বুজিয়া চালানো অভ্যাস করানো হইয়াছে, চোখ খুলিয়া চলিতে তার পা কাঁপে, অনুগত দাসের মতো যে কেবল মনিবের জন্যই প্রাণ দিতে শিখিয়াছে, আপনি প্রভু হইয়া স্বেচ্ছায় ন্যায়ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেওয়া তার পক্ষে অসাধ্য।

এই জন্যই আমাদের পাড়াগাঁয়ে অন্ন জল স্বাস্থ্য শিক্ষা আনন্দ সমস্ত আজ ভাঁটার মুখে। আত্মশক্তি না জাগাইতে পারিলে পল্লিবাসীর উদ্ধার নাই—এই কথা মনে করিয়া, নিজের কল্যাণ নিজে করিবার শক্তিকে একটা বিশেষ পাড়ায় জাগাইবার চেষ্টা করিলাম। একদিন পাড়ায় আগুন লাগিল, কাছে কোথাও এক ফোঁটা জল নাই; পাড়ার লোক দাঁড়াইয়া হায় হায় করিতেছে। আমি তাদের বলিলাম, "নিজের মজুরি দিয়া যদি তোমরা পাড়ায় একটা কুয়ো খুঁড়িয়া দাও আমি তার বাঁধাইবার খরচা দিব। তারা ভাবিল পুণ্য হইবে ঐ সেয়ানা লোকটার, আর তার মজুরি জোগাইব আমরা, এটা ফাঁকি।" সে কুয়ো খোঁড়া হইল না, জলের কষ্ট রহিয়া গেল, আর আগুনের সেখানে বাঁধা নিমন্ত্রণ।

এই যে অটল দুর্দ্দশা, এর কারণ, গ্রামের যা-কিছু পূর্ত্তকার্য্য তা এ-পর্য্যন্ত পুণ্যের প্রলোভনে ঘটিয়াছে। তাই মানুষের সকল অভাবই পূরণ করিবার বরাৎ হয় বিধাতার 'পরে নয় কোনো আগন্তুকের উপর। পুণ্যের উমেদার যদি উপস্থিত না থাকে তবে এরা জল না-খাইয়া মরিয়া গেলেও নিজের হাতে এক কোদাল মাটিও কাটিবে না। কেননা এরা এখনো সেই-বুড়ির কোল থেকে নামে নাই যে-বুড়ি এদের জাতিকুল ধর্ম্মকর্ম্ম ভালোমন্দ শোওয়া-বসা সমস্তই বাহির হইতে বাঁধিয়া দিয়াছে। ইহাদের দোষ দিতে পারি না, কেননা, বুদ্ধি এদের মনটাকেই আফিম খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়াছে। কিন্তু অবাক্ হইতে হয় যখন দেখি, এখনকার কালের শিক্ষিত যুবকেরা, এমন কি, কলেজের তরুণ ছাত্রেরাও এই বুড়িতন্ত্রের গুণ গাহিতেছেন। ভারতবর্ষকে সনাতন ধাত্রীর কাঁখে চড়িতে দেখিয়া ইঁহাদের ভারি গর্ব্ব—বলেন, ওটা বড়ো উচ্চ জায়গা, ওখান হইতে পা মাটিতেই পড়ে না, বলেন, ঐ কাঁখে থাকিয়াই আত্মকর্তৃত্বের রাজদণ্ড হাতে ধরিলে বড়ো শোভা হইবে।

অথচ স্পষ্ট দেখি, দুঃখের পর দুঃখ, দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ, যমলোকের যতগুলি চর আছে সবগুলিই আমাদের ঘরে ঘরে বাসা লইল। বাঘে ডাকাতে তাড়া করিলেও যেমন আমাদের অস্ত্র তুলিবার হুকুম নাই তেমনি এই অমঙ্গলগুলো লাফ দিয়া যখন ঘাড়ের উপর দাঁত বসাইতে আসে তখন দেখি সামাজিক বন্দুকের পাস নাই। ইহাদিগকে খেদাইবার অস্ত্র জ্ঞানের অস্ত্র, বিচার বুদ্ধির অস্ত্র। বুড়ির শাসনের প্রতি যাঁদের ভক্তি অটল তাঁরা বলেন, "ঐ অস্ত্রটা কি আমাদের একেবারে নাই? আমরাও সায়ান্স্ শিখিব এবং যতটা পারি খাটাইব।" অস্ত্র একেবারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় কিন্তু অস্ত্র-পাসের আইনটা বিষম কড়া। অস্ত্র ব্যবহার করিতে দিয়াও যতটা না-দিতে পারা যায় তারই উপর ষোলোআনা

ঝোঁক। ব্যবহারের গণ্ডি এতই, তার একটু এদিক ওদিক হইলেই এত দুর্জ্জয় কানমলা; সমস্ত গুরু পুরোহিত, তাগাতাবিজ, সংস্কৃত শ্লোক ও মেয়েলি মন্ত্র এত ভয়ে ভয়ে সাবধানে বাঁচাইয়া চলিতে হয় যে, ডাকাত পড়িলে ডাকাতের চেয়ে অনভ্যাসের বন্দুকটা লইয়াই ফাঁপরে পড়িতে হয়।

যাই হোক্, "পায়ের বেড়িটা অক্ষয় হোক্" বলিযাই যখন আশীর্ব্বাদ করা হইল তখন দয়ালু লোক এ-কথাও বলিতে বাধ্য যে,"মানুষদের কাঁধে চড়িয়া বেড়াইতে প্রস্তুত হও!" যত-রাজ্যের জাতের বেড়া, আচারের বেড়া মেরামত করিয়া পাকা করাই যদি পুনরুজ্জীবন হয়, যদি এমনি করিয়া জীবনের ক্ষেত্রকে বাধাগ্রস্ত ও বুদ্ধির ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণ করাই আমাদের গৌরবের কথা হয়—তবে সেই সঙ্গে এ-কথাও বলিতে হয়, এই অক্ষমদের দুই বেলা লালন করিবার জন্য দল বাঁধো। কিন্তু দুই বিপরীত কুলকে এক সঙ্গে বাঁচাইবার সাধ্য কোনো শক্তিমানেরই নাই। তৃষার্ত্তের ঘড়া-ঘটি সমস্ত চুরমার করিবে, তার পরে চালুনি দিয়া জল আনিতে ঘন ঘন ঘাটে-ঘরে আনাগোনা, এ আবদার বিধাতার সহ্য হয় না!

অনেকে বলেন, এদেশে পদে পদে এত দুঃখ দারিদ্র্য তার মূল কারণ এখানকার সম্পূর্ণ শাসনভার পরজাতির উপর। কথাটাকে বিচার করিয়া দেখা দরকার।

ইংরেজ রাষ্ট্রনীতির মূলতত্ত্বই রাষ্ট্রতন্ত্রের সঙ্গে প্রজাদের শক্তির যোগ। এই রাষ্ট্রতন্ত্র চিরদিনই একতরফা আধিপত্যের বুকে শেল হানিয়াছে এ-কথা আমাদের কাছেও কিছুমাত্র ঢাকা নাই। এই কথাই সরকারী বিদ্যালয়ে আমরা সদরে বসিয়া পড়ি, শিখি, এবং পড়িয়া এগ্জামিন পাস করি। এ-কথাটাকে এখন আমাদের কাছ হইতে ফিরাইয়া লইবার আর উপায় নাই।

কন্‌গ্রেস বলো, লীগ্ বলো, এ-সমস্তর মূলই এইখানে। যেমন য়ুরোপীয় সায়ান্সে আমাদের সকলেরই অধিকারটা সেই সায়ান্সেরই প্রকৃতিগত, তেমনি ইংরেজ রাষ্ট্রতন্ত্রে ভারতের প্রজার আপন অধিকার সেই রাষ্ট্রনীতিরই জীবনধর্ম্মের মধ্যেই। কোনো একজন বা দশজন বা পাঁচশোজন ইংরেজ বলিতে পারে ভারতীয় ছাত্রকে সায়ান্স শিখিবার সুযোগটা না দেওয়াই ভালো কিন্তু সায়ান্স সেই পাঁচশো ইংরেজের কণ্ঠকে লজ্জা দিয়া বজ্রস্বরে বলিবে, "এসো তোমরা, তোমাদের বর্ণ যেমনি হোক্ তোমাদের দেশ যেখানেই থাক্, আমাকে গ্রহণ করিয়া শক্তি লাভ করো।" তেমনি কোনো দশজন বা দশহাজার জন ইংরেজ রাজসভার মঞ্চে বা খবরের কাগজের স্তম্ভে চড়িয়া বলিতেও পারে যে, ভারতশাসনতন্ত্রে ভারতীয় প্রজার কর্তৃত্বকে নানাপ্রকারে প্রবেশে বাধা দেওয়াই ভালো, কিন্তু সেই দশহাজার ইংরেজের মন্ত্রণাকে তিরস্কার করিয়া ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি বজ্রস্বরে বলিতেছে,"এসো তোমরা, তোমাদের বর্ণ যেমনি হোক্ তোমাদের দেশ যেখানেই থাক্, ভারতশাসনতন্ত্রে ভারতীয় প্রজার আপন অধিকার আছে, তাহা গ্রহণ করো!"

কিন্তু ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি আমাদের বেলায় খাটে না এমন একটা কড়া জবাব শুনিবার আশঙ্কা আছে। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ যেমন বলিয়াছিল উচ্চতর জ্ঞানে ধর্ম্মে কর্ম্মে শূদ্রের অধিকার নাই, এও সেই রকমের কথা। কিন্তু ব্রাহ্মণ এই অধিকারভেদের ব্যবস্থাটাকে আগাগোড়া পাকা করিয়া গাঁথিয়াছিল—যাহাকে বাহিরে পঙ্গু করিবে তার মনকেও পঙ্গু করিয়াছিল। জ্ঞানের দিকে গোড়া কাটা পড়িলেই কর্ম্মের দিকে ডালপালা আপনি শুকাইয়া যায়। শূদ্রের সেই জ্ঞানের শিকড়টা কাটিতেই আর বেশি কিছু করিতে হয় নাই—তারপর হইতে তার মাথাটা আপনিই নুইয়া পড়িয়া ব্রাহ্মণের পদরজে আসিয়া ঠেকিয়া রহিল। ইংরেজ আমাদের

জ্ঞানের দ্বার বন্ধ করে নাই—অথচ সেইটেই মুক্তির সিংহদ্বার। রাজ-পুরুষেরা সেজন্য বোধ করি মনে মনে আপ্‌সোস করেন এবং আস্তে আস্তে বিদ্যালয়ের দুটো একটা জানলা-দরজাও বন্ধ করিবার গতিক দেখি,—কিন্তু তবু একথা তাঁরা কোনোদিন একেবারে ভুলিতে পারিবেন না যে, সুবিধার খাতিরে নিজের মনুষ্যত্বকে আঘাত করিলে ফলে সেটা আত্ম-হত্যার মতোই হয়।

ভারতশাসনে আমাদের ন্যায্য অধিকারটা ইংরেজের মনস্তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত এই আশার কথাটাকে যদি আমাদের শক্তি দিয়া ধরিতে পারি তবে ইহার জন্য বিস্তর দুঃখ সহা, ত্যাগ করা, আমাদের পক্ষে সহজ হয়। যদি আমাদের দুর্ব্বল অভ্যাসে বলিয়া বসি, কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম, ওর আর নড়চড় নাই, তবে যে সুগভীর নৈরাশ্য আসে, তার দুই রকমের প্রকাশ দেখিতে পাই,—হয় গোপনে চক্রান্ত করিয়া আকস্মিক উপদ্রবের বিস্তার করিতে থাকি, নয় ঘরের কোণে বসিয়া পরস্পরের কানে-কানে বলি, অমুক লাটসাহেব ভালো কিম্বা মন্দ, অমুক ব্যক্তি মন্ত্রিসভায় সচিব থাকিতে আমাদের কল্যাণ নাই, মর্লি সাহেব ভারতসচিব হইলে হয় তো আমাদের সুদিন হইবে নয় তো আমাদের ভাগ্যে এই বিড়াল বনে গিয়া বনবিড়াল হইয়া উঠিবে। অর্থাৎ নৈরাশ্যে, হয় আমাদের মাটির তলার সুরঙ্গের মধ্যে ঠেলিয়া শক্তির বিকার ঘটায়, নয় গৃহকোণের বৈঠকে বসাইয়া শক্তির ব্যর্থতা সৃষ্টি করে। হয় উন্মাদ করিয়া তোলে, নয় হাবা করিয়া রাখে।

কিন্তু মনুষ্যত্বকে অবিশ্বাস করিব না,—এমন জোরের সঙ্গে চলিব, যেন ইংরেজ-রাষ্ট্রনীতির মধ্যে কেবল শক্তিই সত্য নহে, নীতি তার চেয়ে বড়ো সত্য। প্রতিদিন তার বিরুদ্ধতা দেখিব ; দেখিব স্বার্থপরতা, ক্ষমতাপ্রিয়তা, লোভ, ক্রোধ, ভয় ও অহঙ্কার সমস্তরই লীলা

চলিতেছে, কিন্তু মানুষের এই রিপুগুলো সেইখানেই আমাদের মারে, যেখানে আমাদের অন্তরেও রিপু আছে, যেখানে আমরাও ক্ষুদ্রভয়ে ভীত, ক্ষুদ্রলোভে লুব্ধ, যেখানে আমাদের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ অবিশ্বাস। যেখানে আমরা বড়ো, আমরা বীর, আমরা ত্যাগী তপস্বী শ্রদ্ধাবান, যেখানে অন্যপক্ষে যাহা মহৎ তাহার সঙ্গে আমাদের সত্য যোগ হয়, সেখানে অন্য পক্ষের রিপুর মার খাইয়াও তবু আমরা জয়ী হই, বাহিরে না হইলেও অন্তরে। আমরা যদি ভীতু হই, তবে ইংরেজ গবর্মেণ্টের নীতিকে খাটো করিয়া তার রিপুটাকেই প্রবল করিব। যেখানে দুইপক্ষ লইয়া কারবার সেখানে দুই পক্ষের শক্তির যোগেই শক্তির উৎকর্ষ, দুই পক্ষের দুর্ব্বলতার যোগে চরম দুর্ব্বলতা। অব্রাহ্মণ যখনি জোড়হাতে অধিকারহীনতা মানিয়া লইল, ব্রাহ্মণের অধঃপতনের গর্ত্তটা তখনি গভীর করিয়া খোঁড়া হইল। সবল দুর্ব্বলের পক্ষে যতবড়ো শত্রু, দুর্ব্বল, সবলের পক্ষে তার চেয়ে কমবড়ো শত্রু নয়।

একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ-রাজপুরুষ আমাকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা প্রায়ই বলো পুলিস তোমাদের 'পরে অত্যাচার করে, আমিও তা অবিশ্বাস করি না কিন্তু তোমরা তো তার প্রমাণ দাও না।" বলা বাহুল্য, পুলিসের সঙ্গে লাঠালাঠি মারামারি করো একথা তিনি বলেন না। কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে লড়াই তো গায়ের জোরে নয়, সে তো তেজের লড়াই, সে তেজ কর্ত্তব্যবুদ্ধির। দেশকে নিরন্তর পীড়ন হইতে বাঁচাইবার জন্য একদল লোকের তো বুকের পাটা থাকা চাই, অন্যায়কে তারা প্রাণপণে প্রমাণ করিবে, পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিবে। জানি, পুলিসের একজন চৌকিদারও একজন মানুষমাত্র নয়, সে একটা প্রকাণ্ড শক্তি। একটি পুলিসের পেয়াদাকে বাঁচাইবার জন্য মকদ্দমায় গবর্মেণ্টের হাজার হাজার টাকা খরচ হয়। অর্থাৎ আদালৎ-মহাসমুদ্র পার হইবার বেলায়

পেয়াদার জন্য সরকারী ষ্টীমার, আর গরীব ফরিয়াদিকে তুফানে সাঁতার দিয়া পার হইতে হইবে, একখানা কলার ভেলাও নাই। এ যেন একরকম স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া, বাপু, মার যদি খাও তবে নিঃশব্দে মরাটাই অতীব স্বাস্থ্যকর। এর পরে আর হাত পা চলে না। প্রেষ্টিজ্! ওটা যে আমাদের অনেকদিনের চেনা লোক। ঐ তো কর্ত্তা, ঐ তো আমাদের কবিকঙ্কণের চণ্ডী, ঐ তো বেহুলাকাব্যের মনসা, ন্যায় ধর্ম্ম সকলের উপরে ওকেই তো পূজা দিতে হইবে, নহিলে হাড় গুঁড়া হইয়া যাইবে! অতএব

যা দেবী রাজ্যশাসনে
প্রেষ্টিজ-রূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

কিন্তু ইহাই তো অবিদ্যা, ইহাই তো মায়া। যেটা স্থূলচোখে প্রতীয়মান হইতেছে তাই কি সত্য? আসল সত্য আমাকে লইয়াই গবর্মেণ্ট। এই সত্য সমস্ত রাজপুরুষের চেয়ে বড়ো। এই সত্যের উপরই ইংরেজ বলী—সেই বল আমারও বল। ইংরেজ গবর্মেণ্টও এই সত্যকে হারায়, যদি এই সত্যের বল আমার মধ্যেও না থাকে। আমি যদি ভীরু হই, ইংরেজ রাষ্ট্রতন্ত্রের নীতিতত্ত্বে আমার যদি শ্রদ্ধা না থাকে তবে পুলিস অত্যাচার করিবেই, ম্যাজিষ্ট্রেটের পক্ষে সুবিচার কঠিন হইবেই, প্রেষ্টিজ্ দেবতা নর-বলি দাবী করিতেই থাকিবে এবং ইংরেজের শাসন ইংরেজের চিরকালীন ঐতিহাসিক ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিবে।

এ-কথার উত্তরে শুনিব "রাষ্ট্রতন্ত্রে নীতিই শক্তির চেয়ে সত্য এই কথাটাকে পারমার্থিকভাবে মানা চলে কিন্তু ব্যাবহারিকভাবে মানিতে

গেলে বিপদ আছে, অতএব হয় গোপনে পরম নিঃশব্দ গরম-পন্থা—নয়তো প্রেস্ এক্টের মুখ-থাবার নিচে পরম-নিঃশব্দ নরম পন্থা !”

হাঁ, “বিপদ আছে বই কি, তবু জ্ঞানে যা সত্য ব্যবহারেও তাকে সত্য করিব।”

“কিন্তু আমাদের দেশের লোকই ভয়ে কিম্বা লোভে ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে না বিরুদ্ধেই দিবে।”

“এ-কথাও ঠিক। তবু সত্যকে মানিয়া চলিতে হইবে !”

“কিন্তু আমাদের দেশের লোকই প্রশংসা কিম্বা পুরস্কারের লোভে ঝোপের মধ্য হইতে আমার মাথায় বাড়ি মারিবে।”

“একথাও ঠিক ! তবু সত্যকে মানিতে হইবে।”

“এতটা কি আশা করা যায় ?”

হাঁ, এতটাই আশা করিতে হইবে, ইহার একটুকুও কম নয় ! গবর্মেণ্টের কাছ হইতেও আমরা বড়ো দাবীই করিব কিন্তু নিজেদের কাছ হইতে তার চেয়ে আরো বড়ো দাবী করিতে হইবে, নহিলে অন্য দাবী টিঁকিবে না। এ-কথা মানি, সকল মানুষই বলিষ্ঠ হয় না এবং অনেক মানুষই দুর্ব্বল; কিন্তু সকল বড়ো দেশেই প্রত্যেক দিনই অনেকগুলি করিয়া মানুষ জন্মেন যাঁরা সকল মানুষের প্রতিনিধি—যাঁরা সকলের দুঃখকে আপনি বহেন, সকলের পথকে আপনি কাটেন, যাঁরা সমস্ত বিরুদ্ধতার মধ্যেও মনুষ্যত্বকে বিশ্বাস করেন এবং ব্যর্থতার গভীরতম অন্ধকারের পূর্ব্ব প্রান্তে অরুণোদয়ের প্রতীক্ষায় জাগিয়া থাকেন। তাঁরা অবিশ্বাসীর সমস্ত পরিহাসকে উপেক্ষা করিয়া জোরের সঙ্গে বলেন—“স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ”—অর্থাৎ কেন্দ্রস্থলে যদি স্বল্পমাত্রও ধর্ম্ম থাকে তবে পরিধির দিকে রাশি রাশি ভয়কেও ভয় করিবার দরকার নাই। রাষ্ট্রতন্ত্রে নীতি যদি কোনোখানেও থাকে

তবে তাহাকেই নমস্কার—ভীতিকে নয়! ধর্ম্ম আছে, অতএব মরা-পর্য্যন্ত মানিয়াও তাহাকে মানিতে হইবে।

মনে করো ছেলের শক্ত ব্যামো। সেজন্য দূর হইতে স্বয়ং ইংরেজ সিভিল সার্জ্জনকে আনিয়াছি। খরচ বড়ো কম করি নাই। যদি হঠাৎ দেখি তিনি মন্ত্র পড়িয়া মারিয়াধরিয়া ভূতের ওঝার মতো বিষম ঝাড়া-ঝুড়ি সুরু করিলেন, রোগীর আত্মাপুরুষ ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল, তবে ডাক্তারকে জোর করিয়াই বলিব,—"দোহাই সাহেব, ভূত ঝাড়াইবেন না, চিকিৎসা করুন।" তিনি চোখ রাঙাইয়া বলিতে পারেন, "তুমি কে হে! আমি ডাক্তার যাই করি না তাই ডাক্তারি!" ভয়ে যদি বুদ্ধি দমিয়া না যায় তবে তাঁকে আমার একথা বলিবার অধিকার আছে "যে ডাক্তারি-তত্ত্ব লইয়া তুমি ডাক্তার আমি তাকে তোমার চেয়ে বড়ো বলিয়াই জানি, তার মূল্যেই তোমার মূল্য।"

এই যে অধিকার এর সকলের চেয়ে বড়ো জোর ঐ ডাক্তার সম্প্রদায়েরই ডাক্তারিশাস্ত্রে এবং ধর্ম্মনীতির মধ্যে। ডাক্তার যতই আস্ফালন করুক এই বিজ্ঞান এবং নীতির দোহাই মানিলে লজ্জা না পাইয়া সে থাকিতেই পারে না। এমন কি, রাগের মুখে সে আমাকে ঘুষিও মারিতে পারে—কিন্তু তবু আস্তে আস্তে আমার সেলাম এবং সেলামিটি পকেটে করিয়া গাড়ীতে বসার চেয়ে এই ঘুষির মূল্য বড়ো। এই ঘুষিতে সে আমাকে যত মারে নিজেকে তার চেয়ে বেশি মারে। তাই বলিতেছি, যে-কথাটা ইংরেজের কথা নয় কেবলমাত্র ইংরেজ আমলাদের কথা, সে-কথায় যদি আমরা সায় না দিই তবে আজ দুঃখ ঘটিতে পারে কিন্তু কাল দুঃখ কাটিবে।

দেড়শো বছর ভারতে ইংরেজ-শাসনের পর আজ এমন কথা শোনা গেল, মাদ্রাজ গবর্মেণ্টে ভালোমন্দ যাই করুক বাংলা দেশে তা লইয়া

দীর্ঘনিশ্বাসটি ফেলিবার অধিকার বাঙালির নাই। এত দিন এই জানিতাম, ইংরেজের অখণ্ড শাসনে মাদ্রাজ বাংলা পাঞ্জাব মারাঠা ভিতরে বাহিরে এক হইয়া উঠিতেছে এই গৌরবই ইংরেজ সাম্রাজ্যের মুকুটের কোহিনুর মণি। বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের দুর্গতিকে আপন দুর্গতি মনে করিয়া ইংরেজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে ছুটিয়াছে, সমুদ্রের পশ্চিম পারে যখন এই বার্ত্তা তখন সমুদ্রের পূর্ব্বপারে এমন নীতি কি একদিনো খাটিবে যে, মাদ্রাজের ভালোমন্দ সুখ-দুঃখে বাঙালির কোনো মাথাব্যথা নাই? এমন হুকুম কি আমরা মাথা হেঁট করিয়া মানিব? এ-কথা কি নিশ্চয় জানিনা যে, মুখে এই হুকুম যত জোরেই হাঁকা হউক্ অন্তরে ইহার পিছনে মস্ত একটা লজ্জা আছে? ইংরেজের সেই অন্যায়ের গোপন লজ্জা আর আমাদের মনুষ্যত্বের প্রকাশ্য সাহস—এই দুইয়ের মধ্যে মিল করিতে হইবে। ইংরেজ ভারতের কাছে সত্যে বদ্ধ; ইংরেজ য়ুরোপীয় সভ্যতার দায়িত্ব বহিয়া এই পূর্ব্ব দেশে আসিয়াছে; সেই সভ্যতার বাণীই তাহার প্রতিশ্রুতি বাণী। সেই দলিলকেই আমরা সব চেয়ে বড়ো দলিল করিয়া চলিব,—এ-কথা তাকে কখনই বলিতে দিব না যে, ভারতবর্ষকে আমরা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া মাছকাটা করিবার জন্যই সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছি।

যে-জাতি কোনো বড়ো সম্পদ পাইয়াছে সে তাহা দেশে দেশে দিকে দিকে দান করিবার জন্যই পাইয়াছে। যদি সে কৃপণতা করে তবে সে নিজেকেই বঞ্চিত করিবে। য়ুরোপের প্রধান সম্পদ, বিজ্ঞান, এবং জনসাধারণের ঐক্যবোধ ও আত্মকর্তৃত্ব লাভ। এই সম্পদ এই শক্তি ভারতকে দিবার মহৎ দায়িত্বই ভারতে ইংরেজশাসনের বিধিদত্ত রাজ-পরোয়ানা। এই কথা শাসনকর্ত্তাদের স্মরণ করাইবার ভার আমাদের উপরেও আছে। কারণ, দুই পক্ষের যোগ না হইলে বিস্মৃতি ও বিকার ঘটে।

ইংরেজ নিজের ইতিহাসের দোহাই দিয়া এমন কথা বলিতে পারে—"জনসাধারণের আত্মকর্তৃত্বটি যে একটি মস্ত জিনিষ তা আমরা নানা বিপ্লবের মধ্য দিয়া তবে বুঝিয়াছি এবং নানা সাধনার মধ্য দিয়া তবে সেটাকে গড়িয়া তুলিয়াছি।" এ-কথা মানি। জগতে এক-এক অগ্রগামী দল এক-এক বিশেষ সত্যকে আবিষ্কার করে। সেই আবিষ্কারের গোড়ায় অনেক ভুল, অনেক দুঃখ, অনেক ত্যাগ আছে। কিন্তু তার ফল যারা পায় তাহাদিগকে সেই ভুল সেই দুঃখের সমস্ত লম্বা রাস্তাটা মাড়াইতে হয় না। দেখিলাম, বাঙালির ছেলে আমেরিকায় গিয়া হাতে-কলমে এঞ্জিন গড়িল এবং তার তত্ত্বও শিখিয়া লইল কিন্তু আগুনে কাৎলি চড়ানো হইতে সুরু করিয়া ষ্টীম এঞ্জিনের সমস্ত ঐতিহাসিক পালা যদি তাকে সারিতে হইত তবে সত্যযুগের পরমায়ু নহিলে তার কুলাইত না। য়ুরোপে যাহা গজাইয়া উঠিতে বহুযুগের রৌদ্রবৃষ্টি ঝড় বাতাস লাগিল জাপানে তাহা শিকড় সুদ্ধ পুঁতিবার বেলায় বেশি সময় লাগে নাই। আমাদের চরিত্রে ও অভ্যাসে যদি কর্তৃশক্তির বিশেষ অভাব ঘটিয়া থাকে তবে আমাদেরই বিশেষ দরকার কর্তৃত্বের চর্চা। ব্যক্তি-বিশেষের কিছু নাই এটা যদি গোড়া হইতেই ধরিয়া লও তবে তার মধ্যে কিছু যে আছে সেই আবিষ্কার কোনো কালেই হইবে না। আত্মকর্তৃত্বের সুযোগ দিয়া আমাদের ভিতরকার নূতন নূতন শক্তি আবিষ্কারের পথ খুলিয়া দাও—সেটাকে রোধ করিয়া রাখিয়া যদি আমাদের অবজ্ঞা করো এবং বিশ্বের কাছে চিরদিন অবজ্ঞাভাজন করিয়া রাখো তবে তার চেয়ে পরম শত্রুতা আর কিছু হইতেই পারে না। ডাইনে বাঁয়ে দু-পা বাড়াইলেই যার মাথা ঠক্ করিয়া দেয়ালে গিয়া ঠেকে তার মনে কখনো কি সেই বড়ো আশা টিঁকিতেই পারে যার জোরে মানুষ সকল বিভাগে আপন মহত্ত্বকে প্রাণ দিয়াও সপ্রমাণ করে?

দেখিয়াছি, ইতিহাসে যখন প্রভাত হয় সূর্য্য তখন পূর্ব্বদিকে ওঠে বটে কিন্তু সেই সঙ্গেই উত্তরে দক্ষিণে পশ্চিমেও আলো ছড়াইয়া পড়ে। এক-এক ইঞ্চি করিয়া ধাপে ধাপে যদি জাতির উন্নতি হইত তবে মহা-কালকেও হার মানিতে হইত। মানুস আগে সম্পূর্ণ যোগ্য হইবে তার পরে সুযোগ পাইবে এই কথাটাই যদি সত্য হয় তবে পৃথিবীতে কোনো জাতিই আজ স্বাধীনতার যোগ্য হয় নাই। ডিমক্রেসির দেমাক্ করিতেছ! কিন্তু য়ুরোপের জনসাধারণের মধ্যে আজও প্রচুর বীভৎ-সতা আছে—সে-সব কুৎসার কথা ঘাঁটিতে ইচ্ছা করে না! যদি কোনো কর্ণধার বলিত এই সমস্ত যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ডিমক্রেসি তার কোনো অধিকার পাইবে না তবে বীভৎসতা তো থাকিতই, আবার সেই পাপের স্বাভাবিক প্রতিকারের উপায়ও চলিয়া যাইত।

তেমনি আমাদের সমাজে, আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণায়, দুর্ব্বলতা যথেষ্ট আছে সে-কথা ঢাকিতে চাহিলেও ঢাকা পড়িবে না। তবু আমরা আত্মকর্ত্তৃত্ব চাই। অন্ধকার ঘরে এককোণের বাতিটা মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে বলিয়া যে আর-এককোণের বাতি জ্বালাইবার দাবী নাই এ কাজের কথা নয়। যে-দিকের যে সলতে দিয়াই হোক্ আলো জ্বালাই চাই। আজ মনুষ্যত্বের দেয়ালি মহোৎসবে কোনো দেশই তার সব বাতি পূরা জ্বালাইয়া উঠিতে পারে নাই—তবু উৎসব চলিতেছে। আমাদের ঘরের বাতিটা কিছুকাল হইতে নিবিয়া গেছে—তোমাদের শিখা হইতে যদি ওটাকে জ্বালাইয়া লইতে যাই তবে তা লইয়া রাগারাগি করা কল্যাণের নহে। কেননা, ইহাতে তোমাদের আলো কমিবে না, এবং উৎসবের আলো বাড়িয়া উঠিবে।

উৎসবের দেবতা আজ আমাদিগকে ভিতর হইতে ডাকিতেছেন। পাণ্ডা কি আমাদের নিষেধ করিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে? সে যে

কেবল ধনী যজমানকেই দেখিলে গদগদ হইয়া ওঠে, ক্যানাডা অষ্ট্রেলিয়ার নামে সে ষ্টেশন পর্য্যন্ত ছুটিয়া যায়—আর গরীবের বেলায় তার ব্যবহার উল্টা—এটা তো সহিবে না। দেবতা যে দেখিতেছেন। ইহাতে স্বয়ং অন্তর্যামী যদি লজ্জারূপে অন্তরে দেখা না দেন, তবে ক্রোধ রূপে বাহির হইতে দেখা দিবেন।

কিন্তু আশার কারণটা উহাদের মধ্যেও আছে। আমাদের মধ্যেও আছে। বাঙালিকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি জানি আমাদের যুবকদের যৌবনধর্ম্ম কখনই চিরদিন ধারকরা বার্দ্ধক্যের মুখস পরিয়া বিজ্ঞ সাজিবে না। আবার আমরা ইংরেজের মধ্যেও এমন মহাত্মা বিস্তর দেখিলাম যাঁরা স্বজাতির কাছে লাঞ্ছনা সহিয়াও ইংরেজ-ইতিহাসবৃক্ষের অমৃত ফলটি ভারতবাসীর অধিকারে আনিবার জন্য উৎসুক। আমাদের তরফেও আমরা তেমনি মানুষের মতো মানুষ চাই যাঁরা বাহির হইতে দুঃখ এবং স্বজনদের নিকট হইতে ধিক্কার সহিতে প্রস্তুত। যাঁরা বিফলতার আশঙ্কাকে অতিক্রম করিয়াও মনুষ্যত্ব প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র।

ভারতের জরাবিহীন জাগ্রত ভগবান আজ আমাদের আত্মাকে আহ্বান করিতেছেন, যে আত্মা অপরিমেয়, যে আত্মা অপরাজিত, অমৃতলোকে যাহার অনন্ত অধিকার, অথচ যে আত্মা আজ অন্ধ প্রথা ও প্রভুত্বের অপমানে ধূলায় মুখ লুকাইয়া। আঘাতের পর আঘাত বেদনার পর বেদনা দিয়া তিনি ডাকিতেছেন, আপনাকে জানো।

আজ আমরা সম্মুখে দেখিলাম বৃহৎ এই মানুষের পৃথিবী, মহৎ এই মানুষের ইতিহাস। মানুষের মধ্যে ভূমাকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি; শক্তির রথে চড়িয়া তিনি মহাকালের রাজপথে চলিয়াছেন, রোগ তাপ বিপদ মৃত্যু কিছুতেই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না, বিশ্বপ্রকৃতি বর-

মাল্যে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইল, জ্ঞানের জ্যোতির্ম্ময় তিলকে তাঁর উচ্চললাট মহোজ্জ্বল, অতিদূর ভবিষ্যতের শিখরচূড়া হইতে তাঁর জন্য আগমনীর প্রভাত রাগিণী বাজিতেছে। সেই ভূমা আজ আমার মধ্যেও আপনার আসন খুঁজিতেছেন! ওরে অকাল-জরা-জর্জ্জরিত, আত্ম-অবিশ্বাসী ভীরু, অসত্যভারাবনত মূঢ়, আজ ঘরের লোকদের লইয়া ক্ষুদ্র ঈর্ষায় ক্ষুদ্র বিদ্বেষে কলহ করিবার দিন নয়, আজ তুচ্ছ আশা তুচ্ছ পদ-মানের জন্য কাঙালের মতো কাড়াকাড়ি করিবার সময় গেছে, আজ সেই মিথ্যা অহঙ্কার দিয়া নিজেকে ভুলাইয়া রাখিব না, যে অহঙ্কার কেবল আপন গৃহকোণের অন্ধকারেই লালিত হইয়া স্পর্দ্ধা করে, বিরাট বিশ্ব-সভার সম্মুখে যাহা উপহসিত লজ্জিত। অন্যকে অপবাদ দিয়া আত্ম-প্রসাদলাভের চেষ্টা অক্ষমের চিত্তবিনোদন, আমাদের তাহাতে কাজ নাই। যুগে যুগে আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধ জমিয়া উঠিল, তাহার ভারে আমাদের পৌরুষ দলিত, আমাদের বিচারবুদ্ধি মুমূর্ষু,—সেই বহু শতাব্দীর আবর্জ্জনা আজ সবলে সতেজে তিরস্কৃত করিবার দিন। সম্মুখে চলিবার প্রবলতম বাধা আমাদের পশ্চাতে; আমাদের অতীত তাহার সম্মোহনবাণ দিয়া আমাদের ভবিষ্যৎকে আক্রমণ করিয়াছে; তাহার ধূলিপুঞ্জে শুষ্কপত্রে সে আজিকার নূতন যুগের প্রভাতসূর্য্যকে ম্লান করিল, নবনব অধ্যবসায়শীল আমাদের যৌবন-ধর্ম্মকে অভিভূত করিয়া দিল, আজ নির্ম্মম বলে আমাদের সেই পিঠের দিকটাকে মুক্তি দিতে হইবে তবেই নিত্যসম্মুখগামী মহৎ মনুষ্যত্বের সহিত যোগ দিয়া আমরা অসীম ব্যর্থতার লজ্জা হইতে বাঁচিব, সেই মনুষ্যত্ব—যে মৃত্যুঞ্জয়ী, যে চিরজাগরূক, চিরসন্ধানরত, যে বিশ্বকর্ম্মার দক্ষিণ হস্ত, জ্ঞানজ্যোতিরা-লোকিত সত্যের পথে যে চিরযাত্রী, যুগযুগের নবনব তোরণদ্বারে যাহার জয়ধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়া দেশদেশান্তরে প্রতিধ্বনিত।

বাহিরের দুঃখ শ্রাবণের ধারার মতো আমাদের মাথার উপর নিরন্তর বর্ষিত হইয়াছে, অহরহ এই দুঃখভোগের যে তামসিক অশুচিতা, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাহার প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? নিজের মধ্যে নিজের ইচ্ছায় দুঃখকে বরণ করিয়া। সেই দুঃখই পবিত্র হোমাগ্নি,—সেই আগুনে পাপ পুড়িবে, মূঢ়তা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে, জড়তা ছাই হইয়া মাটিতে মিশাইবে। এসো প্রভু, তুমি দীনের প্রভু নও! আমাদের মধ্যে যে অদীন, যে অমর, যে প্রভু, যে ঈশ্বর আছে, হে মহেশ্বর তুমি তাহারই প্রভু—ডাকো আজ তাহাকে তোমার রাজ-সিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে! দীন লজ্জিত হউক, দাস লাঞ্ছিত হউক, মূঢ় তিরস্কৃত হইয়া চির-নির্ব্বাসন গ্রহণ করুক!

১৩২৪

ছোটো ও বড়ো

যে সময়ে দেশের লোক তৃষিত চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত; যে সময়ে রাষ্ট্রীয় আবহাওয়ার পর্য্যবেক্ষকেরা খবর দিলেন যে, হোম-রুলের প্রবল মৈসুম-হাওয়া আরব-সমুদ্র পাড়ি দিয়াছে, মুষলধারে বৃষ্টি নামিল বলিয়া; ঠিক সেই সময়েই মুষলধারে নামিল বেহার অঞ্চলে মুসলমানের প্রতি হিন্দুদের একটা হাঙ্গামা।

অন্য দেশেও সাম্প্রদায়িক ঈর্ষাদ্বেষ লইয়া মাঝে মাঝে তুমুল দ্বন্দ্বের কথা শুনি। আমাদের দেশে যে বিরোধ বাধে সে ধর্ম্ম লইয়া, যদিচ আমরা মুখে সর্ব্বদাই বড়াই করিয়া থাকি যে, ধর্ম্মবিষয়ে হিন্দুর উদারতার তুলনা জগতে কোথাও নাই। বর্ত্তমানকালের পশ্চিম মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যে বিরোধ বাধে তাহা অর্থ লইয়া। সেখানে খনির শ্রমিকেরা, সেখানে ডক ও রেলোয়ের কর্ম্মিকেরা মাঝে মাঝে হুলস্থূল বাধাইয়া তোলে; তাহা লইয়া আইন করিতে হয়, ফৌজ ডাকিতে হয়, আইন বন্ধ করিতে হয়, রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে। সে দেশে এইরূপ বিরোধের সময় দুই পক্ষ থাকে। এক পক্ষ উৎপাত করে, আরেক পক্ষ উৎপাত নিবারণের উপায় চিন্তা করে। ব্যঙ্গপ্রিয় কোনো তৃতীয় পক্ষ সেখানে বাহির হইতে দুয়ো দেয় না। কিন্তু আমাদের দুঃখের বাসর-ঘরে শুধু যে বর ও কনের দ্বৈততত্ত্ব তাহা নহে, তৃতীয় একটি কুটুম্বিনী আছেন, অট্টহাস্য এবং কানমলার কাজে তিনি প্রস্তুত।

ইংলণ্ডে এক সময় ছিল, যখন একদিকে তার রাষ্ট্রযন্ত্রটা পাকা হইয়া উঠিতেছে এমন সময়েই প্রটেস্ট্যান্ট ও রোমান-ক্যাথলিকদের মধ্যে

দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। সেই দ্বন্দ্বে দুই সম্প্রদায় যে পরস্পরের প্রতি বরাবর সুবিচার করিয়াছে তাহা নহে। এমন কি বহুকাল পর্যন্ত ক্যাথলিকরা বহু অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াই কাটাইয়াছে। আজও কোনো বিশেষ একটি সাম্প্রদায়িক চার্চের ব্যয়ভার ইংলণ্ডের সমস্ত লোককে বহন করিতে হইতেছে, সে দেশের অন্য সম্প্রদায়গুলির প্রতি ইহা অন্যায়। অশান্তি ও অসাম্যের এই বাহ্যিক ও মানসিক কারণগুলি আজ ইংলণ্ডে নিরুপদ্রব হইয়া উঠিয়াছে কেন? যেহেতু সেখানে সমস্ত দেশের লোকে মিলিয়া একটি আপন শাসনতন্ত্র পাইয়াছে। এই শাসনভার যদি সম্পূর্ণ বিদেশীর 'পরে থাকিত তবে যেখানে জোড়া মেলে নাই সেখানে ক্রমাগত ঠোকাঠুকি বাধিয়া বিচ্ছেদ স্থায়ী হইত। একদিন ব্রিটিশ পলিটিক্সে স্কটলণ্ড ও ইংলণ্ডের বিরোধ কম তীব্র ছিল না। কেননা উভয় জাতির মধ্যে ভাষা, ভাব, রুচি, প্রথা ও ঐতিহাসিক স্মৃতিধারার সত্যকারই পার্থক্য ছিল। দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়াই দ্বন্দ্ব ক্রমে ঘুচিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব ঘুচিবার প্রধান কারণ এই যে, ইংরেজ ও স্কচ উভয়েই একটা শাসনতন্ত্র পাইয়াছে যাহা উভয়েরই স্বাধিকারে; যাহাতে সম্পদে বিপদে উভয়েরই শক্তি সমান কাজ করিতেছে। ইহার ফল হইয়াছে এই, যে, আজ ইংলণ্ডে স্কটিশ চার্চে ও ইংলিশ চার্চে প্রভেদ থাকিলেও, রোমান ক্যাথলিকে প্রটেস্ট্যান্টে অনৈক্য ঘটিলেও, রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে শক্তির ঐক্যে মঙ্গল সাধনের যোগে তাহাদের মিলন ঘটিয়াছে। ইহাদের মাথার উপর একটি তৃতীয়পক্ষ যদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিয়া আপন ইচ্ছামতো ইহাদিগকে চালনা করিত, তাহা হইলে কোনো কালেই কি ইহাদের জোড় মিলিত? আয়র্লণ্ডের সঙ্গে আজ পর্যন্ত ভালো করিয়া জোড় মেলে নাই কেন? অনেক দিন পর্যন্তই আয়র্লণ্ডের সঙ্গে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় অধিকারের সাম্য ছিল না বলিয়া।

এ কথা মানিতেই হইবে আমাদের দেশে ধর্ম্ম লইয়া হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একটা কঠিন বিরুদ্ধতা আছে। যেখানে সত্যভ্রষ্টতা সেইখানেই অপরাধ, যেখানে অপরাধ সেইখানেই শাস্তি। ধর্ম্ম যদি অন্তরের জিনিস না হইয়া শাস্ত্রমত ও বাহ্য আচারকেই মুখ্য করিয়া তোলে তবে সেই ধর্ম্ম যত বড়ো অশান্তির কারণ হয়, এমন আর কিছুই না। এই "ডগ্‌মা" অর্থাৎ শাস্ত্রমতকে বাহির হইতে পালন-করা লইয়া য়ুরোপের ইতিহাস কতবার রক্তে লাল হইয়াছে। অহিংসাকে যদি ধর্ম্ম বলো, তবে সেটাকে কর্ম্মক্ষেত্রে দুঃসাধ্য বলিয়া ব্যবহারে না মানিতে পারি, কিন্তু বিশুদ্ধ আইডিয়ালের ক্ষেত্রে তাহাকে স্বীকার করিয়া ক্রমে সেদিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু বিশেষ শাস্ত্রমতের অনুশাসনে বিশেষ করিয়া যদি কেবল বিশেষ পশুহত্যা না করাকেই ধর্ম্ম বলা যায় এবং সেইটে জোর করিয়া যদি অন্য ধর্ম্মমতের মানুষকেও মানাইতে চেষ্টা করা হয়, তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ কোনোকালেই মিটিতে পারে না। নিজে ধর্ম্মের নামে পশুহত্যা করিব অথচ অন্যে ধর্ম্মের নামে পশুহত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর কোনো নাম দেওয়া যায় না। আমাদের আশা এই যে, চিরদিন আমাদের ধর্ম্ম আচার-প্রধান হইয়া থাকিবে না। আরো একটি আশা আছে, একদিন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দেশহিতসাধনের একই রাষ্ট্রীয় আইডিয়াল যদি আমাদের রাষ্ট্রতন্ত্রে বাস্তব হইয়া উঠে তবে সেই অন্তরের যোগে বাহিরের সমস্ত পার্থক্য তুচ্ছ হইয়া যাইবে।

অল্পদিন হইল, রেলগাড়িতে আমার এক ইংরেজ সঙ্গী জুটিয়াছিল। তিনি বেহার অঞ্চলের হাঙ্গামার প্রসঙ্গে গল্প করিলেন—সাহাবাদে কিম্বা কোনো এক জায়গায় ইংরেজ কাপ্তেন সেখানকার এক জমিদারকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার রায়তদের তোমরা তো ঠেকাইতে

পারিলে না! তোমরাই আবার হোমরুল চাও!" জমিদার কী জবাব করিলেন শুনি নাই। সম্ভবত তিনি লম্বা সেলাম করিয়া বলিয়াছিলেন, "না সাহেব, আমরা হোমরুল চাই না, আমরা অযোগ্য অধম! আপাতত আমার রায়ৎদের তুমি ঠেকাও!" বেচারা জানিতেন হোমরুল তখন সমুদ্রপারের স্বপ্নলোকে, কাপ্তেন ঠিক সম্মুখেই, আর হাঙ্গামাটা কাঁধের উপর চড়িয়া বসিয়াছে।

আমি বলিলাম, "হিন্দুমুসলমানের এই দাঙ্গাটা হোমরুলের অধীনে তো ঘটে নাই। নিরস্ত্র জমিদারটি অক্ষমতার অপবাদে বোধ করি একবার সেনাপতি সাহেবের ফৌজের দিকে নীরবে তাকাইয়াছিলেন! উপায় রহিল একজনের হাতে আর প্রতিকার করিবে আর-একজনে, এমনতরো শ্রমবিভাগের কথা আমরা কোথাও শুনি নাই। বাংলাদেশেও ঠিক স্বদেশী উত্তেজনার সময়, শুধু জামালপুরের মতো মফস্বলে নয়, একেবারে কলিকাতার বড়োবাজারে হিন্দুদের প্রতি মুসলমানের উপদ্রব প্রচণ্ড হইয়াছিল—সেটা তো শাসনের কলঙ্ক, শুধু শাসিতের নয়। এইরূপ কাণ্ড যদি সদাসর্ব্বদা নিজামের হাইদ্রাবাদে বা জয়পুর বরোদা মৈশুরে ঘটিতে থাকিত তবে সেনাপতি সাহেবের জবাব খুঁজিবার জন্য আমাদের ভাবিতে হইত।"

আমাদের নালিশটাই যে এই। কর্ত্তৃত্বের দায়িত্ব আমাদের হাতে নাই, কর্ত্তা বাহির হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার ভার লইয়াছে। ইহাতে আমরা ক্রমশই অন্তরের মধ্যে নিঃসহায় ও নিঃসম্বল হইতেছি; সেজন্য উল্টিয়া কর্ত্তারাই আমাদিগকে অবজ্ঞা করিলে ভয়ে ভয়ে আমরা জবাব দিই না বটে, কিন্তু মনে মনে যে ভাষা প্রয়োগ করি তাহা সাধু নহে। কর্ত্তৃত্ব যদি থাকিত তবে তাহাকে বজায় রাখিতে ও সার্থক করিতে হিন্দুমুসলমান উভয়েরই সমান গরজ থাকিত, সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতার

দায়িত্ব সকলে মিলিয়া অতি সাবধানে বহন করিতে হইত। এমনি করিয়া শুধু আজ নহে চিরদিনের মতো ভারতবর্ষের পোলিটিকাল আশ্রয় নিজের ভিত্তিতে পাকা হইত। কিন্তু এমন যদি হয়, যে, একদিন ভারত-ইতিহাসের পরিচ্ছেদ পরিবর্ত্তনকালে প্রস্থানের বেলায় ইংরেজ তার সুশাসনের ভগ্নাবশেষের উপর রাখিয়া গেল আত্মনির্ভরে অনভ্যস্ত, আত্মরক্ষায় অক্ষম, আত্মকল্যাণ-সাধনে অসিদ্ধ, আত্মশক্তিতে নষ্টবিশ্বাস বহুকোটি নরনারীকে—রাখিয়া গেল এমন ক্ষেত্রে যেখানে প্রতিবেশী নব উদ্যমে জাগ্রত, নব শিক্ষায় অপরিমিত শক্তিশালী, তবে আমাদের সেই চিরদৈন্য-পীড়িত অন্তহীন দুর্ভাগ্যের জন্য কাহাকে আমরা দায়ী করিব? আর যদি কল্পনাই করা যায় যে, মানবের পরিবর্ত্তনশীল ইতিহাসের মাঝখানে একমাত্র ভারতে ইংরেজসাম্রাজ্যের ইতিহাসই ধ্রুব হইয়া অনন্ত ভবিষ্যৎকে সদর্পে অধিকার করিয়া থাকিবে, তবে এই কি আমাদের ললাটের লিখন যে, ভারতের অধিবাসীরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে দেশের কল্যাণকর্ম্মবন্ধনের কোনো যোগ থাকিবে না; চিরদিনের মতোই তাহাদের আশা ক্ষুদ্র, তাহাদের শক্তি অবরুদ্ধ, তাহাদের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ, তাহাদের ভবিষ্যৎ পরের ইচ্ছায় পাষাণ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত?

এ পর্য্যন্ত ইংরেজের রাজত্বে আমরা এক-শাসন পাইয়াছি। কিন্তু এক-দায়িত্ব পাই নাই। তাই আমাদের ঐক্য বাহিরের। এ ঐক্যে আমরা মিলি না, পাশে পাশে সাজানো থাকি, বাহিরে বা ভিতরে একটু ধাক্কা পাইলেই ঠোকাঠুকি বাধিয়া যায়। এ ঐক্য জড় অকর্ম্মক, ইহা সজীব সকর্ম্মক নয়। ইহা ঘুমন্ত মানুষের এক খাটিতে শুইয়া থাকিবার ঐক্য, ইহা সজাগ মানুষের এক পথে চলিবার ঐক্য নহে। ইহাতে আমাদের গৌরব করিবার কিছু নাই; সুতরাং ইহা আনন্দ করিবার

নহে ; ইহাতে কেবল স্তুতি করিতে পারি, নতি করিতে পারি, উন্নতি করিতে পারি না।

একদিন আমাদের দেশে যে সমাজ ছিল তাহা সাধারণের প্রতি আমাদের দায়িত্বের আদর্শকে সচেষ্ট রাখিয়াছিল। সেই দায়িত্বের ক্ষেত্র ছিল সঙ্কীর্ণ, তখন আমাদের জন্মগ্রামকেই আমরা জন্মভূমি বলিয়া জানিতাম। তা হউক, সেই ছোটো সীমার মধ্যে ধনীর দায়িত্ব ছিল তার ধন লইয়া, জ্ঞানীর দায়িত্ব ছিল তার জ্ঞান লইয়া। যার যা শক্তি ছিল তার উপরে চারিদিকের দাবী ছিল। সচেষ্ট জীবনের এই যে নানাদিকে বিস্তার, ইহাতেই মানুষের যথার্থ আনন্দ ও গৌরব।

আমাদের সেই দায়িত্ব সমাজ হইতে বাহিরে সরিয়া গেছে। একমাত্র সরকার-বাহাদুরই আমাদের বিচার করেন, রক্ষা করেন, পাহারা দেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, শাস্তি দেন, সম্মান দেন, সমাজে কোন্‌টা হিন্দু কোনটা অহিন্দু আদালত হইতে তার বিধান দেন, মদের ভাঁটির বন্দোবস্ত করেন এবং গ্রামের লোককে বাঘে ধরিয়া খাইতে থাকিলে জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে সবান্ধবে শিকার করিবার সুযোগ দিয়া থাকেন। সুতরাং এখন আমাদের সমাজ আমাদের উপর যে-পরিমাণে ভার চাপাইয়াছে সে-পরিমাণে ভার বহিতেছে না। ব্রাহ্মণ এখনো দক্ষিণা আদায় করেন কিন্তু শিক্ষা দেন না, ভূস্বামী খাজনা শুষিয়া লন কিন্তু তাঁর কোনো দায় নেই, ভদ্রসম্প্রদায় জনসাধারণের কাছ হইতে সম্মান লন কিন্তু জনসাধারণকে আশ্রয় দেন না। ক্রিয়াকর্ম্মে খরচপত্র বাড়িয়াছে বই কমে নাই, অথচ সেই বিপুল অর্থব্যয় সমাজব্যবস্থাকে ধারণ ও পোষণের জন্য নয়, তাহা রীতিরক্ষা ও সমারোহ করিবার জন্য। ইহাতে দেশের ধনীদরিদ্র সকলেই পীড়া বোধ করে। এদিকে দলাদলি, জাতে ঠেলাঠেলি, পুঁথির বিধান বেচাকেনা প্রভৃতি সমস্ত উৎপীড়নই আছে।

যে গাভীর বাঁধা খোরাক জোগাইতেছি সে দুধ দেওয়া প্রায় বন্ধ করিল, কিন্তু বাঁকা শিঙের গুঁতা মারাটা তার কমে নাই।

যে-ব্যবস্থা সমাজের ভিতরে ছিল সেটা বাহিরে আসিয়া পড়াতে সুব্যবস্থা হইল কি না সেটা লইয়া তর্ক নয়। মানুষ যদি কতকগুলা পাথরের টুক্‌রা হইত তবে তাহাকে কেমন করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে সাজাইয়া কাজে লাগানো যায় সেইটেই সব চেয়ে বড়ো কথা হইত। কিন্তু মানুষ যে মানুষ। তাকে বাঁচিতে হইবে, বাড়িতে হইবে, চলিতে হইবে। তাই এ কথাটা মানিতেই হইবে যে, দেশের সম্বন্ধে দেশের লোকের চেষ্টাকে নিরুদ্ধ করিয়া যে নিরানন্দের জড়ভার দেশের বুকে চাপিয়া বসিতেছে সেটা শুধু যে নিষ্ঠুর তাহা নহে, সেটা রাষ্ট্রনীতিহিসাবে নিন্দনীয়। আমরা যে-অধিকার চাহিতেছি তাহা ঔদ্ধত্য করিবার বা প্রভুত্ব করিবার অধিকার নহে; আমরা সকল ক্ষুধাতুরকে ঠেকাইয়া জগৎ-সংসারটাকে একলা দুহিয়া লইবার জন্য লম্বা লাঠি কাঁধে লইতে চাই না; যুদ্ধে নরঘাত সম্বন্ধে বিশ্বের সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি, বড়ো উদ্যোগ ও বড়ো উৎসাহ রাখি বলিয়া সয়তানকে লজ্জা দিবার দুরাকাঙ্ক্ষা আমাদের নাই; নিরীহ হিন্দু বলিয়া প্রবল পশ্চিম আমাদের উপরে যে-শ্লেষ প্রয়োগ করে তাহাকেই তিলক করিয়া আমাদের ললাটকে আমরা লাঞ্ছিত রাখিব; আধ্যাত্মিক বলিয়া আমাদের আধুনিক শাসনকর্ত্তারা আমাদের পরে যে কটাক্ষবর্ষণ করিয়াছেন তারই শরশয্যায় শেষ পর্য্যন্ত শয়ান থাকিতে আমরা দুঃখ বোধ করিব না,—আমরা কেবলমাত্র আপন দেশের সেবা করিবার, তার দায়িত্বগ্রহণ করিবার স্বাভাবিক অধিকার চাই। এই অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আশাহীন অকর্ম্মণ্যতার দুঃখ ভিতরে ভিতরে অসহ্য হইয়াছে। এইজন্যই সম্প্রতি জনসেবার জন্য আমাদের যুবকদের মধ্যে একটা প্রবল আগ্রহ দেখিতে পাই। নিরাপদ

শান্তির আওতায় মানুষ বাঁচে না। কেননা যেটা মানুষের অন্তরতম আবেগ তাহা বাড়িয়া চলিবার আবেগ। মহৎলক্ষ্যের প্রতি আত্মোৎসর্গ করিয়া দুঃখ স্বীকার করাই সেই বাড়িয়া চলিবার গতি। সকল বড়ো জাতির ইতিহাসেই এই গতির দুর্নিবার আবেগ ব্যর্থতা ও সার্থক্যের উপলবন্ধুর পথে গর্জ্জিয়া ফেনাইয়া, বাধা ভাঙিয়া চুরিয়া, ঝরিয়া পড়িতেছে। ইতিহাসের সেই মহৎ দৃশ্য আমাদের মতো পোলিটিকাল পঙ্গুদের কাছ হইতেও আড়াল করিয়া রাখা অসম্ভব। এইজন্য যে-সব যুবকের প্রকৃতিতে প্রাণের স্বাভাবিক উত্তেজনা আছে, মহতের উপদেশ ও ইতিহাসের শিক্ষা হইতে প্রেরণা লাভ করা সত্বেও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা তাদের কাছে যে, মৃত্যুর চেয়ে দারুণতর, সে কথা আত্মহত্যাকালে শচীন্দ্র দাসগুপ্তের মর্ম্মান্তিক বেদনার পত্রখানি পড়িলেই বুঝা যাইবে। কিন্তু কেবল ক্ষণে ক্ষণে বন্যা-দুর্ভিক্ষের নৈমিত্তিক উপলক্ষ্যে অন্তর্গূঢ় সমস্ত শুভচেষ্টা নির্মুক্ত হইতে পারে না। দেশব্যাপী নিত্যকর্ম্মের মধ্যেই মানুষের বিচিত্রশক্তি বিচিত্রভাবে সফল হয়। নতুবা তার অধিকাংশই বদ্ধ হইয়া আন্তরিক নৈরাশ্যের উত্তাপে বিকৃত হইতে থাকে। এই বিকার হইতে দেশে নানা গোপন উপদ্রবের সৃষ্টি। এইজন্য দেখা যায় দেশের ধর্ম্মবুদ্ধি ও শুভচেষ্টার প্রতিই কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ সুতীব্র। যে লোক স্বার্থপর বেইমান, যে উদাসীন নিশ্চেষ্ট, বর্ত্তমানের গুপ্ত ব্যবস্থায় তারই জীবনযাত্রা সকলের চেয়ে নিরাপদ, তারই উন্নতি ও পুরস্কারের পথে সকলের চেয়ে বাধা অল্প। নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতার জবাবদিহি ভয়ঙ্কর হইয়াছে। কেননা সন্দিগ্ধের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন যে, "মহৎ অধ্যবসায়ে তোমার দরকার কী? তুমি খাইয়া-দাইয়া বিয়া-থাওয়া করিয়া আপিসে আদালতে ঘুরিয়া মোটা বা সরু মাহিনায় যখন স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে পারো, তখন ঘরের খাইয়া বনের মোষ

তাড়াইতে যাও কেন ?” বস্তুত কর্তৃপক্ষ জানেন, এই আলো এবং ঐ ধোঁয়া একই কারণ হইতে উঠিতেছে। সে কারণটা, নিষ্ক্রিয়তার অবসাদ হইতে দেশের শুভবুদ্ধির মুক্ত হইবার চেষ্টা। যুক্তিশাস্ত্রে বলে “পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ।” গুপ্তচরের যুক্তি বলে, “পর্ব্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ।” কিন্তু যাই বলুক্ আর যাই করুক্, মাটির তলায় ঐ যে দারুণ সুড়ঙ্গপথ খোলা হইল, যেখানে আলো নাই, শব্দ নাই, বিচার নাই, নিষ্কৃতির কোনো বৈধ উপায় নাই, এইটেই কি সুপথ হইল ? দেশের ব্যাকুল চেষ্টাকে বিনা বাছনিতে একদমে কবরস্থ করিলে তার প্রেতের উৎপাতকে কি কোনোদিন শান্ত করিতে পারিবে ? ক্ষুধার ছটফটানিকে বাহির হইতে কানমলা দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া চির দুর্ভিক্ষকে ভদ্র আকার দান করাই যে যথার্থ ভদ্রনীতি এমন কথা তো বলিতে পারিই না, তাহা যে বিজ্ঞ-নীতি তাহাও বলা যায় না।

এই রকম চোরা-উৎপাতের সময় সমুদ্রের ওপার হইতে খবর আসিল আমাদিগকে দান করিবার জন্য স্বাধীন শাসনের একটা খসড়া তৈরি হইতেছে। মনে ভাবিলাম কর্তৃপক্ষ বুঝিয়াছেন যে, শুধু দমনের বিভীষিকায় অশান্তি দূর হয় না, দাক্ষিণ্যেরও দরকার। দেশ আমার দেশ, সে তো কেবল এখানে জন্মিয়াছি বলিয়াই নয়, এদেশের ইতিহাস-সৃষ্টি-ব্যাপারে আমার তপস্যার উপরে সমস্ত দেশের দাবী আছে বলিয়াই এদেশ আমার দেশ, এই গভীর মমত্ববোধ যদি দেশের লোক অনুভব করিবার উৎসাহ পায় তবেই এদেশে ইংরেজরাজত্বের ইতিহাস গৌরবান্বিত হইবে। কালক্রমে বাহিরে সে ইতিহাসের অবসান ঘটিলেও অন্তরে তাহার মহিমা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তা ছাড়া নিরতিশয় দুর্ব্বলেরও প্রতিকূলতা নৌকার ক্ষুদ্রতম ছিদ্রের মতো। শান্তির সময় নিরন্তর জল সেঁচিয়া সেই ফাটা নৌকা বাওয়া যায়,

কিন্তু তুফানের সময় যখন সকল হাতই দাঁড়ে হালে পালে আটক থাকে তখন তলার অতিতুচ্ছ ফাটলগুলিই মুস্কিল বাধায়। রাগ করিয়া তার উপরে পুলিসের রেগুলেশন্ বা ননরেগুলেশন্ লাঠি ঠুকিলে ফাটল কেবল বাড়িতেই থাকে। ফাঁকগুলিকে বুজাইবার জন্য সময় মতো সামান্য খরচ করিলে কালক্রমে অসামান্য খরচ বাঁচে। এই কথা যে ইংলণ্ডের মনীষী রাষ্ট্রনৈতিকেরা বুঝিতেছেন না তাহা আমি মনে করি না। বুঝিতেছেন বলিয়াই হোমরুলের কথাটা উঠিয়াছে।

কিন্তু রিপু অন্ধ; সে উপস্থিত কালকেই বড়ো করিয়া দেখে, অনাগতকে উপেক্ষা করে। ধর্ম্মের দোহাইকে সে দুর্ব্বলতা এবং সৌখীন ভাবুকতা বলিয়া অবজ্ঞা করে। অভাবনীয় প্রত্যাশার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ইংরেজের এই রিপুর কথাটাকে ভারতবর্ষ সামান্য বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিল। যে সমস্ত ইংরেজ এদেশে রাজসেরেস্তার আমলা বা পণ্যজীবী, তাহারা ভারতবর্ষের অত্যন্ত বেশি নিকটে আছে। এই নিকটের দৃশ্যের মধ্যে তাদেরই প্রতাপ, তাদেরই ধনসঞ্চয় সবচেয়ে সমুচ্চ, আর ভারতবর্ষের ত্রিশকোটি মানুষ তাদের সমস্ত সুখদুঃখ লইয়া ছায়ার মতো অস্পষ্ট, অবাস্তব ও ম্লান। এই কাছের ওজনে, এই উপস্থিত কালের মাপে ভারতবর্ষের দাবী ইহাদের কাছে তুচ্ছ। তাই যে-কোনো বরলাভের প্রভাবে ভারতবর্ষ কিছুমাত্র আত্মশক্তি লাভ করিবে তাহা ক্ষীণ হইয়া, খণ্ডিত হইয়া, রক্তশূন্য হইয়া আমাদের কাছে পৌঁছিবে অথবা অর্দ্ধপথে অপঘাত মৃত্যুতে মরিয়া ভারতভাগ্যের মরুপথকে ব্যর্থ সাধুসঙ্কল্পের কঙ্কালে আকীর্ণ করিবে।

এই বাধা দিবার শক্তি যাহারা বহন করিতেছে অব্যাহত প্রতাপের মদের নেশায় তারা মাতোয়ারা, কঠিন স্বাজাত্যভিমানের স্তরসঞ্চিত আবরণে তাহাদের মন ভারতবর্ষের মানুষসংস্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন।

ভারতবর্ষ ইহাদের কাছে একটা অতি প্রকাণ্ড সরকারী বা সওদাগরী আপিস। এদিকে ইংলণ্ডের যে ইংরেজ আমাদের ভাগ্যনায়ক তার রক্তের সঙ্গে ইহাদের রক্তের মিল, তার হাতের উপরে ইহাদের হাত, তার কানের কাছে ইহাদের মুখ, তার মন্ত্রণাগৃহে ইহাদের আসন, তার পোলিটিক্যাল নাট্যশালার নেপথ্যবিধান-গৃহে ইহাদের গতিবিধি। ভারতবর্ষ হইতে নিরন্তর প্রবাহিত হইতে হইতে ইংলণ্ডের ইংরেজ-সমাজের পরতে পরতে ইহারা মিশিয়াছে; সেখানকার ইংরেজের মনস্তত্ত্বকে ইহারা গড়িয়া তুলিতেছে। ইহারা নিজের পক্ককেশের শপথ করে, অভিজ্ঞতার দোহাই পাড়ে এবং "আমরাই ভারতসাম্রাজ্যের শিখড়-চূড়াকে অপরিমিত উচ্চ করিয়া তুলিয়াছি" এই বলিয়া ইহারা অপরিমিত প্রশ্রয় দাবী করে। এই অভ্রভেদী অভিমানের ছায়াস্তরালে আমাদের ভাষা, আমাদের আশা, আমাদের অস্তিত্ব কোথায়? ইহাকে উত্তীর্ণ হইয়া, আপিসের প্রাচীর ডিঙাইয়া, ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে মানুষ বলিয়া দেখিতে পায় এমন অসাধারণ দৃষ্টিশক্তি কার কাছে প্রত্যাশা করিব?

যে দূরবর্ত্তী ইংরেজ য়ুরোপীয় আবহাওয়ার মধ্যে আছে বলিয়াই অন্ধস্বার্থের কুহক কাটাইয়া ভারতবর্ষকে উদার দৃষ্টিতে দেখিতে পায়, ইহারা তাহাদিগকে জানায়, যে, নিচের আকাশের ধূলানিবিড় বাতাসের মধ্য দিয়া দেখাই বাস্তবকে দেখা, উপরের স্বচ্ছ আকাশ হইতে দেখাই বস্তুতন্ত্রবিরুদ্ধ। ভারতশাসনে দূরের ইংরেজের হস্তক্ষেপ করাকে ইহারা স্পর্দ্ধিত অপরাধ বলিয়া গণ্য করে। ভারতবাসীকে এই কথাটা মনে রাখিতে হইবে, ইংরেজ বলিয়া যে-একটি মহৎ জাতি আছে প্রকৃতপক্ষে সেই যে ভারতশাসন করিতেছে তাহা নহে; ভারত দফতরখানার বহুকালক্রমাগত সংস্কারের এসিডে কাঁচাবয়স হইতে জীর্ণ হইয়া যে-

একটি আমলা-সম্প্রদায় আমাদের পক্ষে কৃত্রিম মানুষ হইয়া আছে আমরা তাহারই প্রজা। যে-মানুষ তার সমস্ত মন-প্রাণ-হৃদয় লইয়া মানুষ সে নয়, যে-মানুষ কেবলমাত্র বিশেষ প্রয়োজনের মাপে মানুষ সেই তো কৃত্রিম মানুষ। ফোটোগ্রাফের ক্যামেরাকে কৃত্রিম চোখ বলিতে পারি। এই ক্যামেরা খুব স্পষ্ট করিয়া দেখে কিন্তু সম্পূর্ণ করিয়া দেখে না, তাহা চলতিকে দেখে না, যাহাকে দেখা যায় না তাহাকে দেখে না। এইজন্য বলা যায় যে, ক্যামেরা অন্ধ হইয়া দেখে। সজীব চোখের পিছনে সমগ্র মানুষ আছে বলিয়া তাহার দেখা কোনো আংশিক প্রয়োজনের পক্ষে যত অসম্পূর্ণ হোক মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পূর্ণ ব্যবহারক্ষেত্রে তাহাই সম্পূর্ণতর। বিধাতার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ যে তিনি চোখের বদলে আমাদিগকে ক্যামেরা দেন নাই। কিন্তু হায় ভারতশাসনে তিনি এ কী দিলেন? যে বড়ো ইংরেজ ষোলো আনা মানুষ, আমাদের ভাগ্যে সে থাকে সমুদ্রের ওপারে, আর এপারে পাড়ি দিতেই প্রয়োজনের কাঁচিকলের মধ্যে আপনার বারো আনা ছাঁটিয়া সে এতটুকু ছোটো হইয়া বাহির হইয়া আসে। সেই এতটুকুর পরিমাণ কেবল সেইটুকু যাতে বাড়তির ভাগ কিছুই নাই, অর্থাৎ মানুষের যেটা স্বাদ, গন্ধ, লাবণ্য, যেটা তার কমনীয়তা ও নমনীয়তা, জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে যাহা নিজেও বাড়িতে থাকে অন্যকেও বাড়াইতে থাকে সে সমস্তই কি বাদ পড়িল? এই ছোটোখাটো ছাঁটা-ছোঁটা ইংরেজ কোনোমতেই বুঝিতে পারে না এমন অত্যন্ত দামী ও নিখুঁৎ ক্যামেরা পাইয়াও সজীব চোখের চাহনির জন্য ভিতরে-ভিতরে আমাদের এত তৃষ্ণা কেন? বোঝে না তার কারণ, কলে ছাঁট পড়িবার সময় ইহাদের কল্পনাবৃত্তিটা যে বাদ পড়িয়াছে। ইংলণ্ডের সরকারী অনাথ-আশ্রমে যারা থাকে তাদের মন কেন পালাই-পালাই এবং প্রাণ কেন

ত্রাহি-ত্রাহি করে? কেননা ঐ work-house সম্পূর্ণ ঘরও নয়, সম্পূর্ণ বাহিরও নয়। উহা আত্মীয়তাও দেয় না, মুক্তিও দেয় না। উহা কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া কেবলমাত্র আশ্রয় দেয়। আশ্রয়টা অত্যন্ত দরকারী বটে, কিন্তু মানুষ যেহেতু মানুষ সেইজন্য সে ঘরকে চায়, অর্থাৎ দরকারের সঙ্গে বহুল পরিমাণে অ-দরকারকে না পাইলে সে বাঁচে না। নহিলে সে অপমানিত হয়, সুবিধা-সুযোগ ফেলিয়াও সে পালাইতে চেষ্টা করে। অনাথ-আশ্রমের কড়া কার্যাধ্যক্ষ এই অকৃতজ্ঞতায় ক্রুদ্ধ ও বিস্মিত হয় এবং কেবল তার ক্রোধের দ্বারাই দুঃখকে দমন করিবার জন্য সে দণ্ডধারণ করে। কেন না, এই কার্য্যাধ্যক্ষ পূরা মানুষ নয়, ইহার পূরা দৃষ্টি নাই, এই ছোটো মানুষ মনে করে দুর্ভাগা ব্যক্তি কেবলমাত্র আশ্রয়ের শান্তিটুকুর জন্য মুক্তির অসীম আশায় ব্যাকুল আপন আত্মাকে চিরদিনের মতোই বণিকের ঘরে বাঁধা রাখিতে পারে।

বড়ো ইংরেজ অব্যবহিতভাবে ভারতবর্ষকে স্পর্শ করে না—সে মাঝখানে রাখিয়াছে ছোটো ইংরেজকে। এইজন্য বড়ো ইংরেজ আমাদের কাছে সাহিত্য-ইতিহাসের ইংরেজি পুঁথিতে, এবং ভারতবর্ষ বড়ো ইংরেজের কাছে আপিসের দপ্তরে এবং জমাখরচের পাকাখাতায়। অর্থাৎ ভারতবর্ষ তার কাছে স্তূপাকার ষ্ট্যাটিস্‌টিক্সের সমষ্টি। সেই ষ্ট্যাটিস্‌টিক্সে দেখা যায় কত আমদানি কত রপ্তানি; কত আয় কত ব্যয়; কত জন্মিল কত মরিল; শান্তিরক্ষার জন্য কত পুলিস, শান্তিদিবার জন্য কত জেলখানা; রেলের লাইন কত দীর্ঘ, কলেজের ইমারত কয় তলা উচ্চ। কিন্তু সৃষ্টি তো শুধু নীলাকাশ-জোড়া অঙ্কের তালিকা নয়। সেই অঙ্কমালার চেয়ে অনেক বেশির হিসাবটা ভারত-আপিসের কোনো ডিপার্টমেণ্ট দিয়া কোনো মানব-জীবের কাছে গিয়া পৌঁছায় না।

একথা বিশ্বাস করিতে যত বাধাই থাক্ তবু আমাদের দেশের লোকের ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, বড়ো ইংরেজ বলিয়া একটা বড়ো জাতি সত্যই ভূগোলের এক জায়গায় আছে। প্রবলের প্রতি দুর্ব্বল যে অবিচার করে তাহাতে তার দুর্ব্বলতারই পরিচয় হয়—সেই দীনতা হইতে মুক্ত থাকিলেই আমাদের গৌরব। এ কথা শপথ করিয়া বলা যায় যে, এই বড়ো ইংরেজ সর্ব্বাংশেই মানুষের মতো। ইহাও নিশ্চিত যে, জগতের সকল বড়ো জাতিই যে-ধর্ম্মের বলে বড়ো হইয়াছে ইংরেজও সেই বলেই বড়ো; অত্যন্ত রাগ করিয়াও এ কথা বলা চলিবে না যে সে কেবল তলোয়ারের ডগায় ভর করিয়া উঁচু হইয়াছে কিম্বা টাকার থলির উপরে চড়িয়া। কোনো জাতিই টাকা করিতে কিম্বা লড়াই করিতে পারে বলিয়াই ইতিহাসে গৌরব লাভ করিয়াছে একথা অশ্রদ্ধেয়। মনুষ্যত্বে বড়ো না হইয়াও কোনো জাতি বড়ো হইয়াছে এ কথাটাকে বিনা সাক্ষ্যপ্রমাণে গোড়াতেই ডিস্‌মিস্ করা যাইতে পারে। ন্যায়, সত্য এবং স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা এই ইংরেজজাতির অন্তরের আদর্শ। সেই আদর্শ ইহাদের সাহিত্যে ও ইতিহাসে নানা আকারে ও অধ্যবসায়ে প্রকাশ পাইয়াছে এবং আজিকার মহাযুদ্ধেও সেই আদর্শ নানা ছলনা ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাহাদিগকে শক্তিদান করিতেছে।

এই বড়ো ইংরেজ স্থির নাই, সে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ইতিহাসেব মধ্য দিয়া তার জীবনের পরিবর্ত্তন ও প্রসার ঘটিতেছে। সে কেবল তার রাষ্ট্র ও বাণিজ্য লইয়া নয়, তার শিল্প সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম্ম ও সমাজ লইয়া পূর্ণপ্রবাহে চলিয়াছে। সে সৃজনধর্ম্মী; য়ুরোপীয় সভ্যতার বিরাট যজ্ঞে সে একজন প্রধান হোতা। বর্ত্তমান যুদ্ধের মহৎশিক্ষা তার চিত্তকে প্রতিমুহূর্ত্তে আন্দোলিত করিতেছে। মৃত্যুর উদার বৈরাগ্য-আলোকে সে মানুষের ইতিহাসকে নূতন করিয়া

পড়িবার সুযোগ পাইল। সে দেখিল অপমানিত মনুষ্যত্বের প্রতিকূলে স্বাজাত্যের আত্মাভিমানকে একান্ত করিয়া তুলিবার অনিবার্য্য দুর্য্যোগটা কী? সে আজ নিজের গোচরে বা অগোচরে প্রত্যহ বুঝিতেছে, যে, স্বজাতির যিনি দেবতা সর্ব্বজাতির দেবতাই তিনি, এইজন্য তাঁহার পূজায় নরবলি আনিলে একদিন রুদ্র তাঁর প্রলয়রূপ ধারণ করেন। আজ যদি সে না-ও বুঝিয়া থাকে, একদিন সে বুঝিবেই যে, হাওয়া যেখানেই পাৎলা, ঝড়ের কেন্দ্রই সে জায়গাটায়—কেননা চারিদিকের মোটা হাওয়া সেই ফাঁক দখল করিতেই ঝুঁকিয়া পড়ে। তেমনি পৃথিবীর যে-সব দেশ দুর্ব্বল, সবলের দ্বন্দ্বের কারণ সেখানেই; লোভের ক্ষেত্র সেখানেই; মানুষ সেখানে আপন মহৎস্বরূপে বিরাজ করে না; মানুষ প্রত্যহই সেখানে অসতর্ক হইয়া আপন মনুষ্যত্বকে শিথিল করিয়া বর্জ্জন করিতে থাকে। সয়তান সেখানে আসন জুড়িয়া ভগবানকে দুর্ব্বল বলিয়া বিদ্রূপ করে। বড়ো ইংরেজ একথা বুঝিবেই, যে, বালির উপর বাড়ি করা চলে না, একের শক্তিহীনতার উপরে অপরের শক্তির ভিত্তি কখনই পাকা হইতে পারে না।

কিন্তু ছোটো ইংরেজ অগ্রসর হইয়া চলে না। যে-দেশকে সে নিশ্চল করিয়া বাঁধিয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী সেই দেশের সঙ্গে সে আপনি বাঁধা। তার জীবনের এক পিঠে আপিস, আরেক পিঠে আমোদ। যে-পিঠে আপিস সে-পিঠে সে ভারতের বহু কোটি মানুষকে রাষ্ট্রিকের রাজদণ্ডের বা বণিকের মানদণ্ডের ডগাটা দিয়া স্পর্শ করে, আর যে-পিঠে আমোদ সে-পিঠটা চাঁদের পশ্চাদ্দিকের মতো, বৎসরের পর বৎসর সম্পূর্ণ অদৃশ্য। তবু কেবলমাত্র কালের অঙ্কপাত হিসাব করিয়া ইহারা অভিজ্ঞতার দাবী করে। ভারত-অধিকারের গোড়ায় ইহারা সৃজনের কাজে রত ছিল, কিন্তু তাহার পর বহুদীর্ঘকাল ইহারা

পাকা সাম্রাজ্য ও পাকা বাণিজ্যকে প্রধানত পাহারা দিতেছে ও ভোগ করিতেছে। নিরন্তর রুটিনের ঘানি টানিয়া ইহারা বিষয়ীলোকদের পাকা প্রকৃতি পাইয়াছে, সেই প্রকৃতি কঠিন অসাড়তাকেই বল বলিয়া থাকে। তারা মনে করে তাদের আপিসটা সুনিয়মে চলিতেছে এইটেই বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা। কিন্তু আপিসের জানলার বাহিরে রাস্তার ধূলার উপর দিয়া বিশ্বদেবতা তাঁর রথযাত্রায় অতি দীনকেও যে নিজের সারথ্যেই চালাইতেছেন এই চালনাকে তারা অশ্রদ্ধা করে। অক্ষমের সঙ্গে নিয়ত কারবার করিয়া এ কথা তারা ধ্রুব বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে যেমন তারা বর্ত্তমানের মালিক তেমনি তারা ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। আমরা এখানে আসিয়াছি এই কথা বলিয়াই তারা চুপ করে না, আমরা এখানে থাকিবই এই কথা বলিয়া তারা স্পর্দ্ধা করে।

অতএব, ওরে মরীচিকালুব্ধ দুর্ভাগা, বড়ো ইংরেজের কাছ হইতে জাহাজ বোঝাই করিয়া বর আসিতেছে কেবল এই আশাটাকে বুকে করিয়াই পশ্চিমের ঘাটের দিকে অতবেশি কলরব করিতে-করিতে ছুটিয়ো না। এই আশঙ্কাটাকেও মনে রাখিয়ো যে, ভারত-সাগরের তলায়-তলায় ছোটো ইংরেজের "মাইন্" সাব বাঁধিয়া আছে। এটা অসম্ভব নয় যে তোমার ভাগ্যে জাহাজের যে ভাঙা কাঠ আছে সেটা স্বাধীনশাসনের অন্ত্যেষ্টিসংকারের কাজে লাগিতে পারে। তারপরে লোনাজলে পেট ভরাইয়া ডাঙায় উঠিতে পারিলেই আমাদের অদৃষ্টের কাছে কৃতজ্ঞ থাকিব।

দেখিতে পাই, বড়ো ইংরেজের দাক্ষিণ্যকেই চরম সম্পদ গণ্য করিয়া আমাদের লোকে চড়া চড়া কথায় ছোটো ইংরেজের মুখের উপর জবাব দিতে সুরু করিয়াছেন। ছোটো ইংরেজের জোর যে কতটা খেয়াল করিতেছেন না। ভুলিয়াছেন মাঝখানের পুরোহিতের মামুলি

বরাদ্দের পাওনা উপরের দেবতার বরকে বিকাইয়া দিতে পারে। এই মধ্যবর্ত্তীর জোর কতটা এবং ইঁহাদের মেজাজটা কী ধরণের সে কি বারে বারে দেখি নাই? ছোটো ইংরেজের জোর কত সেটা যে কেবল আমরা লর্ড রিপনের এবং কিছু পরিমাণে লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে দেখিলাম তাহা নহে, আর একদিন লর্ড ক্যানিং এবং লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলেও দেখা গেছে।

তাই দেশের লোককে বারবার বলি "কিসের জোরে স্পর্দ্ধা করো? গায়ের জোর? তাহা তোমার নাই। কণ্ঠের জোর? তোমার যেমনি অহঙ্কার থাক্ সেও তোমার নাই। মুরুব্বির জোর? সেও তো দেখি না। যদি ধর্ম্মের জোর থাকে তবে তারই প্রতি সম্পূর্ণ ভরসা রাখো। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দুঃখ পাইবার মহৎ অধিকার হইতে কেহ তোমাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, লোকশ্রেয়ের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিবার গৌরব দুর্গম পথের প্রান্তে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। বর যদি পাই তবে অন্তর্যামীর কাছ হইতে পাইব।"

দেখো নাই কি, বরদানের সঙ্কল্প ব্যাপারে ভারত-গবর্ণমেণ্টের উচ্চতম বিভাগের যোগ আছে শুনিয়া এদেশী ইংরেজের সংবাদপত্র অট্টহাস্যে প্রশ্ন করিতেছে, "ভারত-সচিবদের স্নায়ুবিকার ঘটিল নাকি? এমন কি উৎপাতের কারণ ঘটিয়াছে যে বজ্রপাত-ডিপার্টমেণ্ট হইতে হঠাৎ বৃষ্টিপাতের আয়োজন হইতেছে?" অথচ আমাদের ইস্কুলের কচি ছেলেগুলোকে পর্য্যন্ত ধরিয়া যখন দলে দলে আইনহীন রসাতলের নিরালোক ধামে পাঠানো হয় তখন ইঁহারাই বলেন, "উৎপাত এত গুরুতর যে, ইংরেজ সাম্রাজ্যের আইন হার মানিল, মগের মল্লুকের বে-আইনের আমদানি করিতে হইল!" অর্থাৎ মারিবার বেলায় যে আতঙ্কটা সত্য,

মলম দিবার বেলাতেই সেটা সত্য নয়। কেননা মারিতে খরচ নাই, মলম লাগাইতে খরচা আছে। কিন্তু তা-ও বলি, মারিবার খরচার বিল -কালে মলমের খরচার চেয়ে বড়ো হইয়া উঠিতে পারে। তোমরা জোরের সঙ্গে ঠিক করিয়া আছ যে, ভারতের যে-ইতিহাস ভারতবাসীকে লইয়া, সেটা সামনের দিকে বহিতেছে না; তাহা ঘূর্ণির মতো একটা প্রবল কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরিতে-ঘুরিতে তলার মুখেই ঝুঁকিতেছে। এমন সময় আপিস হইতে বাহির হইবার কালে হঠাৎ একদিন দেখিতে পাও স্রোতটা তোমাদের নক্সার রেখা ছাড়াইয়া কিছুদূর আগাইয়া গেছে। তখন রাগিয়া গর্জ্জাইতে-গর্জ্জাইতে বলো, পাথর দিয়া বাঁধো উস্‌কো, বাঁধ দিয়া দিয়া উহাকে ঘেরো। প্রবাহ তখন পথ না পাইয়া উপরের দিক হইতে নিচের দিকে তলাইতে থাকে—সেই চোরা প্রবাহকে ঠেকাইতে গিয়া সমস্ত দেশের বক্ষ দীর্ণ বিদীর্ণ করিতে থাকো।

আমার সঙ্গে এই ছোটো-ইংরেজের যে-একটা বিরোধ ঘটিয়াছিল সে-কথা বলি। বিনাবিচারে শতশত লোককে বন্দী করার বিরুদ্ধে কিছুদিন আগে একখানি ছোটো চিঠি লিখিয়াছিলাম। ইহাতে ভারত-জীবী কোনো ইংরেজি কাগজ আমাকে মিথ্যুক ও extremist বলিয়াছিল। ইঁহারা ভারত-শাসনের তক্‌মাহীন সচিব, সুতরাং আমাদিগকে সত্য করিয়া জানা ইঁহাদের পক্ষে অনাবশ্যক, অতএব আমি ইঁহাদিগকে ক্ষমা করিব। এমন কি, আমাদের দেশের লোক, যাঁরা বলেন আমার পদ্যেও অর্থ নাই গদ্যেও বস্তু নাই, তাঁদের মধ্যেও যে-দুইজন ঘটনাক্রমে আমার লেখা পড়িয়াছেন তাঁহাদিগকে অন্তত এ কথাটুকু কবুল করিতেই হইবে যে, স্বদেশী উত্তেজনার দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত আমি অতিশয়-পন্থার বিরুদ্ধে লিখিয়া আসিতেছি। আমি এই কথাই বলিয়া আসিতেছি যে অন্যায় করিয়া যে-ফল পাওয়া যায় তাহাতে কখনই শেষ পর্য্যন্ত ফলের

দাম পোষায় না, অন্যায়ের ঋণটাই ভয়ঙ্কর ভারী হইয়া উঠে। সে যা-ই হোক্, দিশি বা বিলিতি যে-কোনো কালীতেই হোক্ না আমার নিজের নামে কোনো লাঞ্ছনাতে আমি ভয় করিব না। আমার যেটা বলিবার কথা সে এই যে, অতিশয়-পন্থা বলিতে আমরা এই বুঝি, যে-পন্থা না ভদ্র, না বৈধ, না প্রকাশ্য: অর্থাৎ সহজপথে ফলের আশা ত্যাগ করিয়া অপথে বিপথে চলাকেই extremism বলে। এই পথটা যে নিরতিশয় গর্হিত সে কথা আমি জোরের সঙ্গেই নিজের লোককে বলিয়াছি, সেই জন্যই আমি জোরের সঙ্গে বলিবার অধিকার রাখি যে, extremism গবর্ণমেণ্টের নীতিতেও অপরাধ। আইনের রাস্তা বাঁধা-রাস্তা বলিয়া মাসে মাসে তাহাতে গম্যস্থানে পৌঁছিতে ঘুর পড়ে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া বেলজিয়মের বুকের উপর দিয়া সোজা হাঁটিয়া রাস্তা সংক্ষেপ করার মতো extremism কাহাকেও শোভা পায় না।

ইংরেজিতে যাকে short cut বলে আদিমকালের ইতিহাসে তাহা চলিত ছিল। "লে আও, উস্‌কো শির লে আও" এই প্রণালীতে গ্রন্থি খুলিবার বিরক্তি বাঁচিয়া যাইত, এক কোপে গ্রন্থি কাটা পড়িত। য়ুরোপের অহঙ্কার এই যে, সে আবিষ্কার করিয়াছে এই সহজ প্রণালীতে গ্রন্থি কাটা পড়ে বটে কিন্তু মালের গুরুতর লোকসান ঘটে। সভ্যতার একটা দায়িত্ব আছে, সকল সঙ্কটেই সে-দায়িত্ব তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। শাস্তি দেওয়ার মধ্যে একটা দারুণতা অনিবার্য্য বলিয়াই শাস্তিটাকে ন্যায়বিচার প্রণালীর ফিল্‌টারের মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত রাগ-দ্বেষ ও পক্ষপাত পরিশূন্য করিয়া সভ্যসমাজ তবে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে। তাহা না হইলেই লাঠিয়ালের লাঠি এবং শাসনকর্ত্তার ন্যায়-দণ্ডের মধ্যে প্রভেদ বিলুপ্ত হইতে থাকে।

স্বীকার করি, কাজ কঠিন হইয়াছে। বাংলাদেশের একদল বালক

ও যুবক স্বদেশের সঙ্গে স্বদেশীর সত্য যোগ-সাধনের বাধা-অতিক্রমের যে-পথ অবলম্বন করিয়াছে তাহার জন্য আমরা লজ্জিত আছি। আরো লজ্জিত এইজন্য যে, দেশের প্রতি কর্ত্তব্যনীতির সঙ্গে ধর্ম্মনীতির বিচ্ছেদসাধন করায় অকর্ত্তব্য নাই একথা আমরা পশ্চিমের কাছ হইতেই শিখিয়াছি। পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য মিথ্যা এবং পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য দুস্যুবৃত্তি পশ্চিম সোনার সহিত খাদ মিশানোর মতো মনে করেন, মনে করেন ওটুকু না থাকিলে সোনা শক্ত হয় না। আমরাও শিখিয়াছি যে, মানুষের পরমার্থকে দেশের স্বার্থের উপরে বসাইয়া ধর্ম্ম লইয়া টিক্‌টিক করিতে থাকা মূঢ়তা, দুর্ব্বলতা, ইহা সেণ্টিমেণ্টালিজম্,—বর্ব্বরতাকে দিয়াই সভ্যতাকে এবং অধর্ম্মকে দিয়াই ধর্ম্মকে মজবুৎ করা চাই। এমনি করিয়া আমরা যে কেবল অধর্ম্মকে বরণ করিয়া লইয়াছি তাহা নহে, আমাদের গুরুমশায়দের যেখানে বীভৎসতা, সেই বীভৎসতার কাছে মাথা হেঁট করিয়াছি। নিজের মনের জোরে ধর্ম্মের জোরে গুরুমশায়ের উপরে দাঁড়াইয়াও একথা বলিবার তেজ ও প্রতিভা আমাদের আজ নাই যে,

অধর্ম্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি,
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অর্থাৎ অধর্ম্মের দ্বারা মানুষ বাড়িয়া উঠে, অধর্ম্ম হইতে সে আপন কল্যাণ দেখে, অধর্ম্মের দ্বারা সে শত্রুদিগকেও জয় করে, কিন্তু একেবারে মূল হইতে বিনাশ পায়।—তাই বলিতেছি, গুরুমশায়দের কাছে আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধিরও যে এত বড়ো পরাভব হইয়াছে ইহাতেই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো লজ্জা। বড়ো আশা করিয়াছিলাম, দেশে যখন দেশভক্তির আলোক জ্বলিয়া উঠিল তখন আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যাহা সকলের চেয়ে মহৎ তাহাই উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইবে; আমাদের যাহা

যুগসঞ্চিত অপরাধ তাহা আপন অন্ধকার কোণ ছাড়িয়া পালাইয়া যাইবে; দুঃসহ নৈরাশ্যের পাষাণস্তর বিদীর্ণ করিয়া অক্ষয় আশার উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিবে এবং দুরূহ নিরুপায়তাকেও উপেক্ষা করিয়া অপরাহত ধৈর্য্য এক-এক পা করিয়া আপনার রাজপথ নির্ম্মাণ করিবে; নিষ্ঠুর আচারের ভারে এদেশে মানুষকে মানুষ যে অবনত অপমানিত করিয়া রাখিয়াছে অকৃত্রিম প্রীতির আনন্দময় শক্তির দ্বারা সেই ভারকে দূর করিয়া সমস্ত দেশের লোক এক সঙ্গে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইব। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে এ কী হইল? দেশভক্তির আলোক জ্বলিল, কিন্তু সেই আলোতে এ কোন্ দৃশ্য দেখা যায়—এই চুরি ডাকাতি গুপ্তহত্যা? দেবতা যখন প্রকাশিত হইয়াছেন তখন পাপের অর্ঘ্য লইয়া তাঁহার পূজা? যে দৈন্য যে-জড়তায় এতকাল আমরা পোলিটিকাল ভিক্ষা-বৃত্তিকেই সম্পদলাভের সদুপায় বলিয়া কেবল রাজদরবারে দরখাস্ত লিখিয়া হাত পাকাইয়া আসিয়াছি, দেশপ্রীতির নব বসন্তেও সেই দৈন্য সেই জড়তা সেই আত্ম-অবিশ্বাস পোলিটিকাল চৌর্য্যবৃত্তিকেই রাতা-রাতি ধনী হইবার একমাত্র পথ মনে করিয়া সমস্ত দেশকে কি কলঙ্কিত করিতেছে না? এই চোরের পথ আর বীরের পথ কোনো চৌমাথায় একত্র আসিয়া মিলিবে না। য়ুরোপীয় সভ্যতায় এই দুই পথের সম্মিলন ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা ভ্রম করি, কিন্তু বিধাতার দরবারে এখনো পথের বিচার শেষ হয় নাই সে কথা মনে রাখিতে হইবে; আর বাহ্য ফললাভই যে চরম লাভ একথা সমস্ত পৃথিবী যদি মানে তবু ভারতবর্ষ যেন না মানে বিধাতার কাছে এই বর প্রার্থনা করি, তারপর পোলিটিকাল মুক্তি যদি পাই তো ভালো, যদি না পাই তবে তার চেয়ে বড়ো মুক্তির পথকে কলুষিত পলিটিক্সের আবর্জ্জনা দিয়া বাধাগ্রস্ত করিব না।

কিন্তু একটা কথা ভুলিলে চলিবে না যে, দেশভক্তির আলোকে বাংলাদেশে কেবল যে চোর-ডাকাতকে দেখিলাম তাহা নহে, বীরকেও দেখিয়াছি। মহৎ আত্মত্যাগের দৈবীশক্তি আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যেমন সমুজ্জ্বল করিয়া দেখিয়াছি এমন কোনোদিন দেখি নাই। ইহারা ক্ষুদ্র বিষয়বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রবল নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবার জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই পথের প্রান্তে কেবল যে গবর্ণমেণ্টের চাকুরী বা রাজসম্মানের আশা নাই তাহা নহে, ঘরের বিজ্ঞ অভিভাবকদের সঙ্গেও বিরোধে এ রাস্তা কণ্টকিত। আজ সহসা ইহাই দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি যে বাংলাদেশে এই ধনমানহীন সঙ্কটময় দুর্গমপথে তরুণপথিকের অভাব নাই। উপরের দিক হইতে ডাক আসিল, আমাদের যুবকেরা সাড়া দিতে দেরি করিল না; তারা মহৎ ত্যাগের উচ্চ শিখরে নিজের ধর্ম্মবুদ্ধির সম্বলমাত্র লইয়া পথ কাটিতে কাটিতে চলিবার জন্য দলে দলে প্রস্তুত হইতেছে। ইহারা কংগ্রেসের দরখাস্তপত্র বিছাইয়া আপন পথ সুগম করিতে চায় নাই, ছোটো ইংরেজ ইহাদের শুভ সংকল্পকে ঠিকমতো বুঝিবে কিম্বা হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে এ দুরাশাও ইহারা মনে রাখে নাই। অন্য সৌভাগ্যবান দেশে, যেখানে জনসেবার ও দেশসেবার বিচিত্র পথ প্রশস্ত হইয়া দিকে দিকে চলিয়া গেছে, যেখানে শুভ ইচ্ছা এবং শুভ ইচ্ছার ক্ষেত্র এই দুইয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ যোগ আছে, সেইখানে এই রকমের দৃঢ় সঙ্কল্প, আত্মবিসর্জ্জনশীল, বিষয়বুদ্ধিহীন, কল্পনাপ্রবণ ছেলেরাই দেশের সকলের চেয়ে বড়ো সম্পদ। আত্মঘাতী শচীন্দ্রের অন্তিমের চিঠি পড়িলে বোঝা যায় যে, এ ছেলেকে যে-ইংরেজ সাজা দিয়াছে সেই ইংরেজের দেশে এ যদি জন্মিত তবে গৌরবে বাঁচিতে এবং ততোধিক গৌরবে মরিতে পারিত। আদিমকালের বা এখনকার

কালের যে-কোনো রাজা বা রাজার আমলা এই শ্রেণীর জীবনবান ছেলেদের শাসন করিয়া দলন করিয়া দেশকে একপ্রান্ত হইতে আর-একপ্রান্ত পর্য্যন্ত অসাড় করিয়া দিতে পারে। ইহাই সহজ, কিন্তু ইহা ভদ্র নয়, এবং আমরা শুনিয়াছি ইহা ঠিক ইংলিশ নহে। যারা নিরপরাধ অথচ মহৎ, অথবা মহৎ উৎসাহের ক্ষণিক বিকারে যারা পথ ভুল করিয়াছে, যারা উপরে চড়িতে গিয়া নিচে পড়িয়াছে এবং অভয় পাইলেই যারা সে-পথ হইতে ফিরিয়া একদিন জীবনকে সার্থক করিতে পারিত, এমন সকল ছেলেকে সন্দেহমাত্রের 'পরে নির্ভর করিয়া চির-জীবনের মতো পঙ্গু করিয়া দেওয়ার মতো মানবজীবনের এমন নির্ম্মম অপব্যয় আর কিছুই হইতে পারে না। দেশের সমস্ত বালক ও যুবককে আজ পুলিসের গুপ্তদলনের হাতে নির্ব্বিচারে ছাড়িয়া দেওয়া—এ কেমনতরো রাষ্ট্রনীতি? এ-যে পাপকে হীনতাকে রাজপেয়াদার তকমা পরাইয়া দেওয়া। এ যেন রাত-দুপুরে কাঁচা ফসলের ক্ষেতে মহিষের পাল ছাড়িয়া দেওয়া। যার ক্ষেত সে কপাল চাপড়াইয়া হায় হায় করিয়া মরে, আর যার মহিষ সে বুক ফুলাইয়া বলে—বেশ হইয়াছে, একটা আগাছাও আর বাকি নাই!

আর-একটা সর্ব্বনাশ এই যে, পুলিস একবার যে-চারায় অল্পমাত্রও দাঁত বসাইয়াছে সে চারায় কোনোকালে ফুলও ফোটে না, ফলও ধরে না। উহার লালায় বিষ আছে। আমি একটি ছেলেকে নিজে জানি, তার যেমন বুদ্ধি, তেমনি বিদ্যা, তেমনি চরিত্র; পুলিসের হাত হইতে সে বিক্ষত হইয়া বাহির হইল বটে, কিন্তু আজ সে তরুণ বয়সে উন্মাদ হইয়া বহরমপুর পাগলা-গারদে জীবন কাটাইতেছে। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তার কাছে ব্রিটিশরাজের একচুলমাত্র আশঙ্কার কারণ ছিল না, অথচ তার কাছ থেকে আমাদের দেশ বিস্তর আশা

করিতে পারিত। পুলিসের মারের তো কথাই নাই, তার স্পর্শই সাংঘাতিক। কিছুকাল পূর্ব্বে শান্তিনিকেতনের ছেলেরা বীরভূমের জেলাস্কুলে পরীক্ষা দিতে গেলে পুলিসের লোক আর কিছুই না করিয়া কেবলমাত্র তাহাদের নাম টুকিয়া লইত। আর বেশি কিছু করিবার দরকার নাই; উহাদের নিঃশ্বাস লাগিলেই কাঁচা প্রাণের অঙ্কুর শুকাইতে সুরু করে। উহাদের খাতা যে গুপ্ত খাতা, উহাদের চাল যে গুপ্ত চাল। সাপে-খাওয়া ফল যেমন কেহ খায় না, আজকের দিনে তেমনি পুলিসে-ছোঁওয়া মানুষকে কেহ কোনো ব্যবহারে লাগায় না। এমন কি, যে মরিয়া-মানুষকে বৃদ্ধ রুগ্ন দরিদ্র কুশ্রী কুচরিত্র কেহই পিছু হঠাইতে পারে না, বাংলাদেশের সেই কন্যাদায়িক বাপও তার কাছে ঘটক পাঠাইতে ভয় করে। সে দোকান করিতে গেলে তার দোকান চলে না, সে ভিক্ষা চাহিলে তাহাকে দয়া করিতে পারি কিন্তু দান করিতে বিপদ গণি। দেশের কোনো হিতকর্ম্মে তাহাকে লাগাইলে সে কর্ম্ম নষ্ট হইবে।

যে-অধ্যক্ষের পরে এই বিভীষিকা-বিভাগের ভার তাঁরা তো রক্ত মাংসের মানুষ; তাঁরা তো রাগদ্বেষ বিবর্জ্জিত মহাপুরুষ নন। রাগ বা আতঙ্কের সময় আমরাও যেমন অল্প প্রমাণেই ছায়াকে বস্তু বলিয়া ঠাহর করি, তাঁরাও ঠিক তাই করেন। সকল মানুষকে সন্দেহ করাটাই যখন তাঁদের ব্যবসায় হয় তখন সকল মানুষকে অবিশ্বাস করাটাই তাঁদেব স্বভাব হইয়া ওঠে। সংশয়ের সামান্য আভাসমাত্রকেই চূড়ান্ত করিয়া নিরাপদকে পাকা করিতে তাঁদের স্বভাবতই প্রবৃত্তি হয়—কেননা, উপরে তাঁদের দায়িত্ব অল্প, চারিপাশের লোক ভয়ে নিস্তব্ধ, আর পিছনে ভারতের ইংরেজ হয় উদাসীন নয় উৎসাহদাতা। যেখানে স্বাভাবিক দরদ নাই অথচ ক্রোধ আছে এবং শক্তিও অব্যাহত, সেখানে কার্য্য-

প্রণালী যদি গুপ্ত এবং বিচারপ্রণালী যদি বিমুখ হয়, তবে সেই ক্ষেত্রেই যে ন্যায়ধর্ম্ম রক্ষিত হইতেছে একথা কি আমাদের ছোটো ইংরেজও সত্যই বিশ্বাস করেন? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, তিনি বিশ্বাস করেন না, কিন্তু তাঁর বিশ্বাস এই যে, কাজ উদ্ধার হইতেছে। কারণ দেখিয়াছি, জর্ম্মণিও এই বিশ্বাসের জোরে ইণ্টারন্যাশনাল আইনকে এবং দয়াধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধ জিতিবার নিয়মকে সহজ করিয়াছে। তার কারণ, দুর্ভাগ্যক্রমে জর্ম্মণিতে আজ বড়ো জর্ম্মাণের চেয়ে ছোটো জর্ম্মাণের প্রভাব বড়ো হইয়াছে, যে-জর্ম্মাণ কাজ করিবার যন্ত্র এবং যুদ্ধ করিবার কায়দামাত্র। আবার বলি, "শির লে আও" বলিতে পারিলে রাজকার্য্য উদ্ধার হইতে পারে যে-রাজকার্য্য উপস্থিতের কিন্তু রাজনীতির অধঃপতন ঘটে, যে-রাজনীতি চিরদিনের। এই রাজনীতির জন্য ইংলণ্ডের ইতিহাসে ইংরেজ লড়াই করিয়াছে, এই রাজনীতির ব্যভিচারেই জর্ম্মণির প্রতি মহৎ ঘৃণায় উদ্দীপ্ত ইংরেজ যুবক দলে দলে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে ছুটিয়াছে।

বিশ্বমানবের ইতিহাসকে অখণ্ড করিয়া দেখিবার অধ্যাত্ম দৃষ্টি যাহাতে শান্তিনিকেতন-আশ্রমের বালকদের পক্ষে দুর্ব্বল বা কলুষিত না হয় আমি এই লক্ষ্য দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছি। তাই এই আশ্রমের শুভকার্য্যে ইংরেজ সাধকেরও জীবন উপহার দাবী করিতে আমি কুণ্ঠিত হই নাই। পরম সত্যকে আমি কোনো বড়ো নামের দোহাই দিয়া খণ্ডিত করিতে চাই নাই, ইহাতে আমার ধর্ম্মনীতিকে নিজ্‌ঝের ইংরেজ ও এ-দেশী শিষ্যগণ দুর্ব্বলের ধর্ম্মনীতি ও মুমূর্ষুর সান্ত্বনা বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারেন। আমাদের অবস্থা অস্বাভাবিক; আমাদের বর্ত্তমান ক্ষেত্র ও ভবিষ্যতের আশা চারিদিকে সঙ্কীর্ণ; আমাদের অন্তর্নিহিত মানসিক শক্তি-বিকাশের উৎসাহ ক্ষীণ ও সুযোগ বাধাগ্রস্ত; বড়ো বড়ো উদ্ধত পদমান

ও দায়িত্বের নিম্নতলের আওতায় কৃশ খর্ব্ব হইয়া আমরা যে-ফল ফলাইয়া থাকি জগতের হাটে হাটে তার প্রয়োজন তুচ্ছ, তার দাম যৎকিঞ্চিৎ; অথচ সেই খর্ব্বতাটাই আমাদের চিরস্বভাব এই অপবাদ দিয়া সেই আওতাটাকে চিরনিবিড় করিয়া রাখা আমাদের মতো গুল্মের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া দেশে বিদেশে ঘোষণা চলিতেছে। এই অবস্থায় যে অবসাদ আনে তাহাতে দেশের লোকের মন অন্তরে অন্তরে গুরুভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। এই কারণেই, ভয় দ্বেষ বিবর্জ্জিত আধ্যাত্মিক মুক্তিসাধনের উপদেশ এদেশে আজকাল শ্রদ্ধা পায় না। তবু আমার বিশ্বাস, এই সকল বাধার সঙ্গে লড়াই করিয়াও আমাদের আশ্রমের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। কেননা বাধা দুরূহ হইলেও পরমার্থের সত্যটিকে মানুষের সামনে উপস্থিত করিলে সে তাকে একেবারে অশ্রদ্ধা করিতে পারে না—এমন কি, আমাদের দেশের অত্যন্ত আধুনিক ছেলের পক্ষেও তাহা কঠিন হয়। আমাদের এই স্বভাব-সম্বন্ধে পাঞ্জাবের লাটের সঙ্গেও আমার মতের মিল আছে। কিন্তু এক এক সময়ে এমন দুর্য্যোগ আসে যখন এই বাঙালির ছেলের মতো অত্যন্ত ভালোমানুষের কাছেও উচ্চতম সত্যের কথা অবজ্ঞাভাজন হইয়া উঠে। কেননা রিপুর সংঘাতে রিপু জাগে, তখন প্রমত্ততার উপরে কল্যাণকে স্বীকার করা দুঃসাধ্য হয়। আমাদের আশ্রমে দুটি ছোটো ছেলে আছে। তাদের অভিভাবকদের অবস্থা ভালোই ছিল। বরাবর তারা এখানে থাকিবার খরচ জোগাইয়াছে। কিছুকাল হইল তাদের পরিবারের তিনজন পুরুষের একসঙ্গে অন্তরায়ন হইয়াছে। এখন আশ্রম-বাসের খরচ জোগানো ছেলে দুটির পক্ষে অসম্ভব, আশ্রমে তাদের শিক্ষা ও আহারাদির ভার এখন আশ্রমকেই লইতে হইল। এই ছেলে দুটি কেবল যে নিজের গ্লানি বহিতেছে তা নয়, তাদের মায়ের যে দুঃখ কত তা তারা

জানে। যে ব্যথায়, অভাবে ও নিরানন্দে তাদের ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে তা তাদের অগোচর নাই। বাপকে ম্যালেরিয়ায় ধরিয়াছে, মা ব্যাকুল হইয়া চেষ্টা করিতেছেন যাতে তাঁকে স্বাস্থ্যকর জায়গায় বন্দী রাখা হয়, এই সমস্ত দুশ্চিন্তার দুঃখ এই শিশু দুটিকেই পীড়া দিতেছে। এ সম্বন্ধে ছেলে দুটির মুখে একটি শব্দ নাই, আমরাও কিছু বলি না—কিন্তু এই ছেলেরা যখন সামনে থাকে তখন ধৈর্য্যের কথা, প্রেমের কথা, নিত্য-ধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠার কথা, সর্ব্বমানবের ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের কথা বলিতে আমার কুণ্ঠা বোধ হয়, তখন সেই সকল লোকের বিদ্রূপহাস্য-কুটিল মুখ আমার মনে পড়ে যাঁরা পাঞ্জাবের লাটের মতোই সাত্ত্বিকতার অতিশৈত্যকে পরিহাস করেন। এম্নি করিয়া রিপুর সহিত রিপুর চক্‌মকি ঠোকায় আগুন জ্বলিতেছে; এম্নি করিয়া বাংলাদেশের প্রদেশে প্রদেশে দুঃখে আতঙ্কে মানুষ বাহিরের খেদকে অন্তরের নিত্য ভাণ্ডারে সঞ্চিত করিতেছে। শাসনকর্ত্তার অদৃশ্য মেঘের ভিতর হইতে হঠাৎ সংসারের মাঝখানে যে বোমাগুলো আসিয়া পড়িতেছে তাহাতে মরিতেছে বিস্তর অনাথা রমণী এবং অসহায় শিশু। ইহাদিগকে কি **non-combatants** বলিব না?

যদি জিজ্ঞাসা করো এই দুষ্ট সমস্যার মূল কোথায়, তবে বলিতে হইবে স্বাধীন শাসনের অভাবে। ইংরেজের কাছে আমরা বড়োই পর, এমন কি চীন-জাপানের সঙ্গেও তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি আন্তরিক সামীপ্য অনুভব করেন একথা তাঁদের কোনো কোনো বিদ্বান ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন। তারপরে আমাদের আধ্যাত্মিকতা আছে, শুনিতেছি তাঁদের সে বালাই নাই—এত বড়ো মূলগত প্রভেদ মানুষে মানুষে আর-কিছু হইতে পারে না। তারপরে তাঁরা আমাদের ভাষা জানেন না, আমাদের সঙ্গ রাখেন না। যেখানে এত দূরত্ব, এত কম জানা, সেখানে

সতর্ক সন্দিগ্ধতা একমাত্র পলিসি হইতে বাধ্য। সেখানে দেশের যে-সব লোক স্বার্থপর ও চতুর, যারা অবৈতনিক গুপ্তচর বৃত্তি করাই উন্নতির উপায় বলিয়া জানে, তাদের বিষাক্ত প্রভাব শাসনতন্ত্রের ছিদ্রে ছিদ্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে মিথ্যায় এবং মিথ্যার চেয়ে ভয়ঙ্কর অর্দ্ধসত্যে ভরিয়া রাখে। যারা স্বার্থের চেয়ে আত্মসম্মানকে বড়ো জানে, যারা নিজের উন্নতির চেয়ে দেশের মঙ্গলকে শ্রেয় বলিয়া জানে, তারা যতক্ষণ না পুলিসের গ্রাসে পড়ে ততক্ষণ এই শাসনব্যবস্থা হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকে। এই নিয়ত পা টিপিয়া চলা এবং চুপি চুপি বলা, এই দিনরাত আড়ে আড়ে চাওয়া এবং ঝোপে ঝাড়ে ঘোরা—আর কিছু নয়, এই যে অবিরত পুলিশের সঙ্গ করা—এই কলুষিত হাওয়ার মধ্যে যে শাসনকর্ত্তা বাস করেন তাঁর মনের সন্দেহ কাজে নিদারুণ হইয়া উঠিতে কোনো স্বাভাবিক বাধা পায় না। কেননা, তাঁদের কাছে আমরা একটা অবচ্ছিন্ন সত্তা, আমরা কেবলমাত্র শাসিত সম্প্রদায়। সেইজন্য, আমাদের ঘরে যখন মা কাঁদিতেছে, স্ত্রী আত্মহত্যা করিতেছে, শিশুদের শিক্ষা বন্ধ; যখন ভাগ্যহীন দেশের বহু দুঃখের সৎচেষ্টাগুলি, সি, আই, ডির বাঁকা ইসারা-মাত্রে চারিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে; তখন অপরপক্ষের কোনো মানুষের ডিনরের ক্ষুধা বা নিশীথ নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে না এবং ব্রিজ-খেলাতেও উৎসাহ অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহা দোষারোপ করিয়া বলিতেছি না, ইহা স্বাভাবিক। এই সব মানুষই যেখানে ষোলো আনা মানুষ, সেখানে আপিসের শুক্‌নো পার্চমেণ্টের নিচে হইতে তাদের হৃদয়টা সম্ভবত বাহির হইয়া থাকে। ব্যুরোক্রেসি বলিতে সর্ব্বত্রই সেই কর্ত্তাদের বোঝায় যারা বিধাতার সৃষ্ট মনুষ্যলোক লইয়া কারবার করে না, যারা নিজের বিধান-রচিত একটা কৃত্রিম জগতে প্রভুত্বজাল বিস্তার করে। স্বাধীনদেশে এই ব্যুরোক্রেসি সর্ব্বপ্রধান নয়, এইজন্য মানুষ ইহাদের ফাঁকের মধ্য দিয়া

বাড়িয়া উঠিতে পারে। অধীন দেশে এই ব্যুরোক্রেসি কোথাও একটুও ফাঁক রাখিতে চায় না। আমরা যখন খোলা আকাশে মাথা তুলিবার জন্য ফাঁকের দরবার করি, তখন ইঁহাদের ছোটোবড়ো শাখাপ্রশাখা সমুদ্রের এপারে-ওপারে এমনি প্রচণ্ড বেগে আন্দোলিত হইতে থাকে যে তখন আমরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া ভাবি,—ফাঁকে কাজ নাই, এখন ঐ ডালের ঝাপটা খাইয়া ভাঙিয়া না পড়িতে হয়! তবু শেষ কথাটা বলিয়া রাখি; —কোনো অস্বাভাবিকতাকে কেবলমাত্র গায়ের জোরে অত্যন্ত বলবান জাতিও শেষ পর্য্যন্ত সঙিনের আগায় সীধা রাখিতে পারে না। ভার বাড়িয়া ওঠে, হাত ক্লান্ত হয় এবং বিশ্বপৃথিবীর বিপুল ভারাকর্ষণ স্বভাবের অসামঞ্জস্যকে ধূলিসাৎ করিয়া দেয়।

স্বাভাবিকতাটা কী? না,শাসনপ্রণালী যেমনি হোক্ আর যারই হোক্ দেশের লোকের সঙ্গে দেশের শাসনতন্ত্রের দায়িত্বের যোগ থাকা, দেশের শাসনতন্ত্রের প্রতি দেশের লোকের মমত্ব থাকা। সেই শাসন নিরবচ্ছিন্ন বাহিরের জিনিস হইলে তার প্রতি প্রজার ঔদাসীন্য বিতৃষ্ণায় পরিণত হইবেই হইবে। আবার সেই বিতৃষ্ণাকে যাঁরা বাহিরের দিক হইতেই দমন করিতে থাকেন তাঁরা বিতৃষ্ণাকে বিদ্বেষে পাকাইয়া তোলেন। এমনি করিয়া সমস্যা কেবলি জটিলতর হইতে থাকে।

বর্ত্তমান যুগসত্যের দূত হইয়া ইংরেজ এদেশে আসিয়াছেন। যে-কালের যাহা সবচেয়ে বড়ো বিশ্বসম্পদ তাহা নানা আকারে নানা উপায়ে দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িবেই। যাঁরা সেই সম্পদের বাহন, তাঁরা যদি লোভের বশ হইয়া কৃপণতা করেন, তবে তাঁরা ধর্ম্মের অভিপ্রায়কে অনর্থক বাধা দিয়া দুঃখ সৃষ্টি করিবেন, কিন্তু তাঁরা যে আগুন বহন করিতেছেন তাকে চাপা দিয়া রাখিতে পারিবেন না। যাহা দিবার তাহা তাঁহাদিগকে দিতেই হইবে, কেননা এ দানে তাঁহারা উপলক্ষ্য, এ দান এখনকার যুগের

দান। কিন্তু অস্বাভাবিকতা হইতেছে এই যে, তাঁদের ঐতিহাসিক শুক্লপক্ষের দিকে তাঁরা যে সত্যকে বিকীর্ণ করিতেছেন, তাঁদের ঐতিহাসিক কৃষ্ণপক্ষের দিকে তাঁরাই সেই সত্যকে শাসনের অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিতেছেন। কিন্তু নিজের প্রকৃতির এক অংশকে তাঁরা আরেক অংশ দিয়া কিছুতেই প্রবঞ্চিত করিতে পারিবেন না। বড়ো ইংরেজকে ছোটো ইংরেজ চিরদিন স্বার্থের বাঁধ দিয়া ঠেকাইবার চেষ্টা করিলে দুঃখ দুর্গতি বাড়াইতে থাকিবেন। ঐতিহাসিক খেলায় হাতের কাগজ দেখাইয়া খেলা হয় না। তার পরিণাম সমস্ত হিসাবের বিরুদ্ধে হঠাৎ দেখা দিয়া চমক লাগায়। এইজন্য মোটের উপর এই তত্ত্বটা বলা যায় যে, কোনো অস্বাভাবিকতাকে দীর্ঘকাল প্রশ্রয় দিতে দিতে যখন মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, আমার তৈরি নিয়মই নিয়ম, তখনই ইতিহাস হঠাৎ একটা সামান্য ঠোকর খাইয়া উল্টাইয়া পড়ে। শত বৎসর ধরিয়া মানুষ মানুষের কাছে আছে অথচ তার সঙ্গে মানব-সম্বন্ধ নাই; তাকে শাসন করিতেছে অথচ তাকে কোনোমতেই আত্মীয় করিতেছে না; পূর্ব্ব ধরণীর প্রাচীর ভাঙিয়া পশ্চিম একেবারে তার গোলাবাড়ির ভিতরে আসিয়া পড়িল অথচ এ মন্ত্র ছাড়িল না যে, “never the twain shall meet”; এত বড়ো অস্বাভাবিকতার দুঃখকর বোঝা বিশ্বে কখনই অটল হইয়া থাকিতে পারে না। যদি ইহার কোনো স্বাভাবিক প্রতিকার না থাকে তবে একটা ঐতিহাসিক ট্র্যাজিডির পঞ্চমাঙ্কে ইহার যবনিকা পতন হইবে। ভারতবর্ষে আমাদের দুর্গতির যে মর্ম্মান্তিক ট্র্যাজেডি, তারও তো পালা অনেক যুগ ধরিয়া এমনি করিয়া রচিত হইয়াছিল। আমরাও মানুষকে কাছাকাছি রাখিয়াও দূরে ঠেকাইবার বিস্তারিত আয়োজন করিয়াছি; যে অধিকারকে সকলের চেয়ে মূল্যবান বলিয়া নিজে গ্রহণ করিলাম, অন্যকে কেবলি তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া

রাখিয়াছি; আমরাও "স্বধর্ম্ম" বলিয়া একটা বড়ো নাম দিয়া মানুষের অবমাননা করিয়া নিত্যধর্ম্মকে পীড়িত করিয়াছি। শাস্ত্রবিধির অতি কঠিন বাঁধন দিয়াও এই অস্বাভাবিকতাকে, এই অপবিত্র দেবদ্রোহকে আমরা নিজের ইতিহাসের অনুকূল করিয়া তুলিতে পারি নাই। মনে করিয়াছিলাম, আমাদের বল এইখানেই, কিন্তু এইখানেই আমাদের সকলের চেয়ে দুর্ব্বলতা। এইখানেই শতাব্দীর পর শতাব্দী আমরা প্রতি পদে কেবল আপনাকে মারিতে মারিতে মরিয়াছি।

বর্ত্তমানের চেহারা যেমনি হোক্, তবু এই আশা এই বিশ্বাস মনে দৃঢ় করিয়াছি যে, পশ্চিম পূর্ব্বের সহিত মিলিবে। কিন্তু এইখানে আমাদেরও কর্ত্তব্য আছে। আমরা যদি ছোটো হইয়া ভয় পাই তবে ইংরেজও ছোটো হইয়া ভয় দেখাইবে। ছোটো ইংরেজের সমস্ত জোর আমাদের ছোটো শক্তির উপরে। পৃথিবীর সেই ভাবী যুগ আসিয়াছে, অস্ত্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্রকে দাঁড়াইতে হইবে। সেদিন, যে মারিতে পারিবে তার জিত হইবে না, যে মরিতে পারিবে তারই জয় হইবে। সেদিন দুঃখ দেয় যে-মানুষ তার পরাভব হইবে, দুঃখ পায় যে-মানুষ তারই শেষ গৌরব। সেদিন মাংসপেশীর সহিত আত্মার শক্তির সংগ্রাম হইয়া মানুষ জানাইয়া দিবে যে সে পশু নয়, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়ম সে অতিক্রম করিয়াছে। এই মহত্ত্ব প্রমাণ করিবার ভার আমাদের উপর আছে। পূর্ব্ব পশ্চিমের যদি মিলন ঘটে তবে একটা মহৎ আইডিয়ালের উপর হইবে। তাহা নিছক অনুগ্রহের উপরে হইবে না। এবং কামান, বন্দুক এবং রণতরীর উপরও হইবে না। দুঃখকে আমাদের সহায় করিতে হইবে, মৃত্যুকে আমাদের সহায় করিতে হইবে, তবে মৃত্যুঞ্জয় আমাদের সহায় হইবেন। আমরা যদি শক্তি না পাই তবে অশক্তের সহিত শক্তের মিলন সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না। এক

তর্‌ফা আধিপত্যের যোগ যোগই নহে। আমাদিগকে নিজের শক্তিতেই পরের শক্তির সঙ্গে সন্ধি করিতে হইবে। সেই শক্তি ধার-করা শক্তি, ভিক্ষা-করা শক্তি না হউক! তাহা সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য দুঃখ সহিবার অপরিসীম শক্তি হউক। জগতে কাহারও সাধ্য নাই, দুঃখের শক্তিকে ত্যাগের শক্তিকে ধর্ম্মের শক্তিকে বলির পশুর মতো শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারে। তাহা হারিয়া জেতে, তাহা মরিয়া অমর হয়, এবং মাংসপেশী আপন জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে গিয়া হঠাৎ দেখিতে পায় সে পক্ষাঘাতে অচল হইয়াছে।

১৩২৪

বাতায়নিকের পত্র

১

একদিকে আমাদের বিশ্বজগৎ, আরেকদিকে আমাদের কর্ম্ম-সংসার। সংসারটাকে নিয়ে আমাদের যত ভাবনা, জগৎটাকে নিয়ে আমাদের কোনো দায় নেই। এই জন্যে জগতের সঙ্গে আমাদের অহেতুক আত্মীয়তার সম্বন্ধটাকে যতটা পারি আড়াল ক'রে রাখতে হয়, নইলে সংসারের ভাগে মনোযোগের কম্‌তি প'ড়ে কাজের ক্ষতি হয়। তাই আমাদের আপিস থেকে বিশ্বকে বারোমাস ঠেকিয়ে রাখতে রাখতে এম্‌নি হয় যে দরকার পড়লেও আর তার উদ্দেশ পাওয়া যায় না।

দরকার পড়েও। কেননা বিশ্বটা সত্য। সত্যের সঙ্গে কাজের সম্বন্ধ নাও যদি থাকে তবু অন্য সম্বন্ধ আছেই। সেই সম্বন্ধকে অন্যমনস্ক হয়ে অস্বীকার করলেও তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অবশেষে কর্ম্মে ক্লান্তি আসে, দিনের আলো ম্লান হয়, সংসারের বদ্ধ আয়তনের মধ্যে গুমট অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে। তখন মন তার হিসাবের পাকা খাতা বন্ধ ক'রে ব'লে ওঠে, বিশ্বকে আমার চাই, নইলে আর বাঁচিনে।

কিন্তু নিকটের সব দরজাগুলোর তালায় মর্‌চে প'ড়ে গেছে, চাবি আর খোলে না। রেলভাড়া ক'রে দূরে যেতে হয়। আপিসের ছাদটার উপরেই এবং তার আশেপাশেই যে-আকাশ নীল, যে-ধরণী শ্যামল, যে-জলের ধারা মুখরিত, তাকেই দেখবার জন্যে ছুটে যেতে হয় এটোয়া কাটোয়া ছোটোনাগপুরে।

এত কথা হঠাৎ আমার মনে উদয় হোলো কেন বলি। তোমরা

সবাই জানো, পুরাকালে এক সময়ে আমি সম্পূর্ণ বেকার ছিলুম। অর্থাৎ আমার প্রধান সম্বন্ধ ছিল বিশ্বজগতের সঙ্গে। তারপরে কিছুকাল থেকে সেই আমার প্রথম বয়সের সমস্ত অকৃতকর্ম্মের বকেয়া শোধে লেগে গিয়েছিলুম। অর্থাৎ এখনকার প্রধান সম্বন্ধ হোলো সংসারের সঙ্গে। অথচ তখনকার সঙ্গে এখনকার দিনের যে এত বড়ো একটা বিচ্ছেদ ঘটেছে, কাজ করতে করতে তা ভুলে গিয়েছিলুম। এই ভোলবার ক্ষমতাই হচ্চে মনের বিশেষ ক্ষমতা। সে দু-নৌকোয় পা দেয় না; সে যখন একটা নৌকোয় থাকে তখন অন্য নৌকোটাকে পিছনে বেঁধে রাখে।

এমন সময় আমার শরীর অসুস্থ হোলো। সংসারের কাছ থেকে কিছুদিনের মতো ছুটি মিলল। দোতলা ঘরের পূবদিকের প্রান্তে খোলা জানলার ধারে একটা লম্বা কেদারায় ঠেস দিয়ে বসা গেল। দুটো দিন না যেতেই দেখা গেল অনেক দূরে এসে পড়েছি—রেল গাড়ী দিয়েও এতদূরে আসা যায় না।

যখন আমেরিকায় যাই, জাপানে যাই, ভ্রমণের কথায় ভ'রে ভ'রে তোমাদের চিঠি লিখে পাঠাই। পথখরচাটার সমান ওজনের গৌরব তাদের দিতে হয়। কিন্তু এই যে আমার নিখরচার যাত্রা কাজের পার থেকে অকাজের পারে, তারও ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখা চলে,—মাঝে মাঝে লিখব। মুস্কিল এই যে, কাজের মধ্যে মধ্যে অবকাশ মেলে কিন্তু পুরো অবকাশের মধ্যে অবকাশ বড়ো দুর্লভ। আরো একটা কথা এই যে, আমার এই নিখরচার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বিনা-কড়ি দামের উপযুক্ত নেহাৎ হাল্কা হওয়া উচিত—লেখনীর পক্ষে সেই হাল্কা চাল ইচ্ছা করলেই হয় না, কারণ লেখনী স্বভাবতই গজেন্দ্রগামিনী।

জগৎটাকে কেজো অভ্যাসের বেড়ার পারে ঠেলে রেখে অবশেষে

ক্রমে আমার ধারণা হয়েছিল আমি খুব কাজের লোক। এই ধারণাটা জন্মালেই মনে হয় আমি অত্যন্ত দরকারী; আমাকে না হোলে চলে না। মানুষকে বিনা মাইনেয় খাটিয়ে নেবার জন্যে প্রকৃতির হাতে যে-সমস্ত উপায় আছে এই অহঙ্কারটা সকলের সেরা। টাকা নিয়ে যারা কাজ করে তারা সেই টাকার পরিমাণেই কাজ করে, সেটা একটা বাঁধা পরিমাণ; কাজেই তাদের ছুটি মেলে,—বরাদ্দ ছুটির বেশি কাজ করাকে তারা লোকসান ব'লে গণ্য করে। কিন্তু অহঙ্কারের তাগিদে যারা কাজ করে তাদের আর ছুটি নেই; লোকসানকেও তারা লোকসান জ্ঞান করে না।

আমাকে নইলে চলে না, এই কথা মনে ক'রে এতদিন ভারি ব্যস্ত হয়ে কাজ করা গেছে, চোখের পলক ফেল্‌তে সাহস হয়নি। ডাক্তার বলেছে, "এইখানেই বাস্‌ করো, একটু থামো!" আমি বলেছি, "আমি থামলে চলে কই?" ঠিক এমন সময়ে চাকা ভেঙে আমার রথ এই জানলাটার সামনে এসে থামল। এখানে দাঁড়িয়ে অনেকদিন ঐ মহাকাশের দিকে তাকালুম। সেখানে দেখি মহাকালের রথযাত্রায় লক্ষ লক্ষ অগ্নিচক্র ঘুরতে ঘুরতে চলেছে; না উড়ছে ধুলো, না উঠছে শব্দ, না পথের গায়ে একটুও চিহ্ন পড়ছে। ঐ রথের চলার সঙ্গে বাঁধা হয়ে বিশ্বের সমস্ত চলা অহরহ চলেছে। এক মুহূর্তে আমার যেন চটক ভেঙে গেল। মনে হোলো স্পষ্ট দেখতে পেলুম, আমাকে না হোলেও চলে। কালের ঐ নিঃশব্দ রথচক্র কারো অভাবে, কারো শৈথিল্যে, কোথাও এক তিল বা একপল বেধে যাবে এমন লক্ষণ তো দেখিনে। 'আমি-নইলে-চলে-না'র দেশ থেকে 'আমি-নইলে-চলে'র দেশে ধাঁ করে এসে পৌঁচেছি কেবলমাত্র ঐ ডেস্কের থেকে এই জানলার ধারটুকুতে এসে।

কিন্তু কথাটাকে এত সহজে মেনে নিতে পারব না। মুখে যদি বা মানি, মন মানে না। আমি থাক্‌লেও যা আমি গেলেও তা এইটেই যদি সত্য হবে তবে আমার অহঙ্কার এক মুহূর্ত্তের জন্যেও বিশ্বে কোথাও স্থান পেলে কী ক'রে? তার টিঁকে থাকবার জোর কিসের উপরে? দেশকাল জুড়ে আয়োজনের তো অন্ত নেই, তবু এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আমাকে কেউ বরখাস্ত করতে পারলে না। আমাকে না হোলে চলে না তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, আমি আছি।

আমি যে আছি সেই থাকার মূল্যই হচ্চে অহঙ্কার। এই মূল্য যতক্ষণ নিজের মধ্যে পাচ্চি ততক্ষণ নিজেকে টিঁকিয়ে রাখবার সমস্ত দায় সমস্ত দুঃখ অনবরত বহন করে চলেছি। সেইজন্য বৌদ্ধরা বলেছে, এই অহঙ্কারটাকে বিসর্জ্জন করলেই টিঁকে থাকার মূল মেরে দেওয়া হয়, কেননা তখন আর টিঁকে থাকার মজুরি পোষায় না।

যাই হোক্ এই মূল্য তো কোনো একটা ভাণ্ডার থেকে জোগানো হয়েছে। অর্থাৎ আমি থাকি এরই গরজ কোনো এক জায়গায় আছে; সেই গরজ অনুসারেই আমাকে মূল্য দেওয়া হয়েছে। আমি থাকি এই ইচ্ছার আনুচর্য্য সমস্ত বিশ্ব করছে, বিশ্বের সমস্ত অণুপরমাণু। সেই পরম ইচ্ছার গৌরবই আমার অহঙ্কারে বিকশিত। সেই ইচ্ছার গৌরবেই এই অতি ক্ষুদ্র আমি বিশ্বের কিছুর চেয়েই পরিমাণ ও মূল্যে কম নই।

এই ইচ্ছাকে মানুষ দুই রকম ভাবে দেখেছে। কেউ বলেছে এ হচ্চে শক্তিময়ের খেয়াল, কেউ বলেছে এ হচ্চে আনন্দময়ের আনন্দ। আর যারা বলেছে, এ হচ্চে মায়া, অর্থাৎ যা নেই তারই থাকা, তাদের কথা ছেড়ে দিলুম।

আমার থাকাটা শক্তির প্রকাশ, না, প্রীতির প্রকাশ, এইটে যে-যেমন মনে করে সে সেইভাবে জীবনের লক্ষ্যকে স্থির করে। শক্তিতে

আমাদের যে-মূল্য দেয় তার এক চেহারা, আর প্রীতিতে আমাদের যে-মূল্য দেয় তার চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। শক্তির জগতে আমার অহঙ্কারের যে-দিকে গতি, প্রীতির জগতে আমার অহঙ্কারের গতি ঠিক তার উল্টো দিকে।

শক্তিকে মাপা যায়; তার সংখ্যা, তার ওজন, তার বেগ সমস্তেরই আয়তন গণিতের অঙ্কের মধ্যে ধরা পড়ে। তাই যারা শক্তিকেই চরম ব'লে জানে তারা আয়তনে বড়ো হোতে চায়। টাকার সংখ্যা, লোকের সংখ্যা, উপকরণের সংখ্যা, সমস্তকেই তারা কেবল বহুগুণিত করতে থাকে।

এইজন্যেই সিদ্ধিলাভের কামনায় এরা অন্যের অর্থ, অন্যের প্রাণ, অন্যের অধিকারকে বলি দেয়। শক্তি-পূজার প্রধান অঙ্গ বলিদান। সেই বলির রক্তে পৃথিবী ভেসে যাচ্চে।

বস্তুতন্ত্রের প্রধান লক্ষণই হচ্চে তার বাহ্যপ্রকাশের পরিমাপ্যতা—অর্থাৎ তার সসীমতা। মানুষের ইতিহাসে যত কিছু দেওয়ানি এবং ফৌজদারি মাম্‌লা তার অধিকাংশই এই সীমানার চৌহদ্দি নিয়ে। পরিমাণের দিকে নিজের সীমানা অত্যন্ত বাড়াতে গেলেই পরিমাণের দিকে অন্যের সীমানা কাড়্‌তে হয়। অতএব শক্তির অহঙ্কার যে-হেতু আয়তন বিস্তারেরই অহঙ্কার, সেইজন্যে এইদিকে দাঁড়িয়ে খুব লম্বা দুরবীন কষলেও লড়াইয়ের রক্তসমুদ্র পেরিয়ে শান্তির কূল কোথাও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

কিন্তু এই যে বস্তুতান্ত্রিক বিশ্ব, এই যে শক্তির ক্ষেত্র, এর আয়তনের অঙ্কগুলো যোগ দিতে দিতে হঠাৎ এক জায়গায় দেখি তেরিজটা একটানা বেড়ে চল্‌বার দিকেই ছুটছে না। বেড়ে চল্‌বার তত্ত্বের মধ্যে হঠাৎ উচোট খেয়ে দেখা যায় সুষমার তত্ত্ব পথ আগ্‌লে। দেখি কেবলি গতি নয়,

যতিও আছে। ছন্দের এই অমোঘ নিয়মকে শক্তি যখন অন্ধ অহঙ্কারে অতিক্রম করতে যায় তখনি তার আত্মঘাত ঘটে। মানুষের ইতিহাসে এইরকম বার বার দেখা যাচ্ছে। সেইজন্যে মানুষ বলেছে অতি দর্পে হতা লঙ্কা। সেইজন্যে ব্যাবিলনের অত্যুদ্ধত সৌধচূড়ার পতনবার্তা এখনো মানুষ স্মরণ করে।

তবেই দেখ্‌ছি, শক্তিতত্ত্ব, যার বাহ্যপ্রকাশ আয়তনে, সেটাই চরমতত্ত্ব এবং পরমতত্ত্ব নয়। বিশ্বের তাল-মেলাবার বেলায় আপনাকে তার থামিয়ে দিতে হয়। সেই সংযমের সিংহদ্বারই হচ্চে কল্যাণের সিংহদ্বার। এই কল্যাণের মূল্য আয়তন নিয়ে নয়, বহুলতা নিয়ে নয়। যে এঁকে অন্তরে জেনেছে, সে ছিন্ন কন্থায় লজ্জা পায় না, সে রাজমুকুট ধূলোয় লুটিয়ে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়্‌তে পারে।

শক্তিতত্ত্ব থেকে সুষমাতত্ত্বে এসে পৌঁছিয়েই বুঝ্‌তে পারি, ভুল জায়গায় এতদিন এত নৈবেদ্য জুগিয়েছি। বলির পশুর রক্তে যে-শক্তি ফুলে উঠল সে কেবল ফেটে মর্‌বার জন্যেই। তার পিছনে যতই সৈন্য যতই কামান লাগাই না কেন, রণতরীর পরিধি যতই বৃদ্ধির দিকে নিয়ে চলি, লুঠের ভাগকে যতই বিপুল করে তুল্‌তে থাকি, অঙ্কের জোরে মিথ্যাকে সত্য করা যাবে না, শেষকালে ঐ অতি বড়ো অঙ্কেরই চাপে নিজের বস্তার নিচে নিজে গুঁড়িয়ে মর্‌তে হবে।

যাজ্ঞবল্ক্য যখন জিনিষপত্র বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিয়ে এই অঙ্ক-কষার রাজ্যে মৈত্রেয়ীকে প্রতিষ্ঠিত করে বিদায় নিচ্ছিলেন, তখনই মৈত্রেয়ী বলেছিলেন, "যেনাহং নামৃতাস্যাম্‌ কিমহং তেন কুর্য্যাম্‌!" বহু, বহু, বহু, সব বহুকে জুড়ে জুড়েও, অঙ্কের পর অঙ্ক, যোগ করে করেও তবু তো অমৃতে গিয়ে পৌঁছনো যায় না। শব্দকে কেবলি অত্যন্ত বাড়িয়ে দিয়ে এবং চড়িয়ে দিয়ে যে-জিনিষটা পাওয়া যায় সেটা হোলো হুঙ্কার, আর শব্দকে সুর

দিয়ে লয় দিয়ে সংযত সম্পূর্ণতা দান করলে যে-জিনিষটা পাওয়া যায় সেইটেই হোলো সঙ্গীত ; ঐ হুঙ্কারটা হোলো শক্তি, এর পরিমাণ পাওয়া যায়, আর সঙ্গীতটা হোলো অমৃত, হাতে বহরে ওকে কোথাও মাপ্‌বার জো নেই।

এই অমৃতের ক্ষেত্রে মানুষের অহঙ্কারের স্রোত নিজের উল্টো দিকে, উৎসর্জ্জনের দিকে। মানুষ আপনার দিকে কেবলি সমস্তকে টান্‌তে টানতে প্রকাণ্ডতা লাভ করে, কিন্তু আপনাকে সমস্তর দিকে উৎসর্গ কর্‌তে কর্‌তে সে সামঞ্জস্য লাভ করে। এই সামঞ্জস্যেই শান্তি। কোনো বাহ্যব্যবস্থাকে বিস্তীর্ণতর করার দ্বারা, শক্তিমানের সঙ্গে শক্তিমানকে জোড়া দিয়ে পুঞ্জীভূত করার দ্বারা, কখনই সেই শান্তি পাওয়া যাবে না যে-শান্তি সত্যে প্রতিষ্ঠিত, যে-শান্তি অলোতে, যে-শান্তি সংযমে,যে-শান্তি ক্ষমায়।

প্রশ্ন তুলেছিলুম,—আমার সত্তার পরমমূল্যটি কোন্‌ সত্যের মধ্যে? শক্তিমন্ত্রের শক্তিতে, না, আনন্দময়ের আনন্দে?

শক্তিকেই যদি সেই সত্য ব'লে বরণ করি তা হোলে বিরোধকেও চরম ও চিরন্তন ব'লে মান্‌তেই হবে। য়ুরোপের অনেক আধুনিক লেখক সেই কথাই স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক প্রচার কর্‌ছেন। তাঁরা বল্‌ছেন, শান্তির ধর্ম্ম, প্রেমের ধর্ম্ম, দুর্ব্বলের আত্মরক্ষা কর্‌বার কৃত্রিম দুর্গ ;—বিশ্বের বিধান এই দুর্গকে খাতির করে না ; শেষ পর্য্যন্ত শক্তিরই জয় হয়—অতএব ভীরু ধর্ম্মভাবুকের দল যাকে অধর্ম্ম ব'লে নিন্দা করে, সেই অধর্ম্মই কৃতার্থতার দিকে মানুষকে নিয়ে যায়।

অন্যদল সে কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে না ; সমস্ত মেনে নিয়েই তারা বলে :—

অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি,
ততঃ সপত্নান্‌ জয়তি—সমূলস্তু বিনশ্যতি।

ঐশ্বর্য্যগর্ব্বেও মানুষের মন বাহিরের দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, আবার দারিদ্র্যের দুঃখে ও অপমানেও মানুষের সমস্ত লোলুপ প্রবৃত্তি বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই দুই অবস্থাতেই মানুষ সকল দেবতার উপরে সেই শক্তিকে আসন দিতে লজ্জিত হয় না যে-ক্রুর শক্তির দক্ষিণহস্তে অন্যায়ের এবং বামহস্তে ছলনার অস্ত্র। প্রতাপস্মরামত্ত য়ুরোপের পলিটিক্স এই শক্তিপূজা। এই জন্য সেখানকার ডিপ্লোমেসি কেবলি প্রকাশ্যতাকে এড়িয়ে চল্‌তে চায়; অর্থাৎ সেখানে শক্তি যে-মূর্ত্তি ধারণ করেছে সে সম্পূর্ণ উলঙ্গমূর্ত্তি নয়; কিন্তু তার লেলিহান রসনার উলঙ্গতা কোথাও ঢাকা নেই। ঐ দেখো পীস্‌-কন্‌ফারেন্সের সভাক্ষেত্রে তা লক্‌ লক্‌ করছে।

অপর পক্ষে একদা আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় উচ্ছৃঙ্খলতার সময় ভীত পীড়িত প্রজা আপন কবিদের মুখ দিয়ে শক্তিরই স্তবগান করিয়েছে। কবিকঙ্কণচণ্ডী, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসান, প্রকৃতপক্ষে অধর্ম্মেরই জয়গান। সেই কাব্যে অন্যায়কারিণী ছলনাময়ী নিষ্ঠুর শক্তির হাতে শিব পরাভূত। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার এই যে এই পরাভব-গানকেই মঙ্গলগান নাম দেওয়া হোলো।

আজকের দিনেও দেখি আমাদের দেশে সেই হাওয়া উঠেছে। আমরা ধর্ম্মের নাম ক'রেই একদল লোক বল্‌ছি, ধর্ম্মভীরুতাও ভীরুতা; বল্‌ছি যারা বীর, অন্যায় তাদের পক্ষে অন্যায় নয়। তাই দেখি সাংসারিকতায় যারা কৃতার্থ এবং সাংসারিকতায় যারা অকৃতার্থ, দুইয়েরই সুর এক জায়গায় এসে মেলে। ধর্ম্মকে উভয়েই বাধা ব'লে জানে—সেই বাধা গায়ের জোরে অতিক্রম করতে চায়। কিন্তু গায়ের জোরই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়ো জোর নয়।

এই বড়ো দুঃসময়ে কামনা করি শক্তির বীভৎসতাকে কিছুতে আমরা

ভয়ও করব না, ভক্তিও করব না—তাকে উপেক্ষা করব, অবজ্ঞা করব। সেই মনুষ্যত্বের অভিমান আমাদের হোক্, যে-অভিমানে মানুষ এই স্থূল বস্তুজগতের প্রবল প্রকাণ্ডতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে বলতে পারে, আমার সম্পদ এখানে নয়; বলতে পারে শৃঙ্খলে আমি বন্দী হই নে, আঘাতে আমি আহত হই নে, মৃত্যুতে আমি মরি নে; বল্‌তে পারে যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্। আমাদের পিতামহেরা বলে গেছেন, এতদমৃতমভয়ং শান্ত উপাসীত—যিনি অমৃত, যিনি অভয় তাঁকে উপাসনা ক'রে শান্ত হও। তাঁদের উপদেশকে আমরা মাথায় লই, এবং মৃত্যু ও সকল ভয়ের অতীত যে-শান্তি সেই শান্তিতে প্রতিষ্ঠালাভ করি।

(২)

কারো উঠোন চ'ষে দেওয়া আমাদের ভাষায় চূড়ান্ত শাস্তি ব'লে গণ্য। কেননা উঠোনে মানুষ সেই বৃহৎ সম্পদকে আপন করেছে, যেটাকে বলে—ফাঁক। বাহিরে এই ফাঁক দুর্লভ নয়, কিন্তু সেই বাহিরের জিনিষকে ভিতরের ক'রে আপনার ক'রে না তুললে তাকে পেয়েও না পাওয়া হয়। উঠোনে ফাঁকটাকে মানুষ নিজের ঘরের জিনিষ ক'রে তোলে; ঐখানে সূর্য্যের আলো তার ঘরের আপনার আলো হয়ে দেখা দেয়, ঐখানে তার ঘরের ছেলে আকাশের চাঁদকে হাততালি দিয়ে ডাকে। কাজেই উঠোনকেও যদি বেকার না রেখে তাকে ফসলের ক্ষেত বানিয়ে তোলা যায়, তা হোলে যে-বিশ্ব মানুষের আপন ঘরের বিশ্ব, তারই বাসা ভেঙে দেওয়া হয়।

সত্যকার ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে প্রভেদ এই যে, ধনী এই ফাঁকটাকে বড়ো ক'রে রাখতে পারে। যে-সমস্ত জিনিষপত্র দিয়ে ধনী আপনার

ঘর বোঝাই করে তার দাম খুব বেশি—কিন্তু যে-ফাঁকটা দিয়ে তার আঙিনা হয় প্রশস্ত, তাব বাগান হয় বিস্তীর্ণ সেইটেই হচ্চে সব চেয়ে দামী। সদাগরের দোকান-ঘর জিনিষপত্রে ঠাসা; সেখানে ফাঁক রাখবার শক্তি তার নেই। দোকানে সদাগর কৃপণ, সেখানে লক্ষপতি হয়েও সে দরিদ্র। কিন্তু সেই সদাগবের বাসের বাড়িতে ঘরগুলো লম্বায় চওড়ায় উঁচুতে সকল দিকেই প্রয়োজনকে ধিক্কার ক'রে ফাঁক-টাকেই বেশি আদর দিয়েচে, আর বাগানের তো কথাই নেই। এইখানেই সদাগর ধনী।

শুধু কেবল জায়গার ফাঁকা নয়, সময়ের ফাঁকাও বহুমূল্য। ধনী তার অনেক টাকা দিয়ে এই অবকাশ কিন্‌তে পায়। তার ঐশ্বর্য্যের প্রধান লক্ষণ এই যে লম্বা লম্বা সময় সে ফেলে রাখতে পারে। হঠাৎ কেউ তার সময়ের উঠোন চষ্‌তে পারে না।

আরেকটা ফাঁকা, যেটা সব চেয়ে দামী, সে হচ্চে মনের ফাঁকা। যা কিছু নিয়ে মন চিন্তা করতে বাধ্য হয়, কিছুতেই ছাড় পায় না, তাকেই বলে দুশ্চিন্তা। গরীবের চিন্তা, হতভাগার চিন্তা মনকে একেবারে আঁক্‌ড়ে থাকে, অশথ গাছের শিকড়গুলো ভাঙা মন্দিরকে যে রকম আঁকড়ে ধরে। দুঃখ জিনিষটা আমাদের চৈতন্যের ফাঁক বুজিয়ে দেয়। শরীরের সুস্থ অবস্থা তাকেই বলে যেটা হচ্চে শারীর-চৈতন্যের ফাঁকা ময়দান। কিন্তু হোক্ দেখি বাঁ-পায়ের ক'ড়ে আঙুলের গাঁটের প্রান্তে বাতের বেদনা, অমনি শারীর-চৈতন্যের ফাঁক বুজে যায়, সমস্ত চৈতন্য ব্যথায় ভ'রে ওঠে। মন যে ফাঁকা চায়, দুঃখে সেই ফাঁকা পায় না।

স্থানের ফাঁকা না পেলে যেমন ভালো ক'রে বাঁচা যায় না, তেমনি সময়ের ফাঁকা চিন্তার ফাঁকা না পেলে মন বড়ো ক'রে ভাবতে পারে না;

সত্য তার কাছে ছোটো হয়ে যায়। সেই ছোটো সত্য মিটমিটে আলোর মতো ভয়কে প্রশ্রয় দেয়, দৃষ্টিকে প্রতারণা করে এবং মানুষের ব্যবহারের ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণ করে রাখে।

আজকের দিনে ভারতবাসী হয়ে নিজের সকলের চেয়ে বড়ো দৌর্ভাগ্য অনুভব করছি এই জান্‌লার কাছটাতে এসে। আমাদের ভাগ্যে জান্‌লার ফাঁক গেছে বুজে; জীবনের এ-কোণে ও-কোণে একটু-আধটু যা ছুটির পোড়ো জায়গা ছিল তা কাঁটাগাছে ভ'রে গেল।

প্রাচীন ভারতে একটা জিনিষ প্রচুর ছিল, সেটাকে আমরা খুব মহামূল্য ব'লেই জানি, সে হচ্চে সত্যকে খুব বড়ো ক'রে ধ্যান করবার এবং উপলব্ধি করবার মতো মনের উদার অবকাশ। ভারতবর্ষ একদিন সুখ এবং দুঃখ, লাভ এবং অলাভের উপরকার সব চেয়ে বড়ো ফাঁকায় দাঁড়িয়ে সেই সত্যকেই সুস্পষ্ট করে দেখছিল, যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।"

কিন্তু আজকের দিনে ভারতবর্ষের সেই ধ্যানের বড়ো অবকাশটি নষ্ট হোলো। আজকের দিনে ভারতবাসীর আর ছুটি নেই; তার মনের অন্তরতম ছুটির উৎসটি শুকিয়ে শুকিয়ে মরে গেল, বেদনায় তার সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।

তাই আজ যখনি এই বাতায়নে এসে বসেছি, অমনি দেখি আমাদের আঙিনা থেকে উঠছে দুর্ব্বলের কান্না; সেই দুর্ব্বলের কান্নায় আমাদের উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম, সমস্ত অবকাশ একেবারে পরিপূর্ণ। আজকের দিনে দুর্ব্বল যত ভয়ঙ্কর দুর্ব্বল, জগতের ইতিহাসে এমন আর কোনো দিনই ছিল না।

বিজ্ঞানের কৃপায় বাহুবল আজ নিদারুণ দুর্জ্জয়। পালোয়ান আজ জলস্থল আকাশ সর্ব্বত্রই সিংহনাদে তাল ঠুকে বেড়াচ্চে। আকাশ

একদিন মানুষের হিংসাকে আপন সীমানায় ঢুক্‌তে দেয় নি। মানুষের ক্রূরতা আজ সেই শূন্যকেও অধিকার করেছে। সমুদ্রের তলা থেকে আরম্ভ ক'রে বায়ুমণ্ডলের প্রান্ত পর্য্যন্ত সব জায়গাতেই বিদীর্ণ-হৃদয়ের রক্ত বয়ে চলল।

এমন অবস্থায়, যখন সবলের সঙ্গে দুর্ব্বলের বৈষম্য এত অত্যন্ত বেশি, তখনও যদি দেখা যায় এতবড়ো বলবানেরও ভীরুতা ঘুচল না, তাহোলে সেই ভীরুতার কারণটা ভালো ক'রে ভেবে দেখতে হবে। ভেবে দেখা দরকার এই জন্যে যে, য়ুরোপে আজকের যে-শান্তিস্থাপনের চেষ্টা হচ্চে সেই শান্তি টেঁকসই হবে কি না সেটা বিচার করতে হোলে এই সমস্ত বলিষ্ঠদের মনস্তত্ত্ব বুঝে দেখা চাই।

যুদ্ধ যখন প্রবল বেগে চলছিল, যখন হারের আশঙ্কা জিতের আশার চেয়ে কম ছিল না, তখন সেই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় সন্ধির সর্ত্তভঙ্গ, অস্ত্রাদি-প্রয়োগে বিধিবিরুদ্ধতা, নিরস্ত্র শত্রুদের প্রতি বায়ুরথ থেকে অস্ত্রবর্ষণ প্রভৃতি কাণ্ডকে এ পক্ষ crime অর্থাৎ অপরাধ ব'লে অভিযোগ করেছিলেন। মানুষ crime কখন করে? যখন সে ধর্ম্মের গরজের চেয়ে আর কোনো একটা গরজকে প্রবল ব'লে মনে করে। যুদ্ধে জয়লাভের গরজটাকেই জর্ম্মনি ন্যায়াচরণের গরজের চেয়ে আশু গুরুতর বোধ করেছিল। এ পক্ষ যখন সেজন্যে আঘাত পাচ্ছিলেন তখন বলছিলেন, জর্ম্মনির পক্ষে কাজটা একেবারেই ভালো হচ্চে না; হোক্ না যুদ্ধ, তাই ব'লে কি আইন নেই ধর্ম্ম নেই? আর যখন বিজিত-প্রদেশে জর্ম্মনি লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিতে দয়াবোধ করে নি তখন আশু প্রয়োজনের দিক্ থেকে জর্ম্মনির পক্ষে তার কারণ নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু এ পক্ষে বলেছিল আশু প্রয়োজন-সাধনাটাই কি মানুষের চরম মনুষ্যত্ব? সভ্যতার কি একটা দায়িত্ব নেই? সেই দায়িত্বরক্ষার চেয়ে

যারা উপস্থিত কাজ-উদ্ধারকেই বড়ো মনে করে তারা কি সভ্যসমাজে স্থান পেতে পারে ?

ধর্ম্মের দিক থেকে এ সকল কথার একেবারে জবাব নেই। শুনে আমাদের মনে হয়েছিল যুদ্ধের অগ্নিতে এবার বুঝি কলিযুগের সমস্ত পাপ দগ্ধ হয়ে গেল, এতদিন পরে মানুষের দশা ফিরবে, কেননা তার মন ফিরছে। মন না ফিরলে কেবলমাত্র অবস্থা বা ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনে কখনই কোনো ফল পাওয়া যায় না।

কিন্তু আমাদের তখন হিসাবে একটা ভুল হয়েছিল। আমাদের দেশে শ্মশান-বৈরাগ্যকে লোকে সন্দেহের চক্ষে দেখে। তার কারণ, প্রিয়জনের আশু মৃত্যুতে মন যখন দুর্ব্বল তখনকার বৈরাগ্যে বিশ্বাস নেই, সবল মনের বৈরাগ্যই বৈরাগ্য। তেমনি যুদ্ধফলের অনিশ্চয়তায় মন যখন দুর্ব্বল তখনকার ধর্ম্মবাক্যকে ষোলো আনা বিশ্বাস করা যায় না।

যুদ্ধে এ পক্ষের জিত হোলো। এখন কী করলে পৃথিবীতে শান্তির ভিত পাকা হয় তাই নিয়ে পঞ্চায়েৎ বসে গেছে। কথা কাটাকাটি, প্রস্তাব-চালাচালি, রাজ্য-ভাগাভাগি চলছে। এই কারখানাঘর থেকে কী আকার এবং কী শক্তি নিয়ে কোন যন্ত্র বেরবে তা ঠিক বুঝতে পারছিনে।

আর কিছু না বুঝি একটা কথা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে ; এত আগুনেও কলিযুগের অন্ত্যেষ্টি সৎকার হোলো না, মন বদল হয়নি। কলিযুগের সেই সিংহাসনটা আজ কোনখানে ? লোভের উপরে। পেতে চাই, রাখতে চাই, কোনোমতেই কোথাও একটুও কিছু ছাড়তে চাইনে। সেইজন্যেই অতি বড়ো বলিষ্ঠেরও ভয়, কী জানি যদি দৈবাৎ এখন বা সুদূর কালেও একটুখানি লোকসান হয়। যেখানে লোকসান কোনোমতেই সইবে না, সেখানে আইনের দোহাই, ধর্ম্মের দোহাই

মিথ্যে। সেখানে অন্যায়কে কর্ত্তব্য ব'লে আপনাকে ভোলাতে একটুও সময় লাগে না ; সেখানে দোষের বিচার দোষের পরিমাণের দিক থেকে নয়, আইনের দিক থেকে নয়, নিজের লোভের দিক থেকে।

এই ভয়ঙ্কর লোভের দিনে সবলকে সবল যখন ভয় করতে থাকে, তখন উচ্চ তানের ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে রফারফির কথা হোতে থাকে, তখন আইনের মধ্যে কোনো ছিদ্র কোনো জায়গায় যাতে একটুও না থাকতে পারে সেই চেষ্টা হয়। কিন্তু দুর্ব্বলকে যখন সেই সময়েই সেই লোভেরই তাড়ায় সবল এতটুকু পরিমাণেও ভয় করে, তখন শাসনের উত্তেজনা কোনো দোহাই মানতে চায় না, তখন আইনের মধ্যে বড়ো বড়ো ছিদ্র খনন করা হয়।

প্রবলের ভয়ে এবং দুর্ব্বলের ভয়ে মস্ত একটা তফাৎ আছে। দুর্ব্বল ভয় পায় সে ব্যথা পাবে, আর প্রবল ভয় পায় সে বাধা পাবে। সকলেই জানেন কিছুকাল থেকে পাশ্চাত্য দেশে "Yellow Peril" বা পীত-সঙ্কট নাম নিয়ে একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। এই আতঙ্কের মূল কথাটা এই যে, প্রবলের লোভ সন্দেহ করছে পাছে আর কোথাও থেকে সেই লোভ কোনো একদিন প্রবল বাধা পায়। বাধা পাবার সম্ভাবনা কিসে? যদি আর কোনো জাতি এই প্রবলদেরই মতো সকল বিষয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। তাদের মতো বড়ো হওয়া একটা সঙ্কট— এইটে নিবারণ করবার জন্যে অন্যদের চেপে ছোটো ক'রে রাখা দরকার। সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ আজ এই নীতি নিয়ে বাকি জগতের সঙ্গে কারবার করছে। এই নীতিতে নিরন্তর যে-ভয় জাগিয়ে রাখে তাতে শান্তি টিকতে পারে না।

জগদ্বিখ্যাত ফরাসী লেখক আনাতোল ফ্রাঁস লিখছেন :—

"It does not, however, appear at first sight that the

Yellow Peril at which European economists are terrified is to be compared to the White Peril suspended over Asia. The Chinese do not send to Paris, Berlin, and St. Petersburg missionaries to teach Christians the Fung-Chui, and sow disorder in European affairs. A Chinese expeditionary force did not land in Quiberon Bay to demand of the Government of the Republic extra-territoriality, i. e., the right of trying by a tribunal of mandarins cases pending between Chinese and Europeans. Admiral Togo did not come and bombard Brest Roads with a dozen battleships, for the purpose of improving Japanese trade in France. * * * * He did not burn Verseilles in the name of a higher civilisation. The army of the Great Asiatic Powers did not carry away to Tokio and Peking the Louvre paintings and the silver service of the Elysee.

No indid ! Monsieur Edmond Thery himself admits that the yellow men are not sufficiently civilised to imitate the whites so faithfully. Nor does he foresee that they will ever rise to so high a moral culture. How could it be possible for them to possess our virtues ? They are not Christians. But men entitled to speak consider that the Yellow Peril is none the less to be dreaded for all that it is economic. Japan and

China organised by Japan, threaten us, in all the markets of Europe, with a competition frightful, monstrous, enormous, and deformed, the mere idea of which causes the hair of the economists to stand on end."

অর্থাৎ লোভ কোথাও বাধা পেতে চায় না। সেই জন্যে যে নিচে আছে তাকে চিরকালই নিচে চেপে রাখতে চায়, এবং যে প্রবল হয়ে ওঠবার লক্ষণ দেখাচ্চে তাকে অকল্যাণ ব'লেই গণ্য করে।

যতক্ষণ এই লোভ আছে ততক্ষণ জগতে শান্তি আনে পীস্-কন্‌ফারেন্সের এমন সাধ্য নেই। কলে অনেক জিনিস তৈরি হচ্চে কিন্তু কলে-তৈরি শান্তিকে বিশ্বাস করিনে। কর্ম্মিক ধনিকদের মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ, এক রাজ্য অন্য রাজ্যের মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ, আবার রাজা ও প্রজার মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ। তাই শেষকালে দাঁড়ায় এই, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

এমন অবস্থায় সবলপক্ষীয়েরা যখন আপোষ-নিষ্পত্তির যোগে শান্তি-কামনা করে তখন তারা নিজেদের পারে পাকা বাঁধ বেঁধে এবং অন্যদের পাকা খাদ কেটে লোভের স্রোতটাকে নিজেদের দিক থেকে অন্য দিকে সরিয়ে দেয়। বসুন্ধরাকে এমন জায়গায় পরস্পর বখরা ক'রে নিতে চায় যে জায়গাটা যথেষ্ট নরম, অনায়াসেই যেখানে দাঁত বসে, এবং ছিঁড়তে গিয়ে নখে যদি আঘাত লাগে, নখ তার শোধ তুলতে পারে। কিন্তু জোর ক'রে বলা যায় এমন ভাবে চিরদিন চলবে না; ভাগ সমান হবে না, লোভের ক্ষুধা সব জায়গায় সমান ক'রে ভরবে না, পাপের ছিদ্র নানা জায়গায় থেকে যাবে; হঠাৎ একদিন ভরা-ডুবি হবে।

বিধাতা আমাদের একটা দিকে নিশ্চিন্ত করেছেন, ঐ বলের দিকটায়

আমাদের রাস্তা একেবারে শেষ ফাঁকটুকু পর্য্যন্ত বন্ধ, যে-আশা রাস্তা না পেলেও উড়ে চলে সেই আশারও ডানা কাটা পড়েছে। আমাদের জন্যে কেবল একটা বড়ো পথ আছে, সে হচ্চে দুঃখের উপরে যাবার পথ। রিপু আমাদের বাইরে থেকে আঘাত দিচ্চে দিক্, তাকে আমরা অন্তরে আশ্রয় দেব না। যারা মারে তাদের চেয়ে আমরা যখন বড়ো হোতে পারব তখন আমাদের মার-খাওয়া ধন্য হবে। সেই বড়ো হবার পথ না লড়াই করা, না দরখাস্ত লেখা।

অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবম্ অধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥

(৩)

অন্যের সঙ্গে কথা কওয়া এবং অন্যের সঙ্গে চিঠি লেখার ব্যবস্থা আছে সংসার জুড়ে। আর নিজের সঙ্গে? সেটা কেবল এই বাতায়ন-টুকুতে। কিন্তু নিজের মধ্যে কার সঙ্গে কে কথা কয়?

একটা উপমা দেওয়া যাক। মাটির জলের খানিকটা সূক্ষ্ম হয়ে মেঘ হয়ে আকাশে উড়ে যায়। সেখান থেকে সেই নির্ম্মল দূরত্বের সঙ্গীত এবং উদার বেগ নিয়ে ধারায় ধারায় পুনর্ব্বার সে মাটির জলে ফিরে আসতে থাকে।

এই জলেরই মতো মানুষের মনের একটা ভাগ সংসারের উর্দ্ধে আকাশের দিকে উড়ে যায়, সেই আকাশচারী মনটা মাঝে মাঝে আবার যদি এই ভূচর মনের সঙ্গে মিলতে পারে তবে তাতেই পূর্ণতা ঘটে।

কিন্তু এমন সকল মরুপ্রদেশ আছে যেখানে প্রায় সমস্ত বৎসর ধরেই

অনাবৃষ্টি। বাষ্প হয়ে যা উপরে চলে গেল বর্ষণ হয়ে তা আর ধরায় নেমে আসে না। নিচের মনের সঙ্গে উপরের মনের আর মিলন হয় না। সেখানে খাল-কাটা জলে কাজ চলে যায় কিন্তু সেখানে আকাশের সঙ্গে মাটির শুভ সঙ্গমের সঙ্গীত এবং শঙ্খধ্বনি কোথায়? সেখানে বর্ষণ-মুখরিত রসের উৎসব হোলো না! সেখানে মনের মধ্যে চির-বিরহের একটা শুষ্কতা রয়ে গেল।

এ তো গেল অনাবৃষ্টির কথা। এ ছাড়া মাঝে মাঝে কাদাবৃষ্টি রক্ত-বৃষ্টি প্রভৃতি নানা উৎপাতের কথা শোনা যায়। আকাশের বিশুদ্ধিতা যখন চলে যায়, বাতাস যখন পৃথিবীর নানা আবর্জ্জনায় পূর্ণ হয়ে থাকে তখনি এইসব কাণ্ড ঘটে। তখন আকাশের বাণীও নির্ম্মল হয়ে পৃথিবীকে পবিত্র করে না। পৃথিবীরই পাপ পৃথিবীতে ফিরে আসতে থাকে।

আজকের দিনে সেই দুর্য্যোগ ঘটেছে। পৃথিবীর পাপের ধূলিতে আকাশের বর্ষণও আবিল হয়ে নামছে। নির্ম্মল ধারায় পুণ্যস্নানের জন্যে অনেক দিনের যে প্রতীক্ষা তাও আজ বারে বারে ব্যর্থ হোলো। মনের মধ্যে কাদা লাগছে এবং রক্তের চিহ্ন এসে পড়ছে; বার বার কত আর মুছব?

রক্ত-কলঙ্কিত পৃথিবী থেকে ঐ যে আজ একটা শান্তির দরবার উঠেছে, ঊর্দ্ধ আকাশের নির্ম্মল নিঃশব্দতা তার বেসুরকে ধুয়ে দিতে পারছে না।

শান্তি? শান্তির দরবার সত্য সত্যই কে করতে পারে? ত্যাগের জন্যে যে প্রস্তুত। ভোগেরই জন্যে, লাভেরই জন্যে যাদের দশ আঙুল অজগর সাপের দশটা ল্যাজের মতো কিলবিল করছে তারা শান্তি চায় বটে কিন্তু সে ফাঁকি দিয়ে; দাম দিয়ে নয়। যে শান্তিতে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষীর সর বাটি-চেটে নিরাপদে খাওয়া যেতে পারে সেই শান্তি।

দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীর এই ক্ষীরসরের বড়ো বড়ো ভাণ্ডগুলো প্রায় আছে দুর্বলদের জিম্মায়। এইজন্য যে-ত্যাগশীলতায় সত্যকার শান্তি সেই ত্যাগের ইচ্ছা প্রবলদের মনে কিছুতেই সহজ হোতে পারছে না। যেখানে শক্ত পাহারা সেখানে লোভ দমন করতে বেশি চেষ্টা করতে হয় না। সেখানে মানুষ সংযত হয় এবং নিজেকে খুব ভালো ছেলে বলেই মনে করে। কিন্তু আল্‌গা পাহারা যেখানে, সেখানে ভয়ও থাকে না, লজ্জাও চলে যায়। এমন-সব জায়গা আছে যেখানে ভালো ছেলে বলে নিজের পরিচয় দিলে লাভ আছে; কিন্তু দুর্বলের সঙ্গে যেখানে কারবার সেখানে বেচারা প্রবলপক্ষের ভালো হওয়া সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ বলেই যে কত কঠিন তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বিখ্যাত ফরাসীলেখক আনাতোল্ ফ্রাঁসের লেখা থেকে একটা জায়গা উদ্ধৃত করি। তিনি চীনদেশের সঙ্গে য়ুরোপের সম্বন্ধ আলোচনা উপলক্ষে লিখছেন :—

"In our own times, the Christian acquired the habit of sending jointly or separately into that vast Empire, whenever order was disturbed, soldiers who restored it by means of theft, rape, pillage, murder, and incendiarism, and of proceeding at short intervals with the pacific penetration of the country with rifles and guns. The poorly armed Chinese either defend themselves badly or not at all, and so they are massacred with delightful facility. * * * * In 1901 order having been disturbed at Peking, the troops of the five Great Powers, under the command of a German Field Marshal, restored it by the customary means. Having in this

fashion covered themselves with military glory, the five Powers signed one of the innumerable treaties by which they guarantee the integrity of the very China whose provinces they divide among themselves."

পীকিনে যে ভাঙ-চুর, লুটপাট ও উৎপাত হয়েছিল মানুষের দুঃখ এবং অপমানের পক্ষে সে বড়ো কম নয়, কিন্তু সে সম্বন্ধে লজ্জা-পাওয়া এবং লজ্জা-দেওয়ার পরিমাণ আধুনিক য়ুরোপীয় যুদ্ধঘটিত আলোচনার তুলনায় কতই অণুপরিমাণমাত্র তা সকলেই জানেন। এর থেকে স্পষ্ট দেখা যায় ভালো হওয়ার যে কঠিন আদর্শ মানুষের মনুষ্যত্বকে উর্দ্ধে ধারণ করে রাখে দুর্ব্বলের সংসর্গে সেইটে নেমে যায়। মানুষ নিজের অগোচরে নিজের সঙ্গে একটা সন্ধিপত্র লেখাপড়া করে নেয়,—বলে ভালোমন্দর বিচার নিয়ে নিজের সঙ্গে নিজের যে-একটা নিরন্তর লড়াই চল্‌ছে অমুক-অমুক চৌহদ্দির মধ্যে সেটাকে যথেষ্ট পরিমাণ ঢিল্ দেওয়া যেতে পারে। ভারতবর্ষে আমরাও একাজ করেছি—শূদ্রকে ব্রাহ্মণ এত দুর্ব্বল করেছিল যে তার সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের না ছিল লজ্জা না ছিল ভয়। আমাদের সংহিতাগুলি আলোচনা করলে একথা ধরা পড়্‌বে। দেশ-জুড়ে আজ তার যে ফল ফলেছে তা বোঝবার শক্তি পর্য্যন্ত চলে গেছে, দুর্গতি এত গভীর।

যে দুর্ব্বল, সবলের পক্ষে সে তেম্‌নি ভয়ঙ্কর, হাতীর পক্ষে যেমন চোরাবালি। এই বালি বাধা দিতে পারে না ব'লেই সম্মুখের দিকে অগ্রসর করে না, কেবলি নিচের দিকে টেনে নেয়। শক্তির আয়তন যত প্রকাণ্ড, তার ভার যতই বেশি, তার প্রতি অশক্তির নিচের দিকের টান ততই ভয়ঙ্কর। যে মাটী বাধা দেয় না, তাকে পদাঘাত যত জোরেই কর্‌বে, পদের পক্ষে ততই বিপদ ঘট্‌বে।

যে-জায়গায় হাওয়া হাল্‌কা সেই জায়গাই হচ্চে ঝড়ের কেন্দ্র। এই জন্যে য়ুরোপের বড়ো বড়ো ঝড়ের আসল জন্মস্থান এসিয়া আফ্রিকা। ঐখানে বাধা কম, ঐখানে ন্যায়পরতার য়ুরোপীয় আদর্শ খাড়া রাখ্‌বার প্রেরণা দুর্ব্বল। এবং আশ্চর্য্য এই যে, সেই ন্যায়পরতার আদর্শ যে নেমে চলেছে বলদর্পে মানুষ সেটা বুঝ্‌তেই পারে না। এইটেই হচ্চে দুর্গতির পরাকাষ্ঠা।

এই অসাড়তা, এই অন্ধতা এতদুর পর্য্যন্ত যায় যে, এক এক সময়ে তার কাণ্ড দেখে বড়ো দুঃখেও হাসি আসে। য়ুরোপের শুঁড়িখানা থেকে পোলিটিকাল মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে এমন একদল যুবক আমাদের দেশে আছে। তারা নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করে। তাই দেখে অনেকবার এই কথাই ভেবেছি, মানুষের স্বদেশী পাপের তো অভাব নেই, এর উপরে যারা বিদেশী পাপের আম্‌দানি কর্‌ছে তারা আমাদের কলুষের ভার আরো দুর্ব্বহ ক'রে তুল্‌ছে। এমন সময়ে আমাদের বাংলাদেশের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা এই সমস্ত পোলিটীক্যাল হত্যাকাণ্ড উপলক্ষ ক'রে ব'লে বস্‌লেন, খুন করা সম্বন্ধে বাংলাদেশের ধর্ম্মবুদ্ধি য়ুরোপের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র ; তিনি বলেন, বাঙালি জানে, খুন করা আর কিছুই নয়, মানুষকে এক লোক থেকে আরেক লোকে চালান করে দেওয়া মাত্র! * যে-পাশ্চাত্যদের কাছে বাঙালি ছাত্র এই-সমস্ত অপকর্ম্ম শিখেছে অবশেষে তাঁদেরই কাছ থেকে এই বিচার! পলিটিক্সের হাটে তাঁরা মানুষের প্রাণ যে কী রকম ভয়ঙ্কর সস্তা করে তুলেছেন, সেটা বোধ হয়

---

* ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ দ্বীপে প্রতি লক্ষ লোকে ·১০ অংশ লোকের খুনের অভিযোগ বিচার হয়েছিল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশে প্রতি লক্ষ লোকে ·০৮ অংশ লোকের খুনের চার্জ্জে বিচার হয়েছিল। হাতের কাছে বই না থাকাতে সম্পূর্ণ তালিকা দিতে পার্‌লাম না।

অভ্যাসবশত নিজে তেমন করে দেখেন নি বাইরের লোকে যেমন দেখ্‌তে পায়। এই সব পলিটিক্সবিলাসীদের কি কোনো বিশেষ মনস্তত্ত্ব নেই? তাঁদের সেই মনস্তত্ত্বের শিক্ষাটাই আজ সমস্ত পৃথিবীময় খুন ছড়িয়ে চলেছে, এ-কথা তাঁরাও ভুল্‌লেন?

ওরা আমাদের থেকে আলাদা, একেবারে ভিতরের দিক থেকে আলাদা—এই কথা যারা বলে তারা এরা-ওরার সম্বন্ধকে গোড়া ঘেঁসে কলুষিত করে। এদের সম্বন্ধে যে-নিয়ম ওদের সম্বন্ধে সে-নিয়ম চল্‌তেই পারে না ব'লে তারা নিজের ধর্ম্মবুদ্ধিকে ঠাণ্ডা রাখে; অন্যায়ের মধ্যে নিষ্ঠুরতার মধ্যে যতটুকু চক্ষুলজ্জা এবং অস্বস্তি আছে সেটুকু তারা মেরে রাখ্‌তে চায়। যতদিন ধরে প্রাচ্যদের সঙ্গে পাশ্চাত্যদের সম্বন্ধ হয়েছে ততদিন থেকেই এই-সব বুলির উৎপত্তি। গায়ের জোরে যাদের প্রতি অন্যায় করা সহজ, তাদের সম্বন্ধে অন্যায় কর্‌তে পাছে মনের জোরেও কোথাও বাধে সেই জন্যে এরা সে রাস্তাটুকুও সাফ রাখ্‌তে চায়।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি, দুর্ব্বলের সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের বিচারবুদ্ধি নষ্ট হয়, নিজেদের এক আদর্শে বিচার করি, অন্যদের অন্য আদর্শে। নিজেদের ছাত্রেরা যখন গোলমাল করে তখন সেটাকে স্নেহপূর্ব্বক বলি যৌবনোচিত চাঞ্চল্য, অন্যদের ছাত্ররাও যখন মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে ওঠে সেটাকে চোখ রাঙিয়ে বলি নষ্টামি। পরজাতিবিদ্বেষের লেশমাত্র লক্ষণে ভয়ঙ্কর রাগ হয় যখন সেটা দেখি দুর্ব্বলের তরফে, আর নিজের তরফে তার সাতগুণ বেশি থাক্‌লেও তার এত রকমের সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় যে, সেটার প্রতি স্নেহই জন্মায়। আবার আনাতোল ফ্রাঁসের দ্বারস্থ হচ্চি। তার কারণ, চিত্ত তাঁর স্বচ্ছ, কল্পনা তাঁর দীপ্তি-মান, এবং যেটা অসঙ্গত সেটা তাঁর কৌতুকদৃষ্টিতে মুহূর্ত্তে ধরা পড়ে;

পররাজ্যশাসনের বালাই তাঁর কোনোদিন ঘটেনি। চীনেদের কথাই চল্‌ছে :—

They are polite and ceremonious, but are reproached with cherishing feeble sentiments of affections for Europeans. The grievances we have against them are greatly of the order of those which Mr. Du Chaillu cherished towards his Gorilla. Mr. Du Chaillu, while in a forest, brought down with his rifle the mother of a Gorilla. In its death the brute was still pressing its young to its bosom. He tore it from its embrace, and dragged it with him in a cage across Africa, for the purpose of selling it in Europe. Now, the young animal gave him just cause for complaint. It was unsociable, and actually starved itself to death. "I was powerless," says Mr. Du Chaillu, "to correct its evil nature."

তাই বল্‌ছি, সবলের সব চেয়ে বড়ো বিপদ হচ্চে দুর্ব্বলের কাছে। দুর্ব্বল তার ধর্ম্মবুদ্ধি এমন করে অপহরণ করে যে, সবল তা দেখতেই পায় না, বুঝতেই পারে না। আজকের দিনে এই বিপদটাই পৃথিবীতে সব চেয়ে বেড়ে উঠ্‌ছে। কেননা হঠাৎ বাহুবলের অতিবৃদ্ধি ঘটেছে। দুর্ব্বলকে শাসন করা ক্রমেই নিরতিশয় অবাধ হয়ে আস্‌ছে। এই শাসন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এতই আটঘাট-বাঁধা যে, এর জালে যে বেচারা পড়েছে কোথাও কোনোকালে এতটুকু ফাঁক দিয়ে একটুখানি বেরবার তার আশা নেই। তবুও কিছুতেই আশ মিটছে না, কেননা লোভ যে ভীরু, সে অতিবড়ো শক্তিমানকেও নিশ্চিন্ত হোতে দেয় না। শক্তিমান তাই

বসে বসে এই ঠাওরাচ্ছে যে শাসনের ইস্ক্রু-কলে এমনি কষে প্যাঁচ দিতে হবে যে, নালিশ জানাতে মানুষের সাহস হবে না, সাক্ষ্য দিতে ভয় পাবে, ঘরের কোণেও চেঁচিয়ে কাঁদলে অপরাধ হবে। কিন্তু শাসনকে এত বেশি সহজ ক'রে ফেলে যারা, নিজের মনুষ্যত্বের তহবিল ভেঙে এই অতি-সহজ শাসনের মূল্য তাদের জোগাতে হবে। প্রতিদিন এই যে তহবিল ভেঙে চলা এর ফলটা প্রতিদিন নানা আকারে নিজের ঘরেই দেখা দেবে। এখনো দেখা দিচ্ছে কিন্তু তার হিসাব কেউ মিলিয়ে দেখ্‌ছে না।

এই তো প্রবলপক্ষ সম্বন্ধে বক্তব্য। আমাদের পক্ষে এ সব কথা বেশি ক'রে আলোচনা কর্‌তে বড়ো লজ্জা বোধ হয়, কেননা বাইরে থেকে এর আকারটা উপদেশের মতো—কিন্তু এর ভিতরের চেহারাটা মার খেয়ে কান্নারই রূপান্তর। একদিকে ভয় আরেকদিকে কান্না, দুর্ব্বলের এইটেই হচ্চে সকলের চেয়ে বড়ো লজ্জা। প্রবলের সঙ্গে লড়াই কর্‌বার শক্তি আমাদের নেই কিন্তু নিজের সঙ্গে লড়াই আমাদের কর্‌তেই হবে। আর যাই করি, ভয় আমরা কর্‌ব না, এবং কথা বলা যদি বন্ধ করে দেয় তবে সমুদ্রের এপার থেকে ওপার পর্য্যন্ত নাকি সুরে কান্না আমরা তুল্‌ব না।

দুঃখের আগুন যখন জ্বলে তখন কেবল তার তাপেই জ্ব'লে মর্‌ব আর তার আলোটা কোনো কাজেই লাগাব না এটা হোলেই সব চেয়ে বড়ো লোক্‌সান। সেই আলোটাতে মোহ-আঁধার ঘুচুক, একবার ভালো করে চেয়ে দেখো। নিজের মনকে একবার জিজ্ঞাসা করো, ঐ বীভৎস শক্তিমান মানুষটাকে যত বড়ো দেখাচ্চে সে কি সত্যই তত বড়ো? বাইরে থেকে সে ভাঙচুর কর্‌তে পারে কিন্তু ভিতর থেকে মানুষের জীবনের সম্পদ লেশমাত্র যোগ ক'রে দিয়ে যাবার সাধ্য ওর আছে? ও সন্ধি কর্‌তে পারে কিন্তু শান্তি দিতে পারে কি? ও অভিভূত কর্‌তে পারে কিন্তু শক্তি দান কর্‌তে

পারে কি? আজ প্রায় দুহাজার বছর আগে সামান্য একদল জাল-জীবীর অখ্যাত এক গুরুকে প্রবল রোম সাম্রাজ্যের একজন শাসনকর্ত্তা চোরের সঙ্গে সমান দণ্ডকাষ্ঠে বিঁধে মেরেছিল। সেদিন সেই শাসনকর্ত্তার ভোজের অন্নে কোনো ব্যঞ্জনের ত্রুটি হয়নি এবং সে আপন রাজপালঙ্কে আরামেই ঘুমতে গিয়েছিল। সেদিন বাইরে থেকে বড়ো দেখিয়েছিল কা'কে? আর আজ? সেদিন সেই মশানে বেদনা এবং মৃত্যু এবং ভয়, আর রাজপ্রাসাদে ভোগ এবং সমারোহ? আর আজ? আমরা কার কাছে মাথা নত করব? কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?

(৪)

বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলির বিষয়টা হচ্চে, এক দেবতাকে তার সিংহাসন থেকে খেদিয়ে দিয়ে আরেক দেবতার অভ্যুদয়। সহজেই এই কথা মনে হয় যে, দুই দেবতার মধ্যে যদি কিছু নিয়ে প্রতিযোগিতা থাকে তাহোলে সেটা ধর্ম্মনীতিগত আদর্শেরই তারতম্য নিয়ে। যদি মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধিকে নূতন দেবতা পুরাতন দেবতার চেয়ে বেশি তৃপ্তি দিতে পারেন তাহোলেই তাঁকে বরণ করবার সঙ্গত কারণ পাওয়া যায়।

কিন্তু এখানে দেখি একেবারেই উল্টো। এককালে পুরুষ দেবতা যিনি ছিলেন তাঁর বিশেষ কোনো উপদ্রব ছিল না। খামকা মেয়ে দেবতা জোর করে এসে বায়না ধরলেন, আমার পুজো চাই। অর্থাৎ যে-জায়গায় আমার দখল নেই, সে-জায়গা আমি দখল করবই। তোমার দলিল কী? গায়ের জোর। কী উপায়ে দখল করবে? যে উপায়েই হোক্। তার পরে যে-সকল উপায় দেখা গেল মানুষের সদ্বুদ্ধিতে তাকে সদুপায় বলে

না। কিন্তু পরিণামে এই-সকল উপায়েরই জয় হোলো। ছলনা, অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতা কেবল যে মন্দির দখল করল তা নয়, কবিদের দিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে চামর দুলিয়ে আপন জয়গান গাইয়ে নিলে। লজ্জিত কবিরা কৈফিয়ৎ দেবার ছলে মাথা চুল্‌কিয়ে বললেন, কী করব, আমার উপর স্বপ্নে আদেশ হয়েছে। এই স্বপ্ন একদিন আমাদের সমস্ত দেশের উপর ভর করেছিল।

সেদিনকার ইতিহাস স্পষ্ট নয়। ইতিহাসের যে-একটা আবছায়া দেখতে পাচ্চি সেটা এই রকম:—বাংলা সাহিত্য যখন তার অব্যক্ত কারণ-সমুদ্রের ভিতর থেকে প্রবাল-দ্বীপের মতো প্রথম মাথা তুলে দেখা দিলে তখন বৌদ্ধধর্ম্ম জীর্ণ হয়ে বিদীর্ণ হয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে নানাপ্রকার বিকৃতিতে পরিণত হচ্চে। স্বপ্নে যেমন এক থেকে আর হয়, তেম্‌নি ক'রেই বুদ্ধ তখন শিব হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। শিব ত্যাগী, শিব ভিক্ষু, শিব বেদবিরুদ্ধ, শিব সর্ব্বসাধারণের। বৈদিক দক্ষের সঙ্গে এই শিবের বিরোধের কথা কবিকঙ্কণ এবং অন্নদামঙ্গলের গোড়াতেই প্রকাশিত আছে। শিবও দেখি বুদ্ধের মতো নির্ব্বাণমুক্তির পক্ষে; প্রলয়েই তাঁর আনন্দ।

কিন্তু এই শান্তির দেবতা, ত্যাগের দেবতা টিক্‌ল না। য়ুরোপেও আধুনিক শক্তিপূজক বলছেন, যিশুর মতো অমন গরীবের দেবতা, নিরীহ দেবতা, অমন নেহাৎ ফিকে রক্তের দেবতা নিয়ে আমাদের চল্‌বে না। আমাদের এমন দেবতা চাই জোর করে যে কেড়ে নিতে পারে, যেমন-করে-হোক্ যে নিজেকে জাহির কর্‌তে গিয়ে না মানে বাধা, না পায় ব্যথা, না করে লজ্জা। কিন্তু য়ুরোপে এই যে বুলি উঠেছে সে কাদের পান-সভার বুলি? যারা জিতেছে, যারা লুটেছে, পৃথিবীটাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে যারা তাদের মদের চাট বানিয়ে খাচ্চে।

আমাদের দেশের মঙ্গলগানের আসরেও ঐ বুলিই উঠেছিল। কিন্তু

এ বুলি কোন্‌খান থেকে উঠল? যাদের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই, সম্মান নেই সেই হতভাগাদের স্বপ্নের থেকে। তারা স্বপ্ন দেখল। কখন্? যখন

নারায়ণ, পরাশর, এড়াইল দামোদর,
উপনীত কুচট্যানগরে।
তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান, করিলুঁ উদকপান,
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।
আশ্রম পুখরি-আড়া, নৈবেদ্য শালুক পোড়া,
পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে।
ক্ষুধাভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা যাই সেই ধামে,
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥

সেদিনকার শক্তির স্বপ্ন স্বপ্নমাত্র—সে স্বপ্নের মূল আছে ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমের মধ্যে।

শোনা গেছে ইতিহাসের গান অমিত্রাক্ষরে হয় না—এর চরণে-চরণে মিল। সেই পাঁচশো বছর পূর্ব্বের এক চরণের সঙ্গে আজ পাঁচশো বছর পরের এক চরণের চমৎকার মিল শোনা যাচ্ছে না কি? য়ুরোপের শক্তিপূজক আজ বুক ফুলিয়ে বড়ো সমারোহেই শক্তির পূজো করছেন;—মদে তাঁর দুই চক্ষু জবা-ফুলের মতো টক্‌টক্ করছে; খাঁড়া শাণিত; বলির পশু যূপে বাঁধা। তাঁরা কেউ কেউ বলছেন আমরা যিশুকে মানিনে, আবার কেউ কেউ ভারতচন্দ্রের মতো গোঁজামিলন দিয়ে বলছেন, যিশুর সঙ্গে শক্তির সঙ্গে ভেদ করে দেওয়া ঠিক নয়, অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিতে দুজনকেই সমান মানবার মন্ত্র আছে। অর্থাৎ একদল মদ খাচ্ছেন রাজাসনে বসে, আরেক দল পুল্‌পিটে চড়ে।

আর আমরাও বলছি, শিবকে মানব না। শিবকে মানা কাপুরুষতা।

আমরা চণ্ডীর মঙ্গল গাইতে বসেছি। কিন্তু সে মঙ্গলগান স্বপ্নলব্ধ। ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমের স্বপ্ন। জয়ীর চণ্ডীপূজায় আর পরাজিতের চণ্ডীগানে এই তফাৎ।

স্বপ্নেতেই যে আমাদের চণ্ডীগানের আদি এবং স্বপ্নেতেই যে তার অন্ত তার প্রমাণ কী? ঐ দেখো না ব্যাধের দশা, তার স্ত্রী ফুল্লরার বারমাস্যা একবার শোনো; কিন্তু হোলো কী? হঠাৎ খামখেয়ালী শক্তি বিনা কারণে তাকে এমন-একটা আঙটি দিলেন যে, ঘরে আর টাকা ধরে না। কলিঙ্গরাজের সঙ্গে এই সামান্য ব্যাধ যখন লড়াই করল, তখন খামকা স্বয়ং হনুমান এসে তার পক্ষ নিয়ে কলিঙ্গের সৈন্যকে কিলিয়ে লাথিয়ে একাকার করে দিলে। এ'কেই বলে শক্তির স্বপ্ন, ক্ষুধা এবং ভয়ের বরপুত্র। হঠাৎ একটা কিছু হবে। তাই সেই অতি-অদ্ভুত হঠাতের আশায় আমরা দলে দলে উচ্চৈঃস্বরে মা মা করে চণ্ডীগান করতে লেগে গেছি। সেই চণ্ডী ন্যায় অন্যায় মানে না, সুবিধার খাতিরে সত্যমিথ্যায় সে ভেদ করে না, সে যেন-তেন প্রকারে ছোটোকে বড়ো, দরিদ্রকে ধনী, অশক্তকে শক্তিমান করে দেয়। তার জন্যে যোগ্য হবার দরকার নেই, অন্তরের দারিদ্র্য দূর করবার প্রয়োজন হবে না, যেখানে যা যেমনভাবে আছে আলস্যভরে সেখানে তাকে তেমনি ভাবেই রাখা চলবে। কেবল করজোড়ে তারস্বরে বল্‌তে হবে—মা, মা, মা!

যখন মোগলপাঠানের বন্যা দেশের উপর ভেঙে পড়ল, তখন সংসারের যে-বাহ্যরূপ মানুষ প্রবল করে দেখতে পেলে সেটা শক্তিরই রূপ। সেখানে ধর্ম্মের হিসাব পাওয়া যায় না, সেখানে শিবের পরিচয় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। মানুষ যদি তখনো সমস্ত দুঃখ এবং পরাভবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারে, আমি সব সহ্য করব তবুও কিছুতেই এ'কে দেবতা ব'লে মানতে পারব না, তাহোলেই মানুষের জিৎ হয়। চাঁদ সদাগর

কিম্বা ধনপতির বিদ্রোহের মধ্যে কিছুদূর পর্য্যন্ত মানুষের সেই পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। মারের পর মার খেয়েছে কিন্তু ভক্তিকে ঠিক জায়গা থেকে নড়তে দেয়নি। মিথ্যা এবং অন্যায় চারিদিক থেকে তাদের আক্রমণ করলে; চণ্ডী বললেন, ভয়ে অভিভূত ক'রে, দুঃখে জর্জ্জর ক'রে, ক্ষতিতে দুর্ব্বল ক'রে, মারের চোটে মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে জোর ক'রে আমার পূজা আদায় করবই! নইলে? নইলে আমার প্রেস্‌টীজ যায়। ধর্ম্মের প্রেস্‌টীজের জন্যে চণ্ডীর খেয়াল নেই, তাঁর প্রেস্‌টীজ হচ্চে ক্ষমতার প্রেস্‌টীজ। অতএব মারের পর মার, মারের পর মার!

অবশেষে দুঃখের যখন চূড়ান্ত হোলো, তখন শিবকে সরিয়ে রেখে শক্তির কাছে আধ-মরা সদাগর মাথা হেঁট করলে। শক্তি তাদের এত দিন যে এত দুঃখ দিয়েছিল সে দুঃখে তেমন অপমান নেই যেমন অপমান শেষকালে এই মাথা হেঁট ক'রে। যে-আত্মা অভয়, যে-আত্মা অমর সে আপন প্রতিষ্ঠা থেকে নেমে এসে ভয়কে, মৃত্যুকে দেবতা ব'লে, আপনার চেয়ে বড়ো ব'লে মানলে। এইখানেই শক্তির সকলের চেয়ে বীভৎস পরিচয় পাওয়া গেল।

আমরা আজ য়ুরোপের দেবতাকে স্বপ্নে পূজো করতে বসেছি, এইটেতেই য়ুরোপের কাছে আমাদের সব চেয়ে পরাভব হয়েছে। যদি সে আমাদের আঘাত করতে চায় করুক, আমরা সহ্য করব, কিন্তু তাই ব'লে পূজো করব? সে চলবে না; কেননা পূজো করতে হবে ধর্ম্মরাজকে। সে দুঃখ দেবে, দিক্‌গে! কিন্তু হারিয়ে দেবে? কিছুতে না! মরার বাড়া গাল নেই, কিন্তু মরেও অমর হওয়া যায় এই কথা যদি কিছুতে ভুলিয়ে দেয় তাহোলে তার চেয়ে সর্ব্বনেশে মৃত্যু আর নেই।

মহান্তং বিভুম্ আত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি।

(৫)

মানুষের ইতিহাসের রথ আজ যত বড়ো ধাক্কা খেয়েছে এমন আর কোনোদিনই খায়নি। তার কারণ আধুনিক ইতিহাসের রথটা কলের গাড়ি, বহু কৌশলে ওর লোহার রাস্তা বাঁধা, আর এক-একটা এঞ্জিনের পিছনে গাড়ির শ্রেণী প্রকাণ্ড লম্বা হয়ে বাঁধা পড়েছে। তার পরে ওর পথ চলেছে জগৎ জুড়ে, নানা জায়গায় নানা পথে কাটাকাটি। কাজেই কলে কলে যদি একবার সংঘাত বাধল, যদি পরস্পরকে বাঁচিয়ে চলতে না পারল, তাহোলে সেই দুর্যোগে ভাঙচুরের পরিমাণ অতি ভয়ানক হয়ে ওঠে, এবং পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর-একপ্রান্ত পর্য্যন্ত থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে।

এই কলের গাড়ির সংঘাত এবারে খুব প্রবল ধাক্কায় ঘটেছে—কী মাল কী সওয়ারী নাস্তানাবুদ হয়ে গেল। তাই চারিদিকে প্রশ্ন উঠেছে, এ কী হোলো, কেমন করে হোলো, কী করলে ভবিষ্যতে এমন আর না হোতে পারে ?

মানুষের ইতিহাসে এই প্রশ্ন এবং বিচার যখন উঠে পড়েছে তখন আমাদেরও কি ভাবতে হবে না ? তখন শুধুই কি পরের নামে নালিশ করব ? নিজের দায়িত্বের কথা স্মরণ করব না ?

আমি পূর্ব্বেও আভাস দিয়েছি এখনও বলছি দুর্ব্বলের দায়িত্ব বড়ো ভয়ানক। বাতাসে যেখানে যা-কিছু ব্যাধির বীজ ভাসছে দুর্ব্বল তাকেই আতিথ্য দান ক'রে তাকে নিজের জীবন দিয়ে জিইয়ে রাখে। ভীরু কেবল ভয়ের কারণকে বাড়িয়ে চলে, অবনত কেবল অপমানকে সৃষ্টি করে।

চোখে যেখানে আমরা দেখতে পাইনে সেখানে আমাদের বাধা পৌঁছয় না; মাটির উপর যে-সব পোকা মাকড় আছে তাদের আমরা অবাধে মাড়িয়ে চলি কিন্তু যদি সামনে একটা পাখী এসে পড়ে তার উপরে পা ফেলতে সহজে পারিনে। পাখীর সম্বন্ধে যে-বিচার করি পিঁপড়ের সম্বন্ধে সে-বিচার করিনে।

অতএব মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য তাকে এমনটি হোতে হবে যাতে তাকে মানুষ ব'লে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এ কর্ত্তব্য কেবল তার নিজের সুবিধের জন্যে নয়, পরের দায়িত্বের জন্যেও। মানুষ মানুষকে মাড়িয়ে যাবে, এটা, যে-লোক মাড়ায় এবং যাকে মাড়ানো হয় কারো পক্ষে কল্যাণের নয়। আপনাকে যে খর্ব্ব করে সে যে কেবল নিজেকেই কমিয়ে রাখে তা নয় মোটের উপর সমস্ত মানুষের মূল্য সে হ্রাস করে। কেননা, যেখানেই আমরা মানুষকে বড়ো দেখি সেখানেই আপনাকে বড়ো ব'লে চিন্‌তে পারি—এই পরিচয় যত সত্য হয় নিজেকে বড়ো রাখ্‌বার চেষ্টা মানুষের পক্ষে তত সহজ হয়।

প্রত্যেক মানুষের যে-দেশে মূল্য আছে সমস্ত জাতি সে-দেশে আপনিই বড়ো হয়। সেখানে মানুষ বড়ো করে বাঁচবার জন্যে নিজের চেষ্টা পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করে, এবং বাধা পেলে শেষপর্য্যন্ত লড়াই করতে থাকে। সে মানুষ যারি সাম্‌নে আসুক, তার চোখে সে পড়্‌বেই—কাজেই ব্যবহারের বেলায় তার সঙ্গে ভেবে চিন্তে ব্যবহার কর্‌তেই হবে। তাকে বিচার কর্‌বার সময় কেবলমাত্র বিচারকের নিজের বিচারবুদ্ধির উপরেই যে ভরসা তা নয়, যথোচিত বিচার পাবার দাবী তার নিজের মধ্যেই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ।

অতএব যে-জাতি উন্নতির পথে বেড়ে চলেছে তার একটা লক্ষণ এই যে, ক্রমশই সে জাতির প্রত্যেক বিভাগের এবং প্রত্যেক ব্যক্তির

অকিঞ্চিৎকরতা চলে যাচ্চে। যথাসম্ভব তাদের সকলেই মনুষ্যত্বের পূরোগৌরব দাবী করবার অধিকার পাচ্চে। এই জন্যেই সেখানে মানুষ ভাবছে, কী করলে সেখানকার প্রত্যেকেই ভদ্র বাসায় বাস করবে, ভদ্রোচিত শিক্ষা পাবে, ভালো খাবে, ভালো পরবে, রোগের হাত থেকে বাঁচবে, এবং যথেষ্ট অবকাশ ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে।

কিন্তু আমাদের দেশে কী হয়েছে? আমরা বিশেষ শিক্ষা দীক্ষা ও ব্যবস্থার দ্বারা সমাজের অধিকাংশ লোককেই খাটো করে রেখেছি। তারা যে খাটো এটা কোনো তর্ক বা বিচারের উপরে নির্ভর করে না, এটাকে বিধিমতে সংস্কারগত করে তুলেছি। এম্‌নি হয়েছে যে, যাকে ছোটো করেছি সে নিজের হাত জোড় করে বল্‌ছে আমি ছোটো। সমাজে তাদের অধিকারকে বড়োর সমতুল্য করতে চেষ্টা করলে তারাই সব চেয়ে বেশি আপত্তি করে।

এম্‌নি ক'রে আপমানকে স্বীকার ক'রে নেবার শিক্ষা ও অভ্যাস সমাজের স্তরে স্তরে নানা আকারে বিধিবদ্ধ হয়ে আছে। যারা নিচে পড়ে আছে সংখ্যায় তারাই বেশি—তাদের জীবনযাত্রার আদর্শ সকল বিষয়েই হীন হোলেও উপরের লোককে সেটা বাজে না। বরঞ্চ তাদের চাল-চলন যদি উপরের আদর্শ অবলম্বন করতে যায় তাহোলে সেটাতে বিরক্তি বোধ হয়।

তার পরে এই-সব চির-অপমানে-দীক্ষিত মানুষগুলো যখন মানব-সভায় স্বভাবতই জোর-গলায় সম্মান দাবী করতে না পারে, যখন তারা এত সঙ্কুচিত হয়ে থাকে যে বিদেশী উদ্ধতভাবে তাদের অবজ্ঞা করতে অন্তরে বাহিরে বাধা বোধ না করে, তখন সেটাকে কি আমাদের নিজেরই কৃতকর্ম্ম ব'লে গ্রহণ করব না?

আমরা নিজেরা সমাজে যে-অন্যায়কে আটেঘাটে বিধি-বিধানে বেঁধে চিরস্থায়ী করে রেখেছি সেই অন্যায় যখন পলিটিক্সের ক্ষেত্রে অন্যের হাত দিয়ে আমাদের উপর ফিরে আসে তখন সেটার সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে আপত্তি করবার জোর আমাদের কোথায়?

জোর করি সেই বিদেশীরই ধর্ম্মবুদ্ধির দোহাই দিয়ে। সে দোহাইয়ে কি লজ্জা বেড়ে ওঠে না! এ কথা বল্‌তে কি মাথা হেঁট হয়ে যায় না, যে, সমাজে আমাদের আদর্শকে আমরা ছোটো করে রাখব, আর পলিটিক্সে তোমাদের আদর্শকে তোমরা উঁচু করে রাখো? আমরা দাসত্বের সমস্ত বিধি সমাজের মধ্যে বিচিত্র আকারে প্রবল করে রাখব আর তোমরা তোমাদের ঔদার্য্যের দ্বারা প্রভুত্বের সমান অধিকার আমাদের হাতে নিজে তুলে দেবে? যেখানে আমাদের এলেকা সেখানে ধর্ম্মের নামে আমরা অতি কঠোর কৃপণতা কর্‌ব, কিন্তু যেখানে তোমাদের এলেকা সেখানে সেই ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে অপর্য্যাপ্ত বদান্যতার জন্যে তোমাদের কাছে দর্‌বার কর্‌তে থাক্‌ব এমন কথা বলি কোন্ মুখে? আর যদি আমাদের দর্‌বার মঞ্জুর হয়? যদি, আমরা আমাদের দেশের লোককে প্রত্যহ অপমান কর্‌তে কুণ্ঠিত না হই, অথচ বিদেশের লোক এসে আপন ধর্ম্মবুদ্ধিতে সেই অপমানিতদের সম্মানিত করে তাহোলে ভিতরে বাহিরেই কি আমাদের পরাভব সম্পূর্ণ হয় না?

আজকের দিনে যে কারণে হোক্ দুঃখ এবং অপমানের বেদনা নিরতিশয় প্রবল হয়ে উঠেছে; এই উপলক্ষে আমাদের মনে একটা কথা আশা কর্‌বার আছে সেটা হচ্চে এই যে, ধর্ম্মবুদ্ধিতে যখন অন্যপক্ষের পরাভব হচ্চে তখন সেইখানে আমরা এদের উপরে উঠব। তাহোলে এদের হাতের আঘাতে আমাদের গৌরব হানি কর্‌বে না বরং বাড়াবে। কিন্তু সেখানেও কি আমরা বল্‌ব, ধর্ম্মবুদ্ধিতে তোমরা আমাদের চেয়ে

বড়ো হয়ে থাকো ; নিজেদের সম্বন্ধে আমরা যে-রকম ব্যবহার কর্‌বার আশা করিনে আমাদের সম্বন্ধে তোমরা সেই রকম ব্যবহারই করো? অর্থাৎ চিরদিনই নিজের ব্যবস্থায় আমরা নিজেদের খাটো ক'রে রাখি, আর চিরদিনই তোমরা নিজগুণে আমাদের বড়ো করে তোলো। সমস্ত বরাৎই অন্যের উপরে, আর নিজের উপরে একটুও নয়? এত অশ্রদ্ধা নিজেকে, আর এতই শ্রদ্ধা অন্যকে? বাহুবলগত অধমতার চেয়ে এই ধর্ম্মবুদ্ধিগত অধমতা কি আরো বেশি নিকৃষ্ট নয়?

অল্পকাল হোলো একটা আলোচনা আমি স্বকর্ণে শুনেছি, তার সিদ্ধান্ত এই যে, পরস্পরের মধ্যে পাকা দেওয়ালের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এক চালের নিচে হিন্দু মুসলমান আহার কর্‌তে পার্‌বে না, এমন কি সেই আহারে হিন্দুমুসলমানের নিষিদ্ধ কোনো আহার্য্য যদি নাও থাকে। যাঁরা এ কথা বল্‌তে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সময় তাঁরাই সন্দেহ করেন যে বিদেশী কর্তৃপক্ষেরা এই বিরোধ ঘটাবার মূলে। এই সন্দেহ যখন করেন তখন ধর্ম্মবিচারে তাঁরা বিদেশীকে দণ্ডনীয় মনে করেন। এর একমাত্র কারণ ধর্ম্মের দাবী নিজের উপরে তাঁদের যতটা, বিদেশীর উপরে তার চেয়ে অনেক বেশি। স্বদেশে মানুষে মানুষে ব্যবধানকে আমরা দুঃসহরূপে পাকা করে রাখ্‌ব সেইটেই ধর্ম্ম, কিন্তু বিদেশী সেই ব্যবধানকে কোনো কারণেই কোনো মতেই নিজের ব্যবহারে লাগালে সেটা অধর্ম্ম। আত্মপক্ষে দুর্ব্বলতাকে সৃষ্টি করব ধর্ম্মের নামে, বিরুদ্ধ পক্ষে সেই দুর্ব্বলতাকে ব্যবহার কর্‌লেই সেটাকে অন্যায় বল্‌ব।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, পাকা দেওয়ালের অপর পারে যেখানে মুসলমান খাচ্চে দেওয়ালের এপারে সেখানে হিন্দু কেন খেতে পারে না, তা হোলে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই আবশ্যক হবে না। হিন্দুর পক্ষে

এ প্রশ্নে বুদ্ধি খাটানো নিষেধ এবং সেই নিষেধটা বুদ্ধিমান জীবের পক্ষে কত অদ্ভুত ও লজ্জাকর তা মনে উদয় হবার শক্তি পর্য্যন্ত চলে গেছে। সমাজের বিধানে নিজের বারো আনা ব্যবহারের কোনোপ্রকার সঙ্গত কারণ নির্দ্দেশ করতে আমরা বাধ্য নই; যেমন বাধ্য নয় গাছপালা কীট-পতঙ্গ পশুপক্ষী। পলিটিক্সে বিদেশীর সঙ্গে কারবারে আমরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শিখেছি,—সে-ক্ষেত্রে সকল রকম বিধিবিধানের একটা বুদ্ধিগত জবাবদিহি আছে ব'লে মানতে অভ্যাস করছি; কিন্তু সমাজে পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার, যার উপরে পরস্পরের গুরুতর সুখ দুঃখ শুভাশুভ প্রত্যহ নির্ভর করে সে সম্বন্ধে বুদ্ধির কোনো কৈফিয়ৎ নেওয়া চলে একথা আমরা ভাবতেও একেবারে ভুলে গেছি।

এমনি করে যে-দেশে ধর্ম্মবুদ্ধিতে এবং কর্ম্মবুদ্ধিতে মানুষ নিজেকে দাসানুদাস করে রেখেছে, সে-দেশে কর্ত্তৃত্বের অধিকার চাইবার সত্যকার জোর মানুষের নিজের মধ্যে থাকতেই পারে না। সে-দেশে এই সকল অধিকারের জন্যে পরের বদান্যতার উপরে নির্ভর করতে হয়।

কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলেছি মানুষ যেখানে নিজেকে নিজে অত্যন্ত ছোটো এবং অপমানিত ক'রে রাখে সেখানে তার কোনো দাবী স্বভাবত কারো মনে গিয়ে পৌঁছয় না। সেইজন্যে তাদের সঙ্গে যে-সকল প্রবলের ব্যবহার চলে সেই প্রবলদের প্রতিদিন দুর্গতি ঘটতে থাকে। মানুষের সঙ্গে আচরণের আদর্শ তাদের না নেমে গিয়ে থাকতে পারে না। ক্রমশই তাদের পক্ষে অন্যায়, ঔদ্ধত্য এবং নিষ্ঠুরতা স্বাভাবিক হয়ে উঠতে থাকে। নিজের ইচ্ছাকে অন্যের প্রতি প্রয়োগ করা তাদের পক্ষে একান্ত সহজ হওয়াতেই মানব-স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা নিজের অগোচরেই তাদের মনে শিথিল হয়ে আসে। ক্ষমতা যতই অবাধ হয় ক্ষমতা ততই মানুষকে নিচের দিকে নিয়ে যায়। এইজন্যে

ক্ষমতাকে যথোচিত পরিমাণে বাধা দেবার শক্তি যার মধ্যে নেই তার দুর্ব্বলতা সমস্ত মানুষেরই শত্রু। আমাদের সমাজ মানুষের ভিতর থেকে সেই বাধা দূর করবার একটা অতি ভয়ঙ্কর এবং অতি প্রকাণ্ড যন্ত্র। এই যন্ত্র একদিকে বিধান-অক্ষৌহিণী দিয়ে আমাদের চারদিকে বেড়ে ধরেছে, আর একদিকে, যে-বুদ্ধি যে-যুক্তি দ্বারা আমরা এর সঙ্গে লড়াই করে মুক্তিলাভ করতে পারতুম, সেই বুদ্ধিকে, সেই যুক্তিকে একেবারে নির্ম্মূল করে কেটে দিয়েছে। তার পরে অন্যদিকে অতি লঘু ত্রুটির জন্যে অতি গুরুদণ্ড। খাওয়া শোওয়া ওঠা বসার তুচ্ছতম স্খলন সম্বন্ধে শাস্তি অতি কঠোর। একদিকে মূঢ়তার ভারে অন্যদিকে ভয়ের শাসনে মানুষকে অভিভূত ক'রে জীবনযাত্রার অতি ক্ষুদ্র খুঁটিনাটি সম্বন্ধেও তার স্বাভিরুচি ও স্বাধীনতাকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। তার পরে? তার পরে ভিক্ষা, ভিক্ষা না মিললে কান্না। এই ভিক্ষা যদি অতি সহজেই মেলে, আর এই কান্না যদি অতি সহজেই থামে, তাহোলে সকল প্রকার মারের চেয়ে অপমানের চেয়ে সে আমাদের বড়ো দুর্গতির কারণ হবে। নিজেকে আমরা নিজে ছোটো করে রাখব, আর অন্যে আমাদের বড়ো অধিকার দিয়ে প্রশ্রয় দেবে এই অভিশাপ বিধাতা আমাদের দেবেন না বলেই আমাদের এত দুঃখের পর দুঃখ।

জাহাজের খোলের ভিতরটায় যখন জল বোঝাই হয়েছে তখনি জাহাজের বাইরেকার জলের মার সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। ভিতরকার জলটা তেমন দৃশ্যমান নয়, তার চালচলন তেমন প্রচণ্ড নয়, সে মারে ভারের দ্বারা, আঘাতের দ্বারা নয়, এইজন্যে বাইরের ঢেউয়ের চড়-চাপড়ের উপরেই দোষারোপ করে তৃপ্তি লাভ করা যেতে পারে; কিন্তু হয় মরতে হবে নয় একদিন এই সুবুদ্ধি মাথায় আসবে যে আসল মরণ ঐ ভিতরকার জলের মধ্যে, ওটাকে যত শীঘ্র পারা যায় সেঁচে ফেলতেই হবে। কাজটা

যদি দুঃসাধ্যও হয় তবু একথা মনে রাখা চাই যে, সমুদ্র সেঁচে ফেলা সহজ নয়, তার চেয়ে সহজ, খোলের জল সেঁচে ফেলা। একথা মনে রাখ্‌তে হবে, বাইরে বাধাবিঘ্ন বিরুদ্ধতা চিরদিনই থাক্‌বে, থাক্‌লে ভালো বই মন্দ নয়—কিন্তু অন্তরে বাধা থাক্‌লেই বাইরের বাধা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। এইজন্যে ভিক্ষার দিকে না তাকিয়ে সাধনার দিকে তাকাতে হবে, তাতে অপমানও যাবে, ফলও পাব।

৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

শক্তিপূজা

“বাতায়নিকের পত্র”-এ আমি শক্তিপূজার যে আলোচনা করেছি সে সম্বন্ধে সাময়িকপত্রে একাধিক লোকে প্রতিবাদ লিখেছেন।

আমাদের দেশে শিব এবং শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে দুটি ধারা দেখতে পাই। তার মধ্যে একটিকে শাস্ত্রিক এবং আর একটিকে লৌকিক বলা যেতে পারে। শাস্ত্রিক শিব যতী বৈরাগী। লৌকিক শিব উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল। বাংলা মঙ্গলকাব্যে এই লৌকিক শিবেরই বর্ণনা দেখতে পাই। এমন কি, রাজসভার কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে শিবের যে চরিত্র বর্ণিত সে আর্য্যসমাজসম্মত নয়।

শক্তির যে শাস্ত্রিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় আমি তা স্বীকার ক'রে নিচ্চি। কিন্তু বাংলা মঙ্গলকাব্যে শক্তির যে স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে সে লৌকিক, এবং তার ভাব অন্যরূপ। সংসারে যারা পীড়িত, যারা পরাজিত, অথচ এই পীড়া ও পরাজয়ের যারা কোনো ধর্ম্মসঙ্গত কারণ দেখতে পাচ্চে না, তারা স্বেচ্ছাচারিণী নিষ্ঠুর শক্তির অন্যায় ক্রোধকেই সকল দুঃখের কারণ ব'লে ধরে নিয়েছে এবং সেই ঈর্ষাপরায়ণা শক্তিকে স্তবের দ্বারা পূজার দ্বারা শান্ত করবার আশাই এই-সকল মঙ্গলকাব্যের প্রেরণা।

প্রচণ্ড দেবতার যথেচ্ছাচারের বিভীষিকা মানবজাতির প্রথম পূজার মূলে দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ মানুষ তখনো বিশ্বের মূলে বিশ্বনিয়মকে দেখতে পায় নি এবং তখন সে সর্ব্বদাই ভয় বিপদের দ্বারা বেষ্টিত। তখন শক্তিমানের আকস্মিক ঐশ্বর্য্যলাভ সর্ব্বদাই চোখে

পড়ছে, এবং আকস্মিকতারই প্রভাব মানবসমাজে সব চেয়ে উগ্রভাবে দৃশ্যমান।

যে সময়ে কবিকঙ্কণ-চণ্ডী অন্নদামঙ্গল লিখিত হয়েছে সে সময়ে মানুষের আকস্মিক উত্থানপতন বিস্ময়কররূপে প্রকাশিত হোত। তখন চারিদিকেই শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘাত চল্‌ছে, এবং কার ভাগ্যে কোন্ দিন যে কী আছে তা কেউ বল্‌তে পারছে না। যে ব্যক্তি শক্তিমানকে ঠিকমতো স্তব করতে জানে, যে ব্যক্তি সত্য মিথ্যা ন্যায় অন্যায় বিচার করে না, তার সমৃদ্ধিলাভের দৃষ্টান্ত তখন সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ। চণ্ডীশক্তিকে প্রসন্ন ক'রে তাকে নিজের ব্যক্তিগত ইষ্টলাভের অনুকূল করা তখন অন্তত একশ্রেণীর ধর্ম্মসাধনার প্রধান অঙ্গ ছিল। তখনকার ধনীমানীরাই বিশেষত এই শ্রেণীভুক্ত ছিল, কেননা তখনকার শক্তির ঝড় তাদের উচ্চচূড়ার উপরেই বিশেষ ক'রে আঘাত করত।

শাস্ত্রে দেবতার যে স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে সেইটেই যে আদিম এবং লৌকিকটাই যে আধুনিক একথা বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত মানা যায় না। আমার বিশ্বাস, অনার্য্যদের দেবতাকে একদিন আর্য্যভাবের দ্বারা শোধন ক'রে স্বীকার ক'রে নেবার সময় ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়েছিল। সেই সময়ে যে-সব দেবতা ভারতবর্ষের সাধুসমাজে প্রবেশ করেছিল তাদের চরিত্রে অসঙ্গতি একেবারে দূর হোতে পারে নি, তাদের মধ্যে আজও আর্য্য অনার্য্য দুইধারা মিশ্রিত হয়ে আছে এবং লৌকিক ব্যবহারে সেই অনার্য্যধারারই প্রবলতা অধিক।

খৃষ্টধর্ম্মের বিকাশেও আমরা এই জিনিষটি দেখতে পাই। য়িহুদির জিহোবা এককালে মুখ্যত য়িহুদি জাতিরই পক্ষপাতী দেবতা ছিলেন। তিনি কী রকম নিষ্ঠুর ঈর্ষাপরায়ণ ও বলিপ্রিয় দেবতা ছিলেন তা ওল্ড্ টেস্টামেণ্ট পড়লেই বোঝা যায়। সেই দেবতা ক্রমশ য়িহুদি

সাধু ঋষিদের বাণীতে এবং অবশেষে যিশুখৃষ্টের উপদেশে সর্ব্বমানবের প্রেমের দেবতা হয়ে প্রকাশ পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে আজও যে দুই বিরুদ্ধভাব জড়িয়ে আছে তা লৌকিক ব্যবহারে স্পষ্ট দেখতে পাই। আজও তিনি যুদ্ধের দেবতা, ভাগাভাগির দেবতা, সাম্প্রদায়িক দেবতা। অখৃষ্টানের প্রতি খৃষ্টানের অবজ্ঞা ও অবিচার তাঁর নামের জোরে যত সজীব হয়ে আছে এমন আর কিছুতে নয়।

আমাদের দেশে সাধারণত শাক্তধর্ম্ম-সাধনা এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম-সাধনার মধ্যে দুই স্বতন্ত্রভাব প্রাধান্য লাভ করেছে। এক সাধনায় পশুবলি এবং মাংসভোজন, অন্য সাধনায় অহিংসা ও নিরামিষ আহার—এটা নিতান্ত নিরর্থক নয়। বিশেষ শাস্ত্রে এই পশু এবং অপরাপর মকারের যে ব্যাখ্যাই থাক্ সাধারণ ব্যবহারে তা প্রচলিত নেই। এই জন্যেই "শক্তি" শব্দের সাধারণ যে অর্থ, যে অর্থ নানাচিহ্নে, অনুষ্ঠানে ও ভাবে শক্তি-পূজার মধ্যে ওতপ্রোত এবং বাংলাদেশের মঙ্গলকাব্যে যে অর্থ প্রচারিত হয়েছে আমি সেই অর্থই আমার রচনায় গ্রহণ করেছি।

একটি কথা মনে রাখতে হবে, দস্যুর উপাস্য দেবতা শক্তি, ঠগীর উপাস্য দেবতা শক্তি, কাপালিকের উপাস্য দেবতা শক্তি। আরো একটি ভাববার কথা আছে, পশুবলি বা নিজের রক্তপাত, এমন কি, নরবলি স্বীকার ক'রে মানৎ দেবার প্রথা শক্তিপূজায় প্রচলিত। মিথ্যা মাম্‌লায় জয় থেকে সুরু করে জ্ঞাতিশক্রর বিনাশ কামনা পর্য্যন্ত সকল প্রকার প্রার্থনাই শক্তিপূজায় স্থান পায়। একদিকে দেবচরিত্রের হিংস্রতা, অপর দিকে মানুষের ধর্ম্মবিচারহীন ফলকামনা এই দুইয়ের যোগ যে-পূজায় আছে, তার চেয়ে বড়ো শক্তিপূজার কথা কোনো বিশেষ শাস্ত্রে নিগূঢ় আছে কি না সেটা আমার আলোচ্য ছিল না। শক্তিপূজার যে-অর্থ লৌকিক বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত, সে অর্থকে অসঙ্গত বলা যায় না, কারণ

লোকপ্রচলিত কাহিনী এবং রূপক চিহ্নে সেই অর্থই প্রবল এবং সভ্য ও বর্ব্বর সকল দেশে সকল ভাবেই শক্তিপূজা চল্‌ছে—অন্যায় অসত্য সে পূজায় লজ্জিত নয়, লোভ তার লক্ষ্য এবং হিংসা তার পূজোপচার। এই লোভ মন্দ নয়, ভালোই, হিংস্রশক্তি মনুষ্যত্বের পক্ষে অত্যাবশ্যক,—এমন সকল তর্ক শক্তিপূজক য়ুরোপে স্পর্দ্ধার সঙ্গে চল্‌ছে, য়ুরোপের ছাত্ররূপে আমাদের মধ্যেও চল্‌ছে—সে সম্বন্ধে আমার যা বল্‌বার অন্যত্র বলেছি; এখানে এইটুকু বক্তব্য যে, সাধারণ লোকের মনে শক্তিপূজার সঙ্গে একটি উলঙ্গ নিদারুণতার ভাব, নিজের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বল-পূর্ব্বক দুর্ব্বলকে বলি দেবার ভাব সঙ্গত হয়ে আছ—"বাতায়নিকের পত্র"-এ আমি তারই উল্লেখ করেছি।

কিন্তু তবু একথা স্বীকার করা উচিত যে, কোনো ধর্ম্মসাধনার উচ্চ অর্থ যদি দেশের কোনো বিশেষ শাস্ত্র বা সাধকের মধ্যে কথিত বা জীবিত থাকে তবে তাকে সম্মান করা কর্ত্তব্য। এমন কি, ভূরিপরিমিত প্রচলিত ব্যবহারের চেয়েও তাকে বড়ো ব'লে জানা চাই। ধর্ম্মকে পরিমাণের দ্বারা বিচার না ক'রে তার উৎকর্ষের দ্বারা বিচার করাই শ্রেয়। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ।"

১৩২৬

সত্যের আহ্বান

পরাসক্ত কীট বা জন্তু পরের রস রক্ত শোষণ ক'রে বাঁচে ; খাদ্যকে নিজের শক্তিতে নিজ দেহের উপকরণে পরিণত করবার দেহযন্ত্র তাদের বিকল হয়ে যায় ; এমনি ক'রে শক্তিকে অলস করবার পাপে প্রাণিলোকে এই সকল জীবের অধঃপতন ঘটে। মানুষের ইতিহাসেও এই কথা খাটে। কিন্তু পরাসক্ত মানুষ বলতে কেবল যে পরের প্রতি জড়ভাবে আসক্ত মানুষকেই বোঝায় তা নয়। চিরদিন যা চলে আসছে তার সঙ্গে যে আপনাকে জুড়ে রেখে দেয়, প্রচলিতের স্রোতের টানে যে হালছাড়া ভাবে আত্মসমর্পণ করে, সেও পরাসক্ত। কেননা বাহির আমাদের অন্তরের পক্ষে পর, সে যখন কেবল অভ্যাসের তাগিদে আমাদের চালিয়ে নিয়ে যায় তখন আমাদের পরাসক্ত অন্তর নিরুদ্যম হয়ে ওঠে এবং মানুষের পরে অসাধ্যসাধন করবার যে-ভার আছে সে সিদ্ধ হয় না।

এই হিসাবে জন্তুরা এ জগতে পরাসক্ত। তারা প্রচলিতের ধারায় গা-ভাসান দিয়ে চলে। তারা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের শাসনে বাঁচে মরে, এগোয় বা পিছোয়। এই জন্যেই তাদের অন্তঃকরণটা বাড়তে পারল না, বেঁটে হয়ে রইল। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে মৌমাছি যে-চাক তৈরী করে আসছে সেই চাক তৈরী করার একটানা ঝোঁক কিছুতেই সে কাটিয়ে বেরতে পারছে না। এতে করে তাদের চাক নিখুঁৎ-মতো তৈরী হচ্চে, কিন্তু তাদের অন্তঃকরণ এই চিরাভ্যাসের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ হয়ে আছে, সে আপনাকে নানাদিকে মেলে দিতে পারছে না। এই-সকল

জীবের সম্বন্ধে প্রকৃতির যেন সাহসের অভাব দেখ্‌তে পাই। সে এদের নিজের আঁচলে ঢেকে চালায়, পাছে নিজে চল্‌তে গেলে বিপদ্ বাধিয়ে বসে—এই ভয়ে এদের অন্তরের চলৎশক্তিকে ছেঁটে রেখে দিয়েছে।

কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তার জীব-রচনা-পরীক্ষায় মানুষের সম্বন্ধে হঠাৎ খুব একটা সাহস দেখতে পাওয়া যায়। তিনি তার অন্তঃকরণটাকে বাধা দিলেন না। বাহিরে প্রাণীটিকে সর্ব্বপ্রকারে বিবস্ত্র নিরস্ত্র দুর্ব্বল ক'রে এর অন্তঃকরণকে ছেড়ে দেওয়া হোলো। এই মুক্তি পাওয়ার আনন্দে সে ব'লে উঠ্‌ল—আমি অসাধ্য সাধন কর্‌ব। অর্থাৎ যা চিরদিন হয়ে আস্‌ছে তাই যে চিরদিন হোতে থাক্‌বে সে আমি সইব না, যা হয় না তাও হবে। সেই জন্যে মানুষ তার প্রথম যুগে যখন চারিদিকে অতিকায় জন্তুদের বিকট নখদন্তের মাঝখানে পড়ে গেল, তখন সে হরিণের মতো পালাতে চাইল না, কচ্ছপের মতো লুকোতে চাইল না, সে অসাধ্য সাধন করলে—চক্‌মকি পাথর কেটে কেটে ভীষণতর নখদন্তের সৃষ্টি কর্‌লে। যে-হেতু জন্তুদের নখদন্ত তাদের বাহিরের দান এইজন্যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের পরেই এই নখদন্তের পরিবর্ত্তন বা উন্নতি নির্ভর করে। কিন্তু মানুষের নখদন্ত তার অন্তঃকরণের সৃষ্টি; এইজন্যে সেই পাথরের বর্শাফলকের পরেই সে ভর করে রইল না, তার সমস্ত হাতিয়ার পাথরের কোঠা থেকে লোহার কোঠায় এসে পৌঁছল। এতে প্রমাণ হয় মানুষের অন্তঃকরণ সন্ধান কর্‌ছে; যা তার চারিদিকে আছে তাতেই সে আসক্ত হয়ে নেই—যা তার হাতের কাছে নেই তাকে হাতের তলায় আন্‌ছে। পাথর আছে তার সাম্‌নে, তাতে সে সন্তুষ্ট নয়; লোহা আছে মাটির নিচে, সেখানে গিয়ে সে ধাক্কা দেয়, পাথরকে ঘষে মেজে তার থেকে হাতিয়ার তৈরী করা সহজ; কিন্তু তাতেও তার মন উঠ্‌ল না, লোহাকে আগুনে গলিয়ে হাতুড়িতে পিটিয়ে ছাঁচে ঢালাই করে যা

সব-চেয়ে বাধা দেয় তাকেই আপনার সব-চেয়ে অনুগত ক'রে তুল্‌লে। মানুষের অন্তঃকরণের ধর্ম্মই হচ্চে এই, আপনাকে খাটিয়ে কেবল যে তার সফলতা তা নয়, তার আনন্দ, সে কেবলি উপরিতল থেকে গভীরতলে পৌঁছতে চায়, প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষে, সহজ থেকে কঠিনে, পরাসক্তি থেকে আত্মকর্ত্তৃত্বে, প্রবৃত্তির তাড়না থেকে বিচারের ব্যবস্থায়। এমনি করে সে জয়ী হয়েছে। কিন্তু কোনো এক দল মানুষ যদি বলে—"এই পাথরের ফলা আমাদের বাপ-পিতামহের ফলা, এ ছাড়া আর যা-কিছু কর্‌তে যাব তাতে আমাদের জাত নষ্ট হবে," তা হোলে একেবারে তাদের মনুষ্যত্বের মূলে ঘা লাগে; তা হোলে যাকে তারা জাতরক্ষা বলে তা হোতে পারে, কিন্তু তাদের সবচেয়ে যে বড়ো জাত মনুষ্য জাত সেইখানে তাদের কৌলিন্য মারা যায়। আজও যারা সেই পাথরের ফলার বেশি এগোয় নি মানুষ তাদের জাতে ঠেলেছে—তারা বনে জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়। তারা বহিরবস্থার কাছে পরাসক্ত, তারা প্রচলিতের জিন-লাগামের টানে চোখে ঠুলি লাগিয়ে চলে; তারা অন্তরের স্বরাজ পায় নি, বাহিরের স্বরাজের অধিকার থেকে তাই তারা ভ্রষ্ট। এ কথা তারা জানেই না যে, মানুষকে আপনার শক্তিতে অসাধ্য-সাধন কর্‌তে হবে; যা হয়েছে তার মধ্যে সে বদ্ধ থাক্‌বে না, যা হয় নি তার দিকে সে এগোবে;—তাল ঠুকে বুক ফুলিয়ে নয়, অন্তঃকরণের সাধনার বলে, আত্মশক্তির উদ্বোধনে।

আজ ত্রিশ বৎসর হয়ে গেল, যখন "সাধনা" কাগজে আমি লিখছিলুম,তখন আমার দেশের লোককে এই কথা বল্‌বার চেষ্টা করেছি। যখন ইংরেজিশেখা ভারতবর্ষ পরের কাছে অধিকার-ভিক্ষার কাজে বিষম ব্যস্ত ছিল তখন বারে বারে আমি কেবল একটি কথা বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছি যে মানুষকে অধিকার চেয়ে নিতে হবে না, অধিকার সৃষ্টি কর্‌তে

হবে। কেননা মানুষ প্রধানতঃ অন্তরের জীব, অন্তরেই সে কর্ত্তা; বাহিরের লাভে অন্তরে লোকসান ঘটে। আমি বলেছিলেম, অধিকার বঞ্চিত হবার দুঃখভার আমাদের পক্ষে তেমন বোঝা নয় যেমন বোঝা আমাদের মাথার উপরে "আবেদন আর নিবেদনের থালা।" তার পরে যখন আমার হাতে 'বঙ্গদর্শন' এসেছিল তখন বঙ্গবিভাগের ছুরি শানানোর শব্দে সমস্ত বাংলাদেশ উতলা। মনের ক্ষোভে বাঙালি সেদিন ম্যাঞ্চেষ্টরের কাপড় বর্জ্জন ক'রে বোম্বাই মিলের সদাগরদের লোভটাকে বৈদেশিক ডিগ্রিতে বাড়িয়ে তুলেছিল। যে-হেতু ইংরেজ সরকারের পরে অভিমান ছিল এই বস্ত্রবর্জ্জনের মূলে, সেই জন্যে সেই দিন এই কথা বল্‌তে হয়েছিল, "এহ বাহ্য।" এর প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ইংরেজ, ভারতবাসী উপলক্ষ্য, এর মুখ্য উত্তেজনা দেশের লোকের প্রতি প্রেম নয়, বিদেশী লোকের প্রতি ক্রোধ। সেদিন দেশের লোককে এই কথা ব'লে সাবধান করবার দরকার ছিল যে, ভারতে ইংরেজ যে আছে এটা বাইরের ঘটনা, দেশ যে আছে এটাই আমাদের ভিতরের কথা। এই ভিতরের কথাটাই হচ্চে চিরসত্য আর বাইরের ব্যাপারটা মায়া। মায়াকে ততক্ষণ অত্যন্ত বড়ো দেখায় যতক্ষণ রাগেই হোক বা অনুরাগেই হোক বাইরের দিক থেকে তার প্রতি সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে তাকিয়ে থাকি। তেড়ে গিয়ে তার পায়ে দাঁত বসিয়ে দেওয়া সেও একটা তীব্র আসক্তি, আর ভক্তিতে তার পা জড়িয়ে ধরা সেও তথৈবচ—তাকে চাইনে বল্‌লেও তার ধ্যানে আমাদের সমস্ত হৃদয় রক্তবর্ণ হয়ে উঠে, আর চাই বল্‌লে তো কথাই নেই। মায়া জিনিসটা অন্ধকারের মতো, বাইরের দিক থেকে কলের গাড়ি চালিয়েও তাকে অতিক্রম করতে পারি নে, তাকে জল দিয়ে ধুয়ে ফেল্‌তে চাইলে সাত সমুদ্র তেরো নদী শুকিয়ে যাবে। সত্য আলোর মতো, তার শিখাটা

অল্‌বামাত্র দেখা যায় মায়া নেই। এইজন্যেই শাস্ত্রে বলেছেন, স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। ভয় হচ্চে মনের নাস্তিকতা, তাকে না-এর দিক থেকে নিকেশ করা যায় না, উপস্থিতমতো তার একটা কারণ গেলেও রক্তবীজের মতো আরেকটা কারণরূপে সে জন্ম নেয়। ধর্ম্ম হচ্চে সত্য, সে মনের আস্তিকতা, তার অল্পমাত্র আবির্ভাবে হাঁ প্রকাণ্ড না-কে একেবারে মূলে গিয়ে অভিভূত করে। ভারতে ইংরেজের আবির্ভাব নামক ব্যাপারটি বহুরূপী : আজ সে ইংরেজের মূর্ত্তিতে, কাল সে অন্য বিদেশীর মূর্ত্তিতে এবং তার পরদিন সে নিজের দেশী লোকের মূর্ত্তিতে নিদারুণ হয়ে দেখা দেবে। এই পরতন্ত্রতাকে ধনুর্ব্বাণ হাতে বাইরে থেকে তাড়া করলে সে আপনার খোলষ বদ্‌লাতে বদ্‌লাতে আমাদের হয়রান ক'রে তুল্‌বে। কিন্তু আমার দেশ আছে এইটি হোলো সত্য, এইটিকে পাওয়ার দ্বারা বাহিরের মায়া আপনি নিরস্ত হয়।

আমার দেশ আছে এই আস্তিকতার একটি সাধনা আছে। দেশে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই দেশ আমার, এ হচ্চে সেই সব প্রাণীর কথা যারা বিশ্বের বাহ্যব্যাপার সম্বন্ধে পরাসক্ত। কিন্তু যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্চে তার আত্মশক্তিসম্পন্ন অন্তরপ্রকৃতিতে এইজন্য যে-দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রেমে কর্ম্মে সৃষ্টি ক'রে তোলে সেই দেশই তার স্বদেশ। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আমি বাঙালিকে ডেকে এই কথা বলেছিলেম যে, আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়। বিশ্বকর্ম্মা আপন সৃষ্টিতে আপনাকেই লাভ করেন। দেশকে পাওয়ার মানে হচ্চে দেশের মধ্যে আপনার আত্মাকেই ব্যাপক ক'রে উপলব্ধি করা। আপনার চিন্তার দ্বারা কর্ম্মের দ্বারা সেবার দ্বারা দেশকে যখন নিজে গড়ে তুল্‌তে থাকি তখনই আত্মাকে দেশের মধ্যে সত্য ক'রে দেখ্‌তে পাই। মানুষের দেশ

মানুষের চিত্তের সৃষ্টি, এই জন্যেই দেশের মধ্যে মানুষের আত্মার ব্যাপ্তি, আত্মার প্রকাশ।

যে-দেশে জন্মেছি কী উপায়ে সেই দেশকে সম্পূর্ণ আমার আপন ক'রে তুলতে হবে বহুকাল পূর্ব্বে 'স্বদেশী সমাজ' নামক প্রবন্ধে তার বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেই আলোচনাতে যে-কোনো ত্রুটি থাকুক এই কথাটি জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে যে, দেশকে জয় ক'রে নিতে হবে পরের হাত থেকে নয় নিজের নৈষ্কর্ম্ম্য থেকে, ঔদাসীন্য থেকে। দেশের যে-কোনো উন্নতি সাধনের জন্যে যে উপলক্ষ্যে আমরা ইংরেজ-রাজ-সরকারের দ্বারস্থ হয়েছি সেই উপলক্ষ্যেই আমাদের নৈষ্কর্ম্ম্যকে নিবিড়তর ক'রে তুলেছি মাত্র। কারণ ইংরেজ-রাজ-সরকারের কীর্ত্তি আমাদের কীর্ত্তি নয়, এইজন্য বাহিরের দিক থেকে সেই কীর্ত্তিতে আমাদের যতই উপকার হোক, ভিতরের দিক থেকে তার দ্বারা আমাদের দেশকে আমরা হারাই, অর্থাৎ আত্মার মূল্যে সফলতা পাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন "ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্ত কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।" দেশ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। দেশ আমারই আত্মা এই জন্যই দেশ আমার প্রিয়—একথা যখন জানি তখন দেশের সৃষ্টিকার্য্যে পরের মুখাপেক্ষা করা সহ্যই হয় না।

আমি সেদিন দেশকে যে-কথা বলবার চেষ্টা করেছিলুম সে বিশেষ কিছু নতুন কথা নয় এবং তার মধ্যে এমন কিছু ছিল না যাতে স্বদেশ-হিতৈষীর কানে সেটা কটু শোনায়। কিন্তু আর কারো মনে না থাকতে পারে, আমার স্পষ্টই মনে আছে যে, আমার এই-সকল কথায় দেশের লোক বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। যারা কটুভাষাব্যবসায়ী সাহিত্যিক গুণ্ডা আমি তাদের কথা বলছি নে, কিন্তু গণ্যমান্য এবং

শিষ্টশান্ত ব্যক্তিরাও আমার সম্বন্ধে ধৈর্য্য রক্ষা করতে পারেন নি। এর দুটি মাত্র কারণ ;—প্রথম—ক্রোধ, দ্বিতীয়—লোভ। ক্রোধের তৃপ্তিসাধন হচ্চে একরকমের ভোগসুখ ; সেদিন এই ভোগসুখের মাৎলামিতে আমাদের বাধা অতি অল্পই ছিল,—আমরা মনের আনন্দে কাপড় পুড়িয়ে বেড়াচ্চি, পিকেট করছি, যারা আমাদের পথে চল্‌ছিল না তাদের পথে কাঁটা দিচ্চি এবং ভাষায় আমাদের কোনো আব্রু রাখছিনে। এই সকল অমিতাচারের কিছুকাল পরে একজন জাপানি আমাকে একদিন বলেছিলেন, "তোমরা নিঃশব্দে দৃঢ় এবং গূঢ় ধৈর্য্যের সঙ্গে কাজ করতে পারো না কেন? কেবলি শক্তির বাজে খরচ করা তো উদ্দেশ্যসাধনের সদুপায় নয়।" তার জবাবে সেই জাপানিকে আমার বলতে হয়েছিল, যে, "উদ্দেশ্যসাধনের কথাটাই যখন আমাদের মনে উজ্জ্বল থাকে তখন মানুষ স্বভাবতই আত্মসংযম ক'রে নিজের সকল শক্তিকেই সেই দিকে নিযুক্ত করে। কিন্তু ক্রোধের তৃপ্তিসাধন যখন মত্ততার সপ্তকে সপ্তকে উদ্দেশ্যসাধনকে ছাড়িয়ে উঠতে থাকে তখন শক্তিকে খরচ ক'রে দেউলে হোতে আমাদের বাধা থাকে না।" যাই হোক সে-দিন ঠিক যে-সময়ে বাঙালি কিছুকালের জন্যে ক্রোধতৃপ্তির সুখভোগে বিশেষ বিঘ্ন পাচ্ছিল না, সমস্তই যেন একটা আশ্চর্য্য স্বপ্নের মতো বোধ হচ্ছিল, সেই সময়ে তাকে অন্য পথের কথা বলতে গিয়ে আমি তার ক্রোধের ভাজন হয়েছিলেম। তা ছাড়া আরও একটি কথা ছিল, সে হচ্চে লোভ। ইতিহাসে সকল জাতি দুর্গম পথ দিয়ে দুর্লভ জিনিষ পেয়েছে, আমরা তার চেয়ে অনেক সস্তায় পাব,—হাত-জোড়-করা ভিক্ষের দ্বারা নয়, চোখ-রাঙানো ভিক্ষের দ্বারা পাব, এই ফন্দির আনন্দে সে-দিন দেশ মেতেছিল। ইংরেজ দোকানদার যাকে বলে Reduced price sale, সেদিন যেন ভাগ্যের হাটে বাঙালির কপালে পোলিটিকাল

মালের সেইরকম সস্তা দামের মৌসুম পড়েছিল। যার সম্বল কম, সস্তার নাম শোনবামাত্র সে এত বেশি খুশী হয়ে ওঠে যে, মালটা যে কী, আর তার কী অবস্থা তার খোঁজ রাখে না, আর যে-ব্যক্তি সন্দেহ প্রকাশ করে তাকে তেড়ে মারতে যায়। মোট কথা সেদিনও আমাদের লক্ষ্য ছিল, ধ্যান ছিল ঐ বাইরের মায়াটা নিয়ে। তাই তখনকার কালের একজন নেতা বলেছিলেন—আমার এক হাত ইংরেজ সরকারের টুঁটিতে, আর এক হাত তার পায়ে। অর্থাৎ কোনো হাতই বাকী ছিল না দেশের জন্য। তৎকালে এবং তার পরবর্ত্তী কালে এই দ্বিধা হয় তো অনেকের একেবারে ঘুচে গেছে—এক দলের দুই হাতই হয় তো উঠেছে সরকারের টুঁটিতে আর-এক দলের দুই হাতই হয় তো নেমেছে সরকারের পায়ে, কিন্তু মায়া থেকে মুক্তিসাধনের পক্ষে দুইই হচ্চে বাইরের পথ। হয় ইংরেজ সরকারের দক্ষিণে নয় ইংরেজ-সরকারের বামে পোড়া মন ঘুরে বেড়াচ্চে, তার হাঁ-ই বলো আর না-ই বলো দুইই হচ্চে ইংরেজকে নিয়ে।

সে-দিন চারিদিক থেকে বাংলাদেশের হৃদয়াবেগের উপরেই কেবল তাগিদ এসেছে। কিন্তু শুধু হৃদয়াবেগ আগুনের মতো জ্বালানি বস্তুকে খরচ করে, ছাই করে ফেলে—সে তো সৃষ্টি করে না। মানুষের অন্তঃকরণ ধৈর্য্যের সঙ্গে, নৈপুণ্যের সঙ্গে, দূরদৃষ্টির সঙ্গে এই আগুনে কঠিন উপাদানকে গলিয়ে আপনার প্রয়োজনের সামগ্রীকে গড়ে তুলতে থাকে। দেশের সেই অন্তঃকরণকে সেদিন জাগানো হোলো না, সেই জন্তে এতবড়ো একটা হৃদয়াবেগ থেকে কোনো একটা স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারল না।

এমনটা যে হোলো তার কারণ বাইরে নেই, তার কারণ আছে আমাদের নিজেরই ভিতরে। অনেক দিন থেকেই আমাদের ধর্ম্মে কর্ম্মে একদিকে

আছে হৃদয়াবেগ আরেক দিকে আছে অভ্যস্ত আচার। আমাদের অন্তঃকরণ অনেক দিন থেকে কোনো কাজ করে নি ; তাকে ভয়ে ভয়ে চেপে রাখা হয়েছে। এই জন্যে যখন আমাদের কাছ থেকে কোনো কাজ আদায় করার দরকার পড়ে তখন তাড়াতাড়ি হৃদয়াবেগের উপর বরাৎ দিতে হয় এবং নানা-রকম জাদুমন্ত্র আউড়িয়ে মনকে মুগ্ধ করবার প্রয়োজন ঘটে। অর্থাৎ সমস্ত দেশ জুড়ে এমন একটা অবস্থা উৎপাদন করা হয় যেটা অন্তঃকরণের কাজ করার পক্ষে বিষম প্রতিকূল।

অন্তঃকরণের জড়তায় যে-ক্ষতি সে-ক্ষতিকে কোনো কিছুতেই পূরণ করা যায় না। কোনোমতে যখন পূরণ করতে চাই তখন মোহকে সহায় করতে ইচ্ছা হয়, তখন অক্ষমের লোভ আলাদিনের প্রদীপের গুজব শুনলেই একেবারে লাফিয়ে ওঠে। এ কথা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করতে হবে যে, আলাদিনের প্রদীপের মতো এমন আশ্চর্য্য সুবিধার জিনিস আর নেই, কেবল ওর একটি মাত্র অসুবিধা এই যে, ও জিনিস কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু পাওয়া যে যায় না এ-কথা খুব জোরের সঙ্গে সে-মানুষ কিছুতেই বলতে পারে না, যার লোভ বেশি অথচ যার সামর্থ্য কম। এইজন্যে তার উদ্যম তখনি পুরোদমে জেগে ওঠে যখন তাকে কেউ আলাদিনের প্রদীপের আশ্বাস দিয়ে থাকে। সেই আশ্বাসকে হরণ করতে গেলে সে এমনি চীৎকার করতে থাকে যেন তার সর্ব্বস্বান্ত করা হোলো।

সেই বঙ্গবিভাগের উত্তেজনার দিনে একদল যুবক রাষ্ট্রবিপ্লবের দ্বারা দেশে যুগান্তর আনবার উদ্যোগ করেছিলেন। আর যাই হোক, এই প্রলয়-হুতাশনে তাঁরা নিজেকে আহুতি দিয়েছিলেন, এই জন্যে তাঁরা কেবল আমাদের দেশে কেন সকল দেশেই সকলেরই নমস্য। তাঁদের নিষ্ফলতাও আত্মার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। তাঁরা পরমত্যাগে পরমদুঃখে

আজ একটা কথা স্পষ্ট জেনেছেন, যে, রাষ্ট্র যখন তৈরি নেই তখন রাষ্ট্রবিপ্লবের চেষ্টা করা পথ ছেড়ে অপথে চলা—পথের চেয়ে অপথ মাপে ছোটো, কিন্তু সেটাকে অনুসরণ করতে গেলে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না, মাঝের থেকে পা-দুটোকে কাঁটায় কাঁটায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হয়। যে-জিনিসের যা দাম তা পূরো না দিতে পারলে দাম তো যায়ই জিনিসও জোটে না। সেদিনকার সেই দুঃসাহসিক যুবকেরা ভেবেছিলেন সমস্ত দেশের হয়ে তাঁরা কয়জন আত্মোৎসর্গ দ্বারা রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাবেন; তাঁদের পক্ষে এটা সর্ব্বনাশ, কিন্তু দেশের পক্ষে এটা সস্তা। সমস্ত দেশের অন্তঃকরণ থেকে সমস্ত দেশের উদ্ধার জেগে ওঠে, তার কোনো একটা অংশ থেকে নয়। রেলযানে ফর্ষ্ট ক্লাস গাড়ির মূল্য এবং সৌষ্ঠব যেমনি থাক্, সে তার নিজের সঙ্গে সংযুক্ত থার্ডক্লাস গাড়িকে কোনোমতেই এগিয়ে যেতে পারে না। আমার মনে হয় তাঁরা আজ বুঝেছেন, সমগ্র দেশ ব'লে একটি জিনিস সমস্ত দেশের লোকের সৃষ্টি: এই সৃষ্টি তার সমস্ত হৃদয়-বৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, ইচ্ছাশক্তির প্রকাশে। এ হচ্চে যোগলব্ধ ধন—অর্থাৎ যে-যোগের দ্বারা মানুষের সকল বৃত্তি আপন সৃষ্টির মধ্যে সংহত হয়ে রূপলাভ করে। পোলিটিকাল যোগ ইকনমিক যোগ পূর্ণ যোগ নয়, সর্ব্বশক্তির যোগ চাই। অন্যদেশের ইতিহাস যখন লক্ষ্য ক'রে দেখি তখন পোলিটিকাল ঘোড়াটাকে সকলের আগে দেখি, মনে মনে ঠিক করি ঐ চতুষ্পদটারই টানে সমস্ত জাত এগিয়ে চলেছে। তখন হিসাব করে দেখিনে, এর পিছনে দেশ ব'লে যে গাড়িটা আছে সেটা চলবার যোগ্য গাড়ি, তার একচাকার সঙ্গে আরেক চাকার সামঞ্জস্য আছে, তার এক অংশের সঙ্গে আরেক অংশের ভালো রকম জোড় মেলানো আছে। এই গাড়িটি তৈরি ক'রে তুলতে শুধু আগুন এবং হাতুড়ি করাত এবং কল-কব্জা লেগেছে তা নয়, এর মধ্যে অনেক দিনের অনেক লোকের

অনেক চিন্তা অনেক সাধনা অনেক ত্যাগ আছে। আরো এমন দেশ আমরা দেখেছি সে বাহ্যত স্বাধীন, কিন্তু পোলিটিকাল বাহনটি যখন তাকে টান্‌তে থাকে, তখন তার ঝড়ঝড় খড় খড় শব্দে পাড়ার ঘুম ছুটে যায়, ঝাঁকানির চোটে সওয়ারির বুকে পিঠে খিল ধর্‌তে থাকে, পথ চল্‌তে চল্‌তে দশবার ক'রে সে ভেঙে ভেঙে পড়ে, দড়ি দড়া দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে দিন কাবার হয়ে যায়। তবু ভালো হোক্ আর মন্দ হোক্ স্ক্রু আল্‌গা হোক্ আর চাকা বাঁকা হোক্, এ গাড়িও গাড়ি, কিন্তু যে-জিনিষটা ঘরে বাইরে সাত টুক্‌রো হয়ে আছে, যার মধ্যে সমগ্রতা কেবল যে নেই তা নয়, যা বিরুদ্ধতায় ভরা, তাকে উপস্থিতমতো ক্রোধ হোক্ বা লোভ হোক্ কোনো একটা প্রবৃত্তির বাহ্যবন্ধনে বেঁধে হেঁই হেঁই শব্দে টান দিলে কিছুক্ষণের জন্যে তাকে নড়ানো যায়, কিন্তু এ'কে কি দেশদেবতার রথযাত্রা বলে? এই প্রবৃত্তির বন্ধন এবং টান কি টেঁকসই জিনিষ? অতএব ঘোড়াটাকে আস্তাবলে রেখে আপাতত এই গড়াপেটার কাজটাই কি সবচেয়ে দরকার নয়? যমের ফাঁসি-বিভাগের সিংহদ্বার থেকে বাংলাদেশের যে-সব যুবক ঘরে ফিরে এসেছেন তাঁদের লেখা প'ড়ে কথা শুনে' আমার মনে হয় তাঁরা এই কথাই ভাবছেন। তাঁরা বলছেন, সকলের আগে আমাদের যোগসাধন চাই, দেশের সমস্ত চিত্তবৃত্তির সম্মিলন ও পরিপূর্ণতা সাধনের যোগ। বাইরের দিক থেকে কোনো অন্ধ বাধ্যতা দ্বারা এ হোতেই পারে না, ভিতরের দিক থেকে জ্ঞানালোকিত চিত্তে আত্মোপলব্ধি দ্বারাই এ সম্ভব। যা-কিছুতে সমস্ত দেশের অন্তঃকরণ উদ্বোধিত হয় না, অভিভূত হয়, একাজের পক্ষে তা অন্তরায়।

নিজের সৃষ্টিশক্তির দ্বারা দেশকে নিজের ক'রে তোলবার যে-আহ্বান সে খুব একটা বড়ো আহ্বান। সে কোনো একটা বাহ্য অনুষ্ঠানের জন্যে

তাগিদ দেওয়া নয়। কারণ, পূর্ব্বেই বলেছি মানুষ তো মৌমাছির মতো কেবল একই মাপে মৌচাক গড়ে না, মাকড়সার মতো নিরন্তর একই প্যাটার্ণে জাল বোনে না; তার সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি হচ্চে তার অন্তঃকরণে,—সেই অন্তঃকরণের কাছে তাব পূরো দাবী, জড় অভ্যাস-পরতার কাছে নয়। যদি কোনো লোভে প'ড়ে তাকে আজ বলি তুমি চিন্তা কোরো না, কর্ম্ম করো, তাহোলে যে-মোহে আমাদের দেশ মরেছে সেই মোহকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। এতকাল ধরে আমরা অনুশাসনের কাছে প্রথার কাছে মানব-মনের সর্ব্বোচ্চ অধিকার, অর্থাৎ বিচারের অধিকার বিকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে অলস হয়ে বসে আছি। বলেছি, আমরা সমুদ্র-পারে যাব না, কেননা মনুতে তার নিষেধ; মুসলমানের পাশে বসে খাব না, কেননা শাস্ত্র তার বিরোধী। অর্থাৎ যে-প্রণালীতে চললে মানুষের মন ব'লে জিনিষের কোনোই দরকার হয় না, যা কেবল-মাত্র চিন্তাহীন অভ্যাসনিষ্ঠতার কাজ, আমাদের সংসারযাত্রার পনেরো আনা কাজই সেই প্রণালীতে চালিত। যে-মানুষ সকল বিষয়েই দাসের প্রতি নির্ভর ক'রে চলে তার যে-রকম পঙ্গুতা, যারা বাহ্য আচারের দ্বারাই নিয়ত চালিত তাদেরও সেই রকম। কেননা পূর্ব্বেই বলেছি অন্তরের মানুষই প্রভু, সে যখন একান্তভাবে বাহ্য প্রথার পরাসক্ত জীব হয়ে ওঠে তখন তার দুর্গতির সীমা থাকে না। আচারে চালিত মানুষ কলের পুতুল, বাধ্যতার চরম সাধনায় সে উত্তীর্ণ হয়েছে। পরতন্ত্রতার কারখানা-ঘরে সে তৈরী; এইজন্যে একচালকের হাত থেকে তাকে নিষ্কৃতি দিতে গেলে আরেক চালকের হাতে তাকে সমর্পণ করতে হয়। পদার্থবিদ্যায় যাকে ইনর্শিয়া বলে, যে-মানুষ তারই একান্ত সাধনাকে পবিত্রতা ব'লে অভিমান করে, তার স্থাবরতাও যেমন জঙ্গমতাও তেমন—উভয়েই তার নিজের কর্তৃত্ব নেই। অন্তঃকরণের যে-জড়ত্ব সর্ব্বপ্রকার দাসত্বের কারণ,

তার থেকে মুক্তি দেবার উপায় চোখে-ঠুলি-দেওয়া বাধ্যতাও নয়, কলের পুতুলের মতো বাহ্যানুষ্ঠানও নয়।

বঙ্গবিভাগের আন্দোলনের পরে এবার দেশে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে তার পরিমাণ আরও অনেক বড়ো; সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে তার প্রভাব। বহুদিন ধরে আমাদের পোলিটিকেল নেতারা ইংরেজি-পড়া দলের বাইরে তাকাননি—কেননা, তাঁদের দেশ ছিল ইংরেজি-ইতিহাস-পড়া একটা পুঁথিগত দেশ। সে দেশ ইংরেজি ভাষার বাষ্পরচিত একটা মরীচিকা, তাতে বার্ক গ্লাডষ্টোন ম্যাটসীনি গারিবাল্‌ডির অস্পষ্টমূর্ত্তি ভেসে বেড়াত। তার মধ্যে প্রকৃত আত্মত্যাগ বা দেশের মানুষের প্রতি যথার্থ দরদ দেখা যায়নি। এমন সময়ে মহাত্মা গান্ধি এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহুকোটী গরীবের দ্বারে—তাদেরই সঙ্গে কথা কইলেন তাদের আপন ভাষায়। এ একটা সত্যকার জিনিষ, এর মধ্যে পুঁথির কোনো নজির নেই। এইজন্যে তাঁকে যে মহাত্মা নাম দেওয়া হয়েছে এ তাঁর সত্য নাম। কেননা, ভারতের এত মানুষকে আপনার আত্মীয় ক'রে আর কে দেখেছে? আত্মার মধ্যে যে শক্তির ভাণ্ডার আছে তা খুলে যায় সত্যের স্পর্শমাত্রে। সত্যকার প্রেম ভারতবাসীর বহুদিনের রুদ্ধদ্বারে যে-মুহূর্ত্তে এসে দাঁড়াল অমনি তা খুলে গেল। কারো মনে আর কার্পণ্য রইল না, অর্থাৎ সত্যের স্পর্শে সত্য জেগে উঠল। চাতুরী দ্বারা যে রাষ্ট্রনীতি চালিত হয় সে-নীতি বন্ধ্যা, অনেক দিন থেকে এই শিক্ষার আমাদের দরকার ছিল। সত্যের যে কী শক্তি, মহাত্মার কল্যাণে আজ তা আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি; কিন্তু চাতুরী ভীরু ও দুর্ব্বলের সহজ ধর্ম্ম, সেটাকে ছিন্ন করতে হোলে তার চামড়া কেটে ছিন্ন করতে হয়। সেই জন্যে আজকের দিনেও দেশের অনেক বিজ্ঞ লোকেই মহাত্মার চেষ্টাকেও

নিজেদের পোলিটিকাল জুয়ো খেলার একটা গোপন চালেরই সামিল ক'রে নিতে চান। মিথ্যায় জীর্ণ তাঁদের মন এই কথাটা কিছুতেই বুঝতে পারে না, যে, প্রেমের দ্বারা দেশের হৃদয়ে এই যে প্রেম উদ্বেলিত হয়েছে এটা একটা অবান্তর বিষয় নয়—এইটেই মুক্তি, এইটেই দেশের আপনাকে পাওয়া—ইংরেজ দেশে আছে কি নেই এর মধ্যে সে কথার কোনো জায়গাই নেই। এই প্রেম হোলো স্বপ্রকাশ, এই হচ্চে হাঁ,—কোনো না-এর সঙ্গে এ তর্ক করতে যায় না, কেননা তর্ক করবার দরকারই থাকে না।

প্রেমের ডাকে ভারতবর্ষের হৃদয়ের এই যে আশ্চর্য্য উদ্বোধন, এর কিছু সুর সমুদ্রপারে আমার কানে গিয়ে পৌঁচেছিল। তখন বড়ো আনন্দে এই কথা আমার মনে হয়েছিল যে, এইবার এই উদ্বোধনের দর্‌বারে আমাদের সকলেরই ডাক পড়বে, ভারতবাসীর চিত্তে শক্তির যে বিচিত্র রূপ প্রচ্ছন্ন আছে সমস্তই প্রকাশিত হবে। কারণ, আমি এ'কেই আমার দেশের মুক্তি বলি,—প্রকাশই হচ্চে মুক্তি। ভারতবর্ষে একদিন বুদ্ধদেব সর্ব্বভূতের প্রতি মৈত্রী-মন্ত্র—নিজের সত্যসাধনার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন; তার ফল হয়েছিল এই যে, সেই সত্যের প্রেরণায় ভারতের মনুষ্যত্ব শিল্পকলায় বিজ্ঞানে ঐশ্বর্য্যে পরিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রশাসনের দিক থেকে সেদিনও ভারত বারে বারে এক হবার ক্ষণিক প্রয়াসের পর বারে বারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল—কিন্তু তার চিত্ত সুপ্তি থেকে, অপ্রকাশ থেকে মুক্তিলাভ করেছিল। এই মুক্তির জোর এত যে, সে আপনাকে দেশের কোনো ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ ক'রে রাখতে পারেনি,—সমুদ্র-মরুপারেও যে-দূর-দেশকে সে স্পর্শ করেছে তারই চিত্তের ঐশ্বর্য্যকে উদ্ঘাটন করেছে। আজকের দিনের কোনো বণিক কোনো সৈনিক একাজ করতে পারেনি; তারা

পৃথিবীকে যেখানেই স্পর্শ করেছে সেইখানেই বিরোধ, পীড়া এবং অপমান জাগিয়েছে, সেইখানেই বিশ্বপ্রকৃতির শ্রী নষ্ট ক'রে দিয়েছে। কেন? কেন না, লোভ সত্য নয়, প্রেমই সত্য। এইজন্য প্রেম যখন মুক্তি দেয় সে একেবারে ভিতরের দিক থেকে। কিন্তু লোভ যখন স্বাতন্ত্র্যের জন্যে চেষ্টা করে তখন সে জবর্‌দস্তির দ্বারা নিজের উদ্দেশ্য সাধন করতে অস্থির হয়ে ওঠে। বঙ্গবিভাগের দিনে এইটে আমরা লক্ষ্য করেছি—সেদিন গরীবদের আমরা ত্যাগদুঃখ স্বীকার করতে বাধ্য করেছি প্রেমের দ্বারা নয়, বাইরে থেকে নানাপ্রকারে চাপ দিয়ে। তার কারণ, লোভ অল্প সময়ের মধ্যে একটা বিশেষ সঙ্কীর্ণ ফললাভের চেষ্টা করে; প্রেমের ফল সে এক দিনের নয় অল্পদিনের জন্যও নয়, সে ফলের সার্থকতা আপনার মধ্যেই।

এতদিন পরে আমার দেশে সেই আনন্দময় মুক্তির হাওয়া বইছে এইটেই আমি কল্পনা ক'রে এসেছিলুম। এসে একটা জিনিস দেখে আমি হতাশ হয়েছি। দেখছি, দেশের মনের উপর বিষম একটা চাপ। বাইরে থেকে কিসের একটা তাড়নায় সবাইকে এক কথা বলাতে এক কাজ করাতে ভয়ঙ্কর তাগিদ দিয়েছে।

আমি যখন প্রশ্ন করতে যাই বিচার করতে যাই আমার হিতৈষীরা ব্যাকুল হয়ে আমার মুখচাপা দিয়ে বলেন, আজ তুমি কিছু বোলো না। দেশের হাওয়ায় আজ প্রবল একটা উৎপীড়ন আছে—সে লাঠি-সড়্‌কির উৎপীড়ন নয়, তার চেয়ে ভয়ঙ্কর, সে অলক্ষ্য উৎপীড়ন। বর্ত্তমান প্রচেষ্টা সম্বন্ধে যাঁদের মনে কিছুমাত্র সংশয় আছে, তাঁরা সেই সংশয় অতি ভয়ে ভয়ে অতি সাবধানে প্রকাশ করলেও পরমুহূর্ত্তেই তার বিরুদ্ধে একটা শাসন ভিতরে ভিতরে উদ্যত হয়ে ওঠে। কোনো একটি খবরের কাগজে একদিন কাপড় পোড়ানো সম্বন্ধে অতি মৃদুমন্দ মধুর কণ্ঠে

একটুখানি আপত্তির আভাসমাত্র প্রকাশ পেয়েছিল ; সম্পাদক বলেন, তার পরদিনই পাঠকমণ্ডলীর চাঞ্চল্য তাঁকে চঞ্চল করে তুল্‌লে। যে-আগুনে কাপড় পুড়েছে সেই আগুনে তাঁর কাগজ পুড়তে কতক্ষণ? দেখতে পাচ্চি একপক্ষের লোক অত্যন্ত ব্যস্ত, আরেকপক্ষের লোক অত্যন্ত ত্রস্ত। কথা উঠেছে সমস্ত দেশের বুদ্ধিকে চাপা দিতে হবে, বিদ্যাকেও। কেবল বাধ্যতাকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে থাকতে হবে। কার কাছে বাধ্যতা? মন্ত্রের কাছে, অন্ধবিশ্বাসের কাছে।

কেন বাধ্যতা? আবার সেই রিপুর কথা এসে পড়ে, সেই লোভ। অতি সত্বর অতি দুর্লভ ধন অতি সস্তায় পাবার একটা আশ্বাস দেশের সাম্‌নে জাগছে। এ যেন সন্ন্যাসীর মন্ত্র-শক্তিতে সোনা ফলাবার আশ্বাস। এই আশ্বাসের প্রলোভনে মানুষ নিজের বিচারবুদ্ধি অনায়াসে জলাঞ্জলি দিতে পারে এবং অন্য যারা জলাঞ্জলি দিতে রাজি হয় না, তাদের পরে বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। বাহিরের স্বাতন্ত্র্যের নামে মানুষের অন্তরের স্বাতন্ত্র্যকে এইরকমে বিলুপ্ত করা সহজ হয়। সকলের চেয়ে আক্ষেপের বিষয় এই যে সকলেই যে এই আশ্বাসে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে তা নয়, কিন্তু তারা বলে, এই প্রলোভনে দেশের একদল লোককে দিয়ে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। "সত্যমেব জয়তে নানৃতং" এটা যে-ভারতের কথা সে-ভারত এঁদের মতে স্বরাজ পেতেই পারে না। আরো মুস্কিল এই যে, যে-লাভের দাবী করা হচ্চে তার একটা নাম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সংজ্ঞা দেওয়া হয় নি। ভয়ের কারণটা অস্পষ্ট হোলে সে যেমন অতি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, লোভের বিষয়টা অস্পষ্ট হোলে তারও প্রবলতা বেড়ে যায়—কেননা তার মধ্যে কল্পনার কোনো বাধা থাকে না এবং প্রত্যেক লোকেই তাকে সম্পূর্ণ নিজের মনের মতো ক'রে গড়ে নিতে পারে। জিজ্ঞাসা

দ্বারা তাকে চেপে ধরতে গেলে সে এক আড়াল থেকে আরেক আড়ালে অতি সহজেই গা ঢাকা দেয়। এমনি করে একদিকে লোভের লক্ষ্যটাকে অনির্দ্দিষ্টতার দ্বারা অত্যন্ত বড়ো ক'রে তোলা হয়েছে, অন্যদিকে তার প্রাপ্তির সাধনাকে সময়ে এবং উপায়ে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণভাবে নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছে। এমনভাবে লোকের মনকে মোহাবিষ্ট ক'রে তার পরে যখন তাকে বলা হয়, তোমার বুদ্ধি বিদ্যা প্রশ্ন বিচার সমস্ত দাও ছাই ক'রে, কেবল থাক তোমার বাধ্যতা, তখন সে রাজি হোতে বিলম্ব করে না। কিন্তু কোনো একটা বাহ্যানুষ্ঠানের দ্বারা অদূরবর্ত্তী কোনো একটা বিশেষ মাসের বিশেষ তারিখে স্বরাজ লাভ হবে একথা যখন অতি সহজেই দেশের অধিকাংশ লোক বিনাতর্কে স্বীকার ক'রে নিলে এবং গদাহাতে সকল তর্ক নিরস্ত করতে প্রবৃত্ত হোলো, অর্থাৎ নিজের বুদ্ধির স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিলে এবং অন্যের বুদ্ধির স্বাধীনতা হরণ করতে উদ্যত হোলো, তখন সেটাই কি একটা বিষম ভাবনার কথা হোলো না? এই ভূতকেই ঝাড়াবার জন্যে কি আমরা ওঝার খোঁজ করিনে? কিন্তু স্বয়ং ভূতই যদি ওঝা হয়ে দেখা দেয় তাহোলেই তো বিপদের আর সীমা রইল না।

মহাত্মা তাঁর সত্যপ্রেমের দ্বারা ভারতের হৃদয় জয় করেছেন, সেখানে আমরা সকলেই তাঁর কাছে হার মানি। এই সত্যের শক্তিকে আমরা প্রত্যক্ষ করলুম এজন্য আজ আমরা কৃতার্থ। চিরন্তন সত্যকে আমরা পুঁথিতে পড়ি, কথায় বলি, যেক্ষণে তাকে আমরা সামনে দেখি সে আমাদের পুণ্যক্ষণ। বহুদিনে অকস্মাৎ আমাদের এই সুযোগ ঘটে। কন্‌গ্রেস আমরা প্রতিদিন গড়তে পারি, প্রতিদিন ভাঙতে পারি, ভারতের প্রদেশে প্রদেশে ইংরেজিভাষায় পোলিটিকাল বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানোও অমাদের সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত, কিন্তু সত্যপ্রেমের যে সোনার

কাঠিতে শত বৎসরের সুপ্ত চিত্ত জেগে ওঠে সে তো আমাদের পাড়ার স্যাকরার দোকানে গড়াতে পারিনে। যাঁর হাতে এই দুর্লভ জিনিষ দেখলুম তাঁকে আমরা প্রণাম করি।

কিন্তু সত্যকে প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও সত্যের প্রতি আমাদের নিষ্ঠা যদি দৃঢ় না হয় তাহোলে ফল হোলো কী? প্রেমের সত্যকে প্রেমের দিকে যেমন মানি, বুদ্ধির সত্যকে বুদ্ধির দিকে তেম্নি আমাদের মান্‌তে হবে। কন্‌গ্রেস প্রভৃতি কোনো রকম বাহ্যানুষ্ঠানে দেশের হৃদয় জাগে নি, মহৎ-অন্তরের অকৃত্রিম প্রেমের স্পর্শে জাগ্‌ল। আন্তরিক সত্যের এই প্রভাব যখন আমরা আজ এমন স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি তখন স্বরাজলাভের বেলাতেই কি সেই সত্যকে আর আমরা বিশ্বাস কর্‌ব না? উদ্বোধনের পালায় যাকে মানলুম, অনুষ্ঠানের পালায় তাকে বিসর্জ্জন দিয়ে বসব?

মনে করো আমি বীণার ওস্তাদ খুঁজছি। পূর্ব্বে পশ্চিমে আমি নানা লোককে পরীক্ষা করে দেখলুম কিন্তু হৃদয়ের তৃপ্তি হোলো না। তারা শব্দ করে খুব, তারা কৌশল জানে বিস্তর, তারা রোজগার করে যথেষ্ট, কিন্তু তাদের বাহাদুরীতে মনে প্রশংসা জাগে, প্রেম জাগে না। অবশেষে হঠাৎ একজনকে খুঁজে পাওয়া গেল তিনি তাঁর তারে দুটি চারটি মীড় লাগাবামাত্র অন্তরের আনন্দ-উৎসের মুখে এতদিন যে-পাথর চাপা ছিল সেটা যেন একমুহূর্ত্তে গেল গ'লে। এর কারণ কী? এই ওস্তাদের মনে যে আনন্দময়ী শক্তি আছে সে একটি সত্যকার জিনিস, সে আপন আনন্দশিখা থেকে অতি সহজেই হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্দশিখাকে জ্বালিয়ে তোলে। আমি বুঝে নিলুম, তাকে ওস্তাদ্ ব'লে মানলুম। তারপর আমার দর্‌কার হোলো একটি বীণা তৈরী করানো। কিন্তু এই বীণা তৈরির বিদ্যায় যে-সত্যের দরকার সে আরেক জাতের সত্য। তার

মধ্যে অনেক চিন্তা, অনেক শিক্ষা, অনেক বস্তুতত্ত্ব, অনেক মাপজোখ, অনেক অধ্যবসায়। সেখানে আমার ওস্তাদ যদি আমার দরিদ্র অবস্থার প্রতি দয়া ক'রে হঠাৎ ব'লে বসেন, "বাবা, বীণা তৈরি করাতে বিস্তর আয়োজনের দরকার, সে তুমি পেরে উঠবে না, তুমি বরঞ্চ এই কাঠির গায়ে একটা তার বেঁধে ঝঙ্কার দাও; তাহোলে অমুক মাসের অমুক তারিখে এই কাঠিই বীণা হয়ে বাজ্‌তে থাক্‌বে।" তবে সে কথা খাট্‌বে না। আসলে আমার গুরুর উচিত নয় আমার অক্ষমতার প্রতি দয়া করা। একথা তাঁর বলাই চাই, "এ-সব জিনিস সংক্ষেপে এবং সস্তায় সারা যায় না।" তিনিই তো আমাদের স্পষ্ট বুঝিয়ে দেবেন যে, "বীণার একটি মাত্র তার নয়, এর উপকরণ বিস্তর, এর রচনাপ্রণালী সূক্ষ্ম, নিয়মে একটুমাত্র ত্রুটি হোলে বেসুর বাজবে—অতএব জ্ঞানের তত্ত্বকে ও নিয়মকে বিচারপূর্ব্বক সযত্নে পালন কর্‌তে হবে।" দেশের হৃদয়ের গভীরতা থেকে সাড়া বের করা এই হোলো ওস্তাদজির বীণা বাজানো,—এই বিদ্যায় প্রেম যে কত বড়ো সত্য জিনিষ সেই কথাটা আমরা মহাত্মাজির কাছ থেকে বিশুদ্ধ করে শিখে নিতে বসেছি, এ সম্বন্ধে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ থাক্‌। কিন্তু স্বরাজ গ'ড়ে তোল্‌বার তত্ত্ব বহুবিস্তৃত, তার প্রণালী দুঃসাধ্য এবং কালসাধ্য; তাতে যেমন আকাঙ্ক্ষা এবং হৃদয়াবেগ তেমনি তথ্যানুসন্ধান এবং বিচারবুদ্ধি চাই। তাতে যাঁরা অর্থশাস্ত্রবিৎ তাঁদের ভাব্‌তে হবে, যন্ত্রতত্ত্ববিৎ তাঁদের খাট্‌তে হবে, শিক্ষাতত্ত্ববিৎ রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ সকলকেই ধ্যানে এবং কর্ম্মে লাগ্‌তে হবে। অর্থাৎ দেশের অন্তঃকরণকে সকল দিক থেকে পূর্ণ উদ্যমে জাগ্‌তে হবে। তাতে দেশের লোকের জিজ্ঞাসাবৃত্তি যেন সর্ব্বদা নির্ম্মল ও নিরভিভূত থাকে—কোনো গূঢ় বা প্রকাশ্য শাসনের দ্বারা সকলের বুদ্ধিকে যেন ভীরু এবং নিশ্চেষ্ট ক'রে তোলা না হয়। এই

যে দেশের বিচিত্র শক্তিকে তলব দেওয়া এবং তাকে নিজের নিজের কাজে লাগানো, এ পারে কে? সকল ডাকে তো দেশ সাড়া দেয় না, পূর্ব্বে তো বারম্বার তার পরীক্ষা হয়ে গেছে। দেশের সকল শক্তিকে দেশের সৃষ্টিকার্য্যে আজ পর্য্যন্ত কেউ যোগযুক্ত করতে পারেন নি ব'লেই তো এতদিন আমাদের সময় বয়ে গেল। তাই এতকাল অপেক্ষা ক'রে আছি, দেশের লোককে ডাক দেবার যাঁর সত্য অধিকার আছে তিনিই সকলকে সকলের আত্মশক্তিকে নিযুক্ত করে দেবেন। একদিন ভারতের তপোবনে আমাদের দীক্ষাগুরু তাঁর সত্যজ্ঞানের অধিকারে দেশের সমস্ত ব্রহ্মচারীদের ডেকে বলেছিলেন, যথাপঃ প্রবতায়ন্তি যথা মাসা অহর্জরম্ এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাত আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা—জলসকল যেমন নিম্ন-দেশে গমন করে, মাসসকল যেমন সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক থেকে ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকটে আসুন, স্বাহা। সেদিন-কার সেই সত্যদীক্ষার ফল আজও জগতে অমর হয়ে আছে এবং তার আহ্বান এখনও বিশ্বের কানে বাজে। আজ আমাদের কর্ম্মগুরু তেমনি করেই দেশের সমস্ত কর্ম্মশক্তিকে কেন আহ্বান করবেন না, কেন বলবেন না, আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা—তারা সকল দিক থেকে আসুক। দেশের সকল শক্তির জাগরণেই দেশের জাগরণ,—এবং সেই সর্ব্বতোভাবে জাগ-রণেই মুক্তি। মহাত্মাজির কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন, কেন না তাঁর মধ্যে সত্য আছে, অতএব এই তো ছিল আমাদের শুভ অবসর। কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটিমাত্র সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে। তিনি বললেন—কেবলমাত্র সকলে মিলে সুতো কাটো, কাপড় বোনো। এই ডাক কি সেই আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা!" এই ডাক কি নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক? বিশ্ব-প্রকৃতি যখন মৌমাছিকে মৌচাকের সঙ্কীর্ণ জীবনযাত্রায় ডাক দিলেন তখন লক্ষ লক্ষ মৌমাছি সেই আহ্বানে কর্ম্মের

সুবিধার জন্য নিজেকে ক্লীব করে দিলে; আপনাকে খর্ব্ব করার দ্বারা এই যে তাদের আত্মত্যাগ এতে তারা মুক্তির উল্টো পথে গেল। যে-দেশের অধিকাংশ লোক কোনো প্রলোভনে বা অনুশাসনে অন্ধভাবে নিজের শক্তির ক্লীবত্ব সাধন করতে কুণ্ঠিত হয় না, তাদের বন্দিদশা যে তাদের নিজের অন্তরের মধ্যেই। চর্‌কা কাটা একদিকে অত্যন্ত সহজ, সেই জন্যেই সকল মানুষের পক্ষে তা শক্ত। সহজের ডাক মানুষের নয়, সহজের ডাক মৌমাছির। মানুষের কাছে চূড়ান্ত শক্তির দাবী করলে তবেই সে আত্মপ্রকাশের ঐশ্বর্য্য উদ্‌ঘাটিত করতে পাবে। স্পার্টা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে মানুষের শক্তিকে সঙ্কীর্ণ ক'রে তাকে বল দেবার চেষ্টা করেছিল, স্পার্টার জয় হয় নি; এথেন্স্‌ মানুষের সকল শক্তিকে উন্মুক্ত ক'রে তাকে পূর্ণতা দিতে চেয়েছিল, এথেন্সের জয় হয়েছে; তার সেই জয়পতাকা আজও মানব-সভ্যতার শিখর-চূড়ায় উড়্‌ছে। য়ুরোপে সৈনিকাবাসে কার্‌খানাঘরে মানবশক্তির ক্লীবত্বসাধন করছে না কি,—লোভের বশে উদ্দেশ্যসাধনের খাতিরে মানুষের মনুষ্যত্বকে সঙ্কীর্ণ ক'রে ছেঁটে দিচ্চে না কি? আর এইজন্যেই কি য়ুরোপীয় সমাজে আজ নিরানন্দ ঘনীভূত হয়ে উঠ্‌ছে না? বড়ো কলের দ্বারাও মানুষকে ছোটো করা যায়, ছোটো কলের দ্বারাও করা যায়! এঞ্জিনের দ্বারাও করা যায়, চর্‌কার দ্বারাও। চর্‌কা যেখানে স্বাভাবিক সেখানে সে কোনো উপদ্রব করে না, বরঞ্চ উপকার করে—মানবমনের বৈচিত্র্যবশতই চর্‌কা যেখানে স্বাভাবিক নয় সেখানে চরকার সুতা কাটার চেয়ে মন কাটা যায় অনেকখানি। মন জিনিসটা সুতার চেয়ে কম মূল্যবান নয়।

একটি কথা উঠেছে এই যে, ভারতে শতকরা আশি জন লোক চাষ করে এবং তারা বছরে ছয় মাস বেকার থাকে, তাদের সুতা কাট্‌তে উৎসাহিত করবার জন্যে কিছুকাল সকল ভদ্রলোকেরই চর্‌কা ধরা

দর্‌কার। প্রথম আবশ্যক হচ্ছে যথোচিত উপায়ে তথ্যানুসন্ধান দ্বারা এই কথাটি প্রতিপন্ন করা। অর্থাৎ কী পরিমাণ চাষা কতদিন পরিমাণ বেকার থাকে। যখন চাষ বন্ধ তখন চাষারা কোনো উপায়ে যে-পরিমাণ জীবিকা অর্জ্জন করে স্থতাকাটার দ্বারা তার চেয়ে বেশি অর্জ্জন কর্‌বে কি না। চাষ ব্যতিরেকে জীবিকার একটিমাত্র উপায়ের দ্বারা সমস্ত কৃষাণকে বদ্ধ করা দেশের কল্যাণের পক্ষে উচিত কি না সে সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। কিন্তু মূল কথা এই যে, কারো মুখের কথায় কোনো অনুমানমাত্রের উপর নির্ভর ক'রে আমরা সর্ব্বজনীন কোনো পন্থা অবলম্বন কর্‌তে পার্‌ব না, আমরা বিশ্বাসযোগ্য প্রণালীতে তথ্যানুসন্ধান দাবী করি। তার পরে উপায়ের যথাযোগ্যতা সম্বন্ধে বিচার করা সম্ভবপর।

আমাকে কেউ কেউ বলেছেন, দেশের চিত্তশক্তিকে আমরা তো চিরদিনের জন্যে সঙ্কীর্ণ কর্‌তে চাইনে, কেবল অতি অল্পকালের জন্যে। কেনই বা অল্পকালের জন্যে? যে-হেতু এই অল্পকালের মধ্যে এই উপায়ে আমরা স্বরাজ পাব? তার যুক্তি কোথায়? স্বরাজ তো কেবল নিজের কাপড় নিজে জোগানো নয়। স্বরাজ তো একমাত্র আমাদের বস্ত্রস্বচ্ছলতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তার যথার্থ ভিত্তি আমাদের মনের উপর—সেই মন তার বহুধাশক্তির দ্বারা এবং সেই আত্মশক্তির উপর আস্থা দ্বারা, স্বরাজ সৃষ্টি কর্‌তে থাকে। এই স্বরাজ-সৃষ্টি কোনো দেশেই তো শেষ হয় নি—সকল দেশেই কোনো-না-কোনো অংশে লোভ বা মোহের প্ররোচনায় বন্ধনদশা থেকে গেছে। কিন্তু সেই বন্ধনদশার কারণ মানুষের চিত্ত। সে-সকল দেশে নিরন্তর এই চিত্তের উপর দাবী করা হচ্ছে। আমাদের দেশেও সেই চিত্তের বিকাশের উপরেই স্বরাজ দাঁড়াতে পার্‌বে। তার জন্যে কোনো বাহ্য ক্রিয়া বাহ্য ফল নয়, জ্ঞান

বিজ্ঞান চাই। দেশের চিত্তপ্রতিষ্ঠিত এই স্বরাজকে অল্পকাল কয়েকদিন চর্‌কা কেটে আমরা পাব, এর যুক্তি কোথায়? যুক্তির পরিবর্ত্তে উক্তি তো কোনোমতেই চল্‌বে না। মানুষের মুখে যদি আমরা দৈববাণী শুন্‌তে আরম্ভ করি তাহোলে আমাদের দেশে, যে হাজার রকমের মারাত্মক উপসর্গ আছে এই দৈববাণী যে তারই মধ্যে অন্যতম এবং প্রবলতম হয়ে উঠ্‌বে। একবার যদি দেখা যায় যে, দৈববাণী ছাড়া আর-কিছুতেই আমাদের দেশ নড়ে না, তা হোলে আশুপ্রয়োজনের গরজে সকালে সন্ধ্যায় দৈববাণী বানাতে হবে,—অন্য সকল-রকম বাণীই নিরস্ত হয়ে যাবে। যেখানে যুক্তির অধিকার সেখানে উক্তি দিয়ে যাদের ভোলাতে হবে, তাদের পক্ষে, যেখানে আত্মার অধিকার সেখানে কোনো-না-কোনো কর্ত্তার আসন পড়্‌বেই। তারা স্বরাজের গোড়া কেটে ব'সে আছে, আগায় জল ঢেলে কোনো ফল হবে না। একথা মানছি, আমাদের দেশে দৈববাণী, দৈব ঔষধ, বাহ্যব্যাপারে দৈবক্রিয়া, এ-সবের প্রভাব খুবই বেশি, কিন্তু সেইজন্যেই আমাদের দেশে স্বরাজের ভিৎপত্তন কর্‌তে হোলে দৈববাণীর আসনে বিশেষ ক'রে বুদ্ধির বাণীকে পাকা ক'রে বসাতে হবে। কেন না, আমার পূর্ব্বের প্রবন্ধে বলেছি, দৈব স্বয়ং আধি-ভৌতিক রাজ্যে বুদ্ধির রাজ্যাভিষেক করেছেন। তাই আজ বাইরের বিশ্বে তারাই স্বরাজ পাবে এবং তাকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে যারা আত্মবুদ্ধির জোরে আত্মকর্ত্তৃত্বের গৌরব উপলব্ধি কর্‌তে পারে—যারা সেই গৌরবকে কোনো লোভে কোনো মোহে পরের পদানত কর্‌তে চায় না। এই যে আজ বস্ত্রাভাবে লজ্জাকাতরা মাতৃভূমির প্রাঙ্গণে রাশীকৃত ক'রে কাপড় পোড়ানো চল্‌ছে, কোন্ বাণীতে দেশের কাছে আজ তার তাগিদ আস্‌ছে। সে কি ঐ দৈববাণীতে নয়? কাপড় ব্যবহার বা বর্জ্জন ব্যাপারে অর্থশাস্ত্রিকতত্ত্বের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে—এ-

সম্বন্ধে সেই তত্ত্বের ভাষাতেই দেশের সঙ্গে কথা কইতে হবে ;—বুদ্ধির ভাষা মান্য করা যদি বহুদিন থেকে দেশের অভ্যাসবিরুদ্ধ হয়, তবে আর-সব ছেড়ে দিয়ে ঐ অনভ্যাসের সঙ্গেই লড়াই করতে হবে। কেন না এই অনভ্যাসই আমাদের পক্ষে গোড়ায় গলদ, original sin। সেই গলদটারই খাতিরে সেই গলদকেই প্রশ্রয় দিয়ে আজ ঘোষণা করা হয়েছে, বিদেশী কাপড় অপবিত্র অতএব তাকে দগ্ধ করো। অর্থশাস্ত্রকে বহিষ্কৃত ক'রে তার জায়গায় ধর্ম্মশাস্ত্রকে জোর ক'রে টেনে আনা হোলো। অপবিত্র কথাটা ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা,—অর্থের নিয়মের উপরের কথা। মিথ্যাকে বর্জ্জন করতে হবে কেন, মিথ্যা অপবিত্র কেন, তার দ্বারা আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না বা নষ্ট হয় ব'লেই যে তা নয়। হোক্ বা না হোক্, তার দ্বারা আমাদের আত্মা মলিন হয়। অতএব এক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্র বা রাষ্ট্রশাস্ত্রের কথা খাটে না, এখানে ধর্ম্মশাস্ত্রেরই বাণী প্রবল। কিন্তু কোনো কাপড় পরা বা না-পরার মধ্যে যদি কোনো ভুল থাকে তবে সেটা অর্থতত্ত্বের বা স্বাস্থ্যতত্ত্বের বা সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ভুল—এটা ধর্ম্মতত্ত্বের ভুল নয়। এর উত্তরে কেউ কেউ বলেন, যে-ভুলে দেহমনের দুঃখ আনয়ন করে সেইটেই অধর্ম্ম। আমি তার উত্তরে এই বলি, ভুলমাত্রেই দুঃখ আছে—জিয়োমেট্রির ভুলে রাস্তা খারাপ হয়, ভিৎ বাঁকা হয়, সাঁকো নির্ম্মাণে এমন গলদ্ ঘটে যে, তার উপর রেলগাড়ী চললে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই ভুলের সংশোধন ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে হয় না। অর্থাৎ ছেলেরা যে-খাতায় জিয়োমেট্রির ভুল করে, অপবিত্র ব'লে সেই খাতা নষ্ট ক'রে এ ভুলের সংশোধন হয় না, জিয়োমেট্রিরই সত্য নিয়মে সেই খাতাকে সংশোধন করতে হবে। কিন্তু মাষ্টার মশায়ের মনে এ কথা উঠতে পারে যে, ভুলের খাতাকে অপবিত্র যদি না বলি, তা হোলে এরা ভুলকে ভুল ব'লে গণ্য করবে না। তা যদি

সত্য হয়, তা হোলে অন্য-সব কাজ ছেড়ে সকলপ্রকার উপায়ে এই চিত্তগত দোষকে সংশোধন করতে হবে, তবেই এ ছেলেরা মানুষ হোতে পারবে। কাপড় পোড়ানোর হুকুম আজ আমাদের 'পরে এসেছে। সেই হুকুমকে হুকুম ব'লে আমি মানতে পারব না, তার প্রথম কারণ হচ্চে এই যে, চোখ বুজে হুকুম মানার বিষম বিপত্তি থেকে দেশকে উদ্ধার করবার জন্যে আমাদের লড়তে হবে—এক হুকুম থেকে আরেক হুকুমে তাকে ঘুরিয়ে হুকুম-সমুদ্রের সাতঘাটে তাকে জল খাইয়ে মারতে পারব না। দ্বিতীয় কথা হচ্চে এই যে, যে-কাপড় পোড়ানোর আয়োজন চলছে সে আমার কাপড় নয়, বস্তুত দেশবাসীদের মধ্যে যাদের আজ কাপড় নেই এ কাপড় তাদেরই, ও কাপড় আমি পোড়াবার কে? যদি তারা বলে পোড়াও তাহোলে অন্তত: আত্মঘাতীর 'পরেই আত্মহত্যার ভার দেওয়া হয়, তাকে বধ করবার ভার আমাদের উপর পড়ে না। যে-মানুষ ত্যাগ করছে তার অনেক কাপড় আছে আর যাকে জোর ক'রে ত্যাগদুঃখ ভোগ করাচ্চি কাপড়ের অভাবে সে ঘরের বার হোতে পারছে না। এমনতরো জবরদস্তির প্রায়শ্চিত্তে পাপক্ষালন হয় না। বারবার বলেছি আবার বলব, বাহ্য ফলের লোভে আমরা মনকে ধোয়াতে পারব না। যে-কলের দৌরাত্ম্যে সমস্ত পৃথিবী পীড়িত, মহাত্মাজি সেই কলের সঙ্গে লড়াই করতে চান, এখানে আমরা তাঁর দলে। কিন্তু যে মোহমুগ্ধ মন্ত্রমুগ্ধ অন্ধবাধ্যতা আমাদের দেশের সকল দৈন্য ও অপমানের মূলে, তাকে সহায় ক'রে এ লড়াই করতে পারব না। কেন না তারই সঙ্গে আমাদের প্রধান লড়াই—তাকে তাড়াতে পারলে তবেই আমরা অন্তরে বাহিরে স্বরাজ পাব।

কাপড় পোড়াতে আমি রাজি আছি, কিন্তু কোনো উক্তির তাড়নায় নয়। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা যথেষ্ট সময় নিয়ে যথোচিত উপায়ে প্রমাণ সংগ্রহ

করুন এবং সুযুক্তি দ্বারা আমাদের বুঝিয়ে দিন্ যে, কাপড়-পোড়া সম্বন্ধে আমাদের দেশ অর্থনৈতিক যে-অপরাধ করেছে অর্থ-নৈতিক কোন্ ব্যবস্থার দ্বারা তার প্রতীকার হোতে পারে। বিনা প্রমাণে বিনা যুক্তিতে কেমন ক'রে নিশ্চিত বল্‌ব যে, বিশেষ একটা কাপড় প'রে আমরা আর্থিক যে অপরাধ করেছি কাপড়টাকে পুড়িয়ে সেই অপরাধের মূলটাকে আরও বিস্তারিত ক'রে দিচ্ছিনে, ম্যাঞ্চেষ্টারের ফাঁস তাতে পরিমাণে ও পরিণামে আরও কঠিন হয়ে উঠবে না? এ তর্ক আমি বিশেষজ্ঞভাবে উত্থাপিত কর্‌ছিনে, কেন না আমি বিশেষজ্ঞ নই, আমি জিজ্ঞাসুভাবেই করছি। বিশেষজ্ঞ যা বলেন তাই যে বেদবাক্য আমি তা বলিনে। কিন্তু সুবিধা এই যে বেদবাক্যের ছন্দে তাঁরা কথা বলেন না। প্রকাশ্য সভায় তাঁরা আমাদের বুদ্ধিকে আহ্বান করেন।

একটি কথা আমাদের মনে ভাববার দিন এসেছে, সে হচ্চে এই,—ভারতের আজকের এই উদ্বোধন সমস্ত পৃথিবীর উদ্বোধনের অঙ্গ। একটি মহাযুদ্ধের তূর্য্যধ্বনিতে আজ যুগান্তরের দ্বার খুলেছে। মহাভারতে পড়েছি, আত্মপ্রকাশের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল হচ্চে অজ্ঞাতবাসের কাল। কিছুকাল থেকে পৃথিবীতে মানুষ যে পরস্পর কী-রকম ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে সে-কথাটা স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞাত ছিল। অর্থাৎ ঘটনাটা বাইরে ছিল, আমাদের মনে প্রবেশ করে নি। যুদ্ধের আঘাতে একমুহূর্ত্তে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যখন বিচলিত হয়ে উঠ্‌ল তখন এই কথাটা আর লুকানো রইল না। হঠাৎ একদিনে আধুনিক সভ্যতা অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিৎ কেঁপে উঠল। বোঝা গেল এই কেঁপে ওঠার কারণটা স্থানিক নয় এবং ক্ষণিক নয়—এর কারণ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-সম্বন্ধ এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে ব্যাপ্ত, তার মধ্যে সত্যের সামঞ্জস্য যতক্ষণ না ঘট্‌বে ততক্ষণ

এই কারণের নিবৃত্তি হবে না। এখন থেকে যে-কোনো জাত নিজের দেশকে একান্ত স্বতন্ত্র ক'রে দেখবে বর্ত্তমান যুগের সঙ্গে তার বিরোধ ঘটবে, সে কিছুতেই শান্তি পাবে না। এখন থেকে প্রত্যেক দেশকে নিজের জন্যে যে চিন্তা করতে হবে তার সে চিন্তার ক্ষেত্র হবে জগৎ-জোড়া। চিত্তের এই বিশ্বমুখী বৃত্তির চর্চ্চা করাই বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার সাধনা। কিছুদিন থেকে আমরা দেখতে পাচ্চি, ভারতরাষ্ট্রশাসনে একটা মূলনীতির পরিবর্ত্তন হচ্চে। এই পরিবর্ত্তনের মূলে আছে ভারতরাষ্ট্রসমস্যাকে বিশ্বসমস্যার অন্তর্গত ক'রে দেখবার চেষ্টা। যুদ্ধ আমাদের মনের সাম্‌নে থেকে একটা পর্দ্দা ছিঁড়ে দিয়েছে—যা বিশ্বের স্বার্থ নয় তা যে আমাদের নিজের স্বার্থের বিরোধী এই কথাকে মানুষ, পুঁথির পাতায় নয়, ব্যবহারের ক্ষেত্রে আজ দেখতে পাচ্চে; এবং সে বুঝছে, যেখানে অন্যায় আছে সেখানে বাহ্য অধিকার থাক্‌লেও সত্য অধিকার থাকে না। বাহ্য অধিকারকে খর্ব্ব ক'রেও যদি সত্য অধিকার পাওয়া যায় তবে সেটাতে লাভ ছাড়া লোক্‌সান নেই। মানুষের মধ্যে এই যে একটা বুদ্ধির বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটছে, তার চিত্ত সঙ্কীর্ণ থেকে ভূমার দিকে যাচ্চে, তারই হাত এই ভারতরাষ্ট্রনীতি-পরিবর্ত্তনের মধ্যে কাজ করতে আরম্ভ করেছে। এর মধ্যে যথেষ্ট অসম্পূর্ণতা ও প্রভূত বাধা আছে;—স্বার্থবুদ্ধি শুভবুদ্ধিকে পদে পদে আক্রমণ করবেই, তাই ব'লে একথা মনে করা অন্যায় যে, এই শুভবুদ্ধিই সম্পূর্ণ কপটতা এবং স্বার্থবুদ্ধিই সম্পূর্ণ অকৃত্রিম। আমার এই ষাটবৎসরের অভিজ্ঞতায় একটি কথা জেনেছি যে, কপটতার মতো দুঃসাধ্য অতএব দুর্লভ জিনিস আর নেই। খাঁটি কপট মানুষ হচ্চে ক্ষণজন্মা লোক, অতি অকস্মাৎ তার আবির্ভাব ঘটে। আসল কথা, সকল মানুষের মধ্যেই কমবেশি পরিমাণে চারিত্র্যের দ্বৈধ আছে। আমাদের বুদ্ধির মধ্যে লজিকের যে কল পাতা,

তাতে দুই বিরোধী পদার্থকে ধরানো কঠিন ব'লেই ভালোর সঙ্গে যখন মন্দকে দেখি তখন তাড়াতাড়ি ঠিক করে নিই, এর মধ্যে ভালোটাই চাতুরী। আজকের দিনে পৃথিবীতে সর্ব্বজনীন যে-সকল প্রচেষ্টা চল্‌ছে তার মধ্যে পদে পদে মানুষের এই চারিত্রের দ্বৈধ দেখা যাবে। সে অবস্থায় তাকে যদি তার অতীতযুগের দিক থেকে বিচার করি তা হোলে তার স্বার্থবুদ্ধিকে মনে কর্‌ব খাঁটি, কারণ, তার অতীতের নীতি ছিল ভেদবুদ্ধির নীতি। কিন্তু তাকে যদি আমাদের আগামীকালের দিক থেকে বিচার করি তা হোলে বুঝব শুভবুদ্ধিটাই খাঁটি। কেননা ভাবী-যুগের একটা প্রেরণা এসেছে মানুষকে সংযুক্ত কর্‌বার জন্যে। যে-বুদ্ধি সকলকে সংযুক্ত করে সেই হচ্চে শুভবুদ্ধি। এই যে লীগ্ অফ নেশন্‌স্ প্রতিষ্ঠা বা ভারতশাসনসংস্কার, এ-সব হচ্চে ভাবী যুগ সম্বন্ধে পশ্চিমদেশের বাণী। এ বাণী সত্যকে যদি বা সম্পূর্ণ প্রকাশ না করে, এর চেষ্টা হচ্চে সেই সত্যের অভিমুখে।

আজ এই বিশ্বচিত্ত-উদ্বোধনের প্রভাতে আমাদের দেশে জাতীয় কোনো প্রচেষ্টার মধ্যে যদি বিশ্বের সর্ব্বজনীন কোনো বাণী না থাকে তা হোলে তাতে আমাদের দীনতা প্রকাশ কর্‌বে। আমি বল্‌ছিনে, আমাদের আশু-প্রয়োজনের যা-কিছু কাজ আছে তা আমরা ছেড়ে দেব। সকাল বেলায় পাখী যখন জাগে তখন কেবলমাত্র আহার অন্বেষণে তার সমস্ত জাগরণ নিযুক্ত থাকে না, আকাশের আহ্বানে তার দুই অক্লান্ত পাখা সায় দেয় এবং আলোকের আনন্দে তার কণ্ঠে গান জেগে ওঠে। আজ সর্ব্বমানবের চিত্ত আমাদের চিত্তে তার ডাক পাঠিয়েছে; আমাদের চিত্ত ভাষায় তার সাড়া দিক—কেননা ডাকের যোগ্য সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাই হচ্চে প্রাণশক্তির লক্ষণ। একদা পর-মুখাপেক্ষী পলিটিক্সে সংসক্ত ছিলুম তখন আমরা কেবলি পরের অপরাধের

তালিকা আউড়ে পরকে তার কর্ত্তব্যত্রুটি স্মরণ করিয়েছি—আজ যখন আমরা পর-পরায়ণতা থেকে আমাদের পলিটিক্সকে ছিন্ন করতে চাই, আজও সেই পরের অপরাধ জপের দ্বারাই আমাদের বর্জ্জননীতির পোষণ পালন করতে চাচ্চি। তাতে উত্তরোত্তর আমাদের যে-মনোভাব প্রবল হয়ে উঠ্‌ছে সে আমাদের চিত্তের আকাশে রক্তবর্ণ ধূলো উড়িয়ে বৃহৎ জগৎ থেকে আমাদের চিন্তাকে আবৃত ক'রে রাখছে। প্রবৃত্তির দ্রুত চরিতার্থতার দিকে আমাদের উত্তেজনা সে কেবলি বাড়িয়ে তুলছে। সমস্ত বিশ্বের যোগযুক্ত ভারতের বিরাট রূপ চোখে না পড়াতে আমাদের কর্ম্মে ও চিন্তায় ভারতের যে-পরিচয় আমরা দিতে প্রবৃত্ত হয়েছি সে অতি ছোটো, তার দীপ্তি নেই; সে আমাদের ব্যবসায়বুদ্ধিকেই প্রধান ক'রে তুলছে। এই বুদ্ধি কখনো কোনো বড়ো জিনিসকে সৃষ্টি করেনি। আজ পশ্চিম দেশে এই ব্যবসায়বুদ্ধিকে অতিক্রম ক'রে শুভবুদ্ধি জাগিয়ে তোল্‌বার জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্যম দেখা দিয়েছে। সেখানে কত লোক দেখছি যারা এই সঙ্কল্পকে মনের মধ্যে নিয়ে আজ সন্ন্যাসী। অর্থাৎ যারা স্বাজাত্যের বাঁধন কেটে ঐক্যের সাধনায় ঘড়ছাড়া হয়ে বেরিয়েছে, যারা নিজের অন্তরে মানুষের অদ্বৈতকে দেখেছে। সেই-সব সন্ন্যাসীকে ইংরেজের মধ্যে অনেক দেখেছি; তাঁরা তাঁদের স্বজাতির আত্মম্ভরিতা থেকে দুর্ব্বলকে রক্ষা করবার সাধনায় স্বজাতির কাছ থেকে আঘাত ও অপমান স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হননি। সেই রকম সন্ন্যাসী দেখেছি ফ্রান্সে; যেমন রোমাঁ্যা রলাঁ,—তিনি তাঁর দেশের লোকের দ্বারা বর্জ্জিত। সেই রকম সন্ন্যাসী আমি য়ুরোপের অপেক্ষাকৃত অখ্যাত দেশের প্রান্তে দেখেছি। দেখেছি য়ুরোপের কত ছাত্রের মধ্যে; সর্ব্বমানবের ঐক্যসাধনায় তাদের মুখচ্ছবি দীপ্তিমান। তারা ভাবীযুগের মহিমায় বর্ত্তমান যুগের সমস্ত আঘাত ধৈর্য্যের সঙ্গে বহন করতে চায়, সমস্ত অপমান বীর্য্যের সঙ্গে

ক্ষমা করতে চায়। আর আমরাই কি কেবল যেমন "পঞ্চকন্যাং স্মরে-ন্নিত্যং" তেমনি ক'রে আজ এই শুভদিনের প্রভাবে কেবল পরের অপরাধ স্মরণ করব, এবং আমাদের জাতীয় সৃষ্টিকার্য্য একটা কলহর উপর প্রতিষ্ঠিত করতে থাক্‌ব? আমরা কি এই প্রভাতে সেই শুভবুদ্ধিদাতাকে স্মরণ করব না,—য একঃ যিনি এক; অবর্ণঃ, যিনি বর্ণহীন,—যাঁর মধ্যে শাদা কালো নেই; বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান নিহিতার্থো দধাতি, যিনি বহুধাশক্তির যোগ্য অনেক বর্ণের লোকের জন্য তাদের অন্তর্নিহিত প্রয়োজন বিধান করেছেন;—আর তাঁরই কাছে কি প্রার্থনা করব না, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, তিনি আমাদের সকলকে শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন!

১৩২৮

সমস্যা

যে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষায় বসে, তাদের সংখ্যা দশ বিশ হাজার হয়ে থাকে, কিন্তু তাদের সকলেরই পক্ষে একই প্রশ্ন, এক কালীতে একই অক্ষরে ছাপানো। সেই একই প্রশ্নের একই সত্য উত্তর দিতে পারলে তবে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ হয়ে পদবী পায়। এই-জন্যে পার্শ্ববর্ত্তী পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে উত্তর চুরি ক'রেও কাজ চলে। কিন্তু বিধাতার পরীক্ষার নিয়ম এত সহজ নয়। এক এক জাতির কাছে তিনি এক-একটি স্বতন্ত্র সমস্যা পাঠিয়েছেন। সেই সমস্যার সত্য মীমাংসা তারা নিজে উদ্ভাবন করলে তবেই তারা তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাবে ও মান পাবে। ভারতকেও তিনি একটি বিশেষ সমস্যা দিয়েছেন, যতদিন না তার সত্য মীমাংসা হবে ততদিন ভারতের দুঃখ কিছুতেই শান্ত হবে না। আমরা চাতুরী খাটিয়ে য়ুরোপের পরীক্ষাপত্র থেকে উত্তর চুরি করছি। একদিন বোকার মতো করছিলুম মাছি-মারা নকল, আজকে বুদ্ধিমানের মতো করছি ভাষার কিছু বদল ঘটিয়ে। পরীক্ষক বারে বারে তার পাশে নীল পেন্সিল দিয়ে যে গোল গোল চিহ্ন কাটছেন তার সব-কটাকেও একত্র যোগ করতে গেলে বিয়োগান্ত হয়ে ওঠে।

বায়ুমণ্ডলে ঝড় জিনিষটাকে আমরা দুর্য্যোগ ব'লেই জানি। সে যেন রাগী আকাশটার কিল চড় লাথি ঘুষোর আকারে আসতে থাকে। এই প্রহারটা তো হোলো একটা লক্ষণ। কিসের লক্ষণ? আসল কথা, যে-বায়ুস্তরগুলো পাশাপাশি আছে, যে প্রতিবেশীদের মধ্যে মিল থাকা উচিত ছিল, তাদের মধ্যে ভেদ ঘটেছে। এক অংশের বড়ো বেশি

গৌরব, আর এক অংশের বড়ো বেশি লাঘব হয়েছে। এ তো সহ্য হয় না, তাই ইন্দ্রদেবের বজ্র গড়গড় ক'রে ওঠে, পবনদেবের ভেঁপু হু হু ক'রে হুঙ্কার দিতে থাকে। যতক্ষণ প্রতিবেশীদের মধ্যে সাম্যসাধন না হয়, হাওয়ায় হাওয়ায় পংক্তি ভেদ ঘুচে না যায়, ততক্ষণ শান্তি হয় না, ততক্ষণ দেবতার রাগ মেটে না। যাদের মধ্যে পরস্পর মিলে চল্‌বার সম্বন্ধ, তাদের মধ্যে ভেদ ঘট্‌লেই তুমুলকাণ্ড বেধে যায়। তখন ঐ যে অরণ্যটার গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয়ে যায়, ঐ যে সমুদ্রটা পাগ্‌লামি কর্‌তে থাকে, তাদের দোষ দিয়ে বা তাদের কাছে শান্তিশতক আউড়িয়ে কোনো ফল নেই। কান পেতে শুনে নাও, স্বর্গে মর্ত্ত্যে এই রব উঠ্‌ল, "ভেদ ঘটেছে, ভেদ ঘটেছে।"

এই হাওয়ার মধ্যে যে কথা, মানুষের মধ্যেও তাই। বাইরে থেকে যারা কাছাকাছি, ভিতরের থেকে তাদের যদি ভেদ ঘট্‌ল, তাহোলে ঐ ভেদটাই হোলো মূল বিপদ্‌। যতক্ষণ সেটা আছে, ততক্ষণ ইন্দ্রদেবের বজ্রকে, ঊনপঞ্চাশ পবনের চপেটাঘাতকে, বৈধ বা অবৈধ আন্দোলনের দ্বারা দমন কর্‌বার চেষ্টা ক'রে ঝড়ের আন্দোলন কিছুতেই থামানো যায় না।

আমরা যখন বলি স্বাধীনতা চাই, তখন কী চাই সেটা ভেবে দেখা চাই। মানুষ যেখানে সম্পূর্ণ একলা, সেইখানে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সেখানে তার কারো সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই, কারো কাছে কোনো দায়িত্ব নেই, কারো প্রতি কোনো নির্ভর নেই, সেখানে তার স্বাতন্ত্র্যে লেশমাত্র হস্তক্ষেপ কর্‌বার কোনো মানুষই নেই। কিন্তু মানুষ এ স্বাধীনতা কেবল যে চায় না, তা নয়; পেলে বিষম দুঃখ বোধ করে। রবিন্‌সন্ ক্রুসো তার জনহীন দ্বীপে যতখন একেবারে একলা ছিল ততখন সে একেবারে স্বাধীন ছিল। যখনই ফ্রাইডে এল তখনই তার সেই

একান্ত স্বাধীনতা চলে গেল। তখন ফ্রাইডের সঙ্গে তার একটা পরস্পর সম্বন্ধ বেধে গেল। সম্বন্ধ মাত্রেই অধীনতা। এমন কি, প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধে প্রভুও ভৃত্যের অধীন। কিন্তু রবিন্‌সন্ ক্রুসো ফ্রাইডের সঙ্গে পরস্পর-দায়িত্বে জড়িত হয়েও নিজের স্বাধীনতার ক্ষতিজনিত দুঃখ কেন বোধ করে নি? কেননা, তাদের সম্বন্ধের মধ্যে ভেদের বাধা ছিল না। সম্বন্ধের মধ্যে ভেদ আসে কোথায়? যেখানে অবিশ্বাস আসে, ভয় আসে, যেখানে উভয়ে উভয়কে ঠকিয়ে জিৎতে চায়, যেখানে উভয়ের সঙ্গে উভয়ের ব্যবহারে সহজভাব থাকে না। ফ্রাইডে যদি হিংস্র বর্ব্বর অবিশ্বাসী হোত, তাহোলে তার সম্বন্ধে রবিন্‌সন্ ক্রুসোর স্বাধীনতা নষ্ট হোত। যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পূর্ণতা নেই, অর্থাৎ যার প্রতি আমি উদাসীন, সে আমাকে টেনে রাখে না, কিন্তু তাই ব'লেই যে তারই সম্পর্কে আমি স্বাধীনতার যথার্থ আনন্দ ভোগ করি তা নয়। যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পূর্ণতা, যে আমার পরম বন্ধু, সুতরাং যে আমাকে বাঁধে আমার চিত্ত তারই সম্বন্ধের মধ্যে স্বাধীনতা পায়, কোনো বাধা পায় না। যে স্বাধীনতা সম্বন্ধহীনতায়, সেটা নেতিসূচক, সেই শূন্যতামূলক স্বাধীনতায় মানুষকে পীড়া দেয়। এর কারণ হচ্চে, অসম্বন্ধ মানুষ সত্য নয়, অন্যের সঙ্গে, সকলের সঙ্গে সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই সে নিজের সত্যতা উপলব্ধি করে। এই সত্যতা উপলব্ধির বাধায় অর্থাৎ সম্বন্ধের ভেদে, অসম্পূর্ণতায়, বিকৃতিতেই তার স্বাধীনতার বাধা। কেননা, ইতিসূচক স্বাধীনতাই মানুষের যথার্থ স্বাধীনতা। মানুষের গার্হস্থ্যের মধ্যে বা রাজ্যের মধ্যে বিপ্লব বাধে কখন, না, যখন পরস্পরের সহজ সম্বন্ধের বিপর্য্যয় ঘটে। যখন ভাইদের মধ্যে সন্দেহ বা ঈর্ষা বা লোভ প্রবেশ ক'রে তাদের সম্বন্ধকে পীড়িত করতে থাকে, তখন তারা পরস্পরের মধ্যে বাধা পায়, কেবলি ঠোকর খেয়ে খেয়ে পড়ে, তাদের জীবনযাত্রার প্রবাহ

পদে পদে প্রতিহত হয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তখন পরিবারে বিপ্লব ঘটে। রাষ্ট্রবিপ্লবও সম্বন্ধভেদের বিপ্লব। কারণ সম্বন্ধভেদেই অশান্তি, সেই অশান্তিতেই স্বাধীনতার ক্ষতি। আমাদের ধর্ম্মসাধনাতেও কোন্ মুক্তিকে মুক্তি বলে? যে মুক্তিতে অহঙ্কার দূর ক'রে দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে চিত্তের পূর্ণ যোগ সাধন করে। তার কারণ, বিশ্বের সঙ্গে যোগেই মানুষ সত্য—এইজন্যে সেই সত্যের মধ্যেই মানুষ যথার্থ স্বাধীনতা পায়। আমরা একান্ত স্বাধীনতার শূন্যতাকে চাইনে, আমরা ভেদ ঘুরিয়ে দিয়ে সম্বন্ধের পরিপূর্ণতাকে চাই, তাকেই বলি মুক্তি। যখন দেশের স্বাধীনতা চাই, তখন নেতিসূচক স্বাধীনতা চাইনে, তখন দেশের সকল লোকের সঙ্গে সম্বন্ধকে যথাসম্ভব সত্য ও বাধামুক্ত করতে চাই। সেটা হয় ভেদের কারণ দূর ক'রে দিয়ে, কিন্তু সে কারণ ভিতরেও থাকতে পারে, বাইরেও থাকতে পারে। আমরা পশ্চিমের ইতিহাসে পড়েছি, সেখানকার লোকেরা স্বাধীনতা চাই ব'লে প্রায় মাঝে মাঝে কোলাহল তুলেছে। আমরাও সেই কোলাহলের অনুকরণ করি, আমরাও বলি স্বাধীনতা চাই। আমাদের এই কথাটি স্পষ্ট ক'রে বুঝতে হবে যে য়ুরোপ যখন বলেছে স্বাধীনতা চাই তখন বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কারণে তার সমাজ-দেহের মধ্যে ভেদের দুঃখ ঘটেছিল—সমাজবর্ত্তী লোকদের মধ্যে কোনো-না-কোনো বিষয়ে কোনো-না-কোনো আকারে সম্বন্ধের বিচ্ছেদ বা বিকৃতি ঘটেছিল, সেইটেকে দূর করার দ্বারাই তারা মুক্তি পেয়েছে। আমরাও যখন বলি স্বাধীনতা চাই তখন ভাবতে হবে কোন্ ভেদটা আমাদের দুঃখ-অকল্যাণের কারণ—নইলে স্বাধীনতা শব্দটা কেবল ইতিহাসের বুলিরূপে ব্যবহার করে কোনো ফল হবে না। যারা ভেদকে নিজেদের মধ্যে ইচ্ছা ক'রে পোষণ করে তারা স্বাধীনতা চায় এ কথার কোনো অর্থ ই নেই। সে কেমন হয়, না, মেজবৌ বলছেন যে তিনি স্বামীর মুখ

দেখ্‌তে চান্ না, সন্তানদের দূরে রাখ্‌তে চান প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশা কর্‌তে চান না, কিন্তু বড়ো বৌয়ের হাত থেকে ঘরকর্‌না নিজের হাতে কেড়ে নিতে চান।

য়ুরোপের কোনো কোনো দেশে দেখেছি রাষ্ট্রবিপ্লব ঘ'টে তার থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভাবন হয়েছে। গোড়াকার কথাটা এই যে, তাদের মধ্যে শাসিত ও শাসয়িতা এই দুই দলের মধ্যে ভেদ ঘটেছিল। সে ভেদ জাতিগত ভেদ নয়, শ্রেণীগত ভেদ। সেখানে একদিকে রাজা ও রাজপুরুষ, অন্যদিকে প্রজা যদিচ একই জাতের মানুষ, তবু তাদের মধ্যে অধিকারের ভেদ অত্যন্ত বেশি হয়ে উঠেছিল। এইজন্যে তাদের বিপ্লবের একটি মাত্র কাজ ছিল, এই শ্রেণীগত ভেদটাকে রাষ্ট্রনৈতিক শেলাইয়ের কলে বেশ পাকারকম শেলাই ক'রে ঘুচিয়ে দেওয়া। আজ আবার সেখানে দেখ্‌ছি, আরেকটা বিপ্লবের হাওয়া বইছে। খোঁজ কর্‌তে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে বাণিজ্যক্ষেত্রে যারা টাকা খাটাচ্চে, আর যারা মজুর খাট্‌ছে, তাদের মধ্যে অধিকারের ভেদ অত্যন্ত বেশি। এই ভেদে পীড়া ঘটায়, সেই পীড়ায় বিপ্লব। ধনীরা ভীত হয়ে উঠে' কর্ম্মীরা যাতে ভালো বাসস্থান পায়, যাতে তাদের ছেলেপুলেরা লেখা-পড়া শিখ্‌তে পারে, যাতে তারা সকল বিষয়ে কতকটা পরিমাণে আরামে থাকে দয়া ক'রে মাঝে মাঝে সে চেষ্টা করে, কিন্তু তবু ভেদ যে রয়ে গেল; ধনীর অনুগ্রহের ছিটে-ফোঁটায় সেই ভেদ তো ঘোচে না, তাই আপদ্‌ও মিট্‌তে চায় না।

বহুকাল হোলো ইংলণ্ড থেকে একদল ইংরেজ আমেরিকায় গিয়ে বসতি করে। ইংলণ্ডের ইংরেজ সমুদ্রপার থেকে আমেরিকার ইংরেজের উপর শাসন বিস্তার করেছিল; এই শাসনের দ্বারা সমুদ্রের দুই পারের ভেদ মেটেনি। এ ক্ষেত্রে নাড়ির টানের চেয়ে দড়ির

টানটাই প্রবল হওয়াতে বন্ধন জোর ক'রে ছিঁড়ে ফেল্‌তে হয়েছিল।
অথচ এখানে দুই পক্ষই সহোদর ভাই।

একদিন ইটালিতে অষ্ট্রিয়ান ছিল রাষ্ট্রের মুড়োয়, আর ইটালিয়ান ছিল ল্যাজায়। অথচ ল্যাজায় মুড়োয় প্রাণের যোগ ছিল না। এই প্রাণহীন বন্ধন ভেদকেই দুঃসহরূপে প্রকাশ করেছিল। ইটালি তার থেকে মুক্তিলাভ ক'রে সমাস্যার সমাধান করেছে।

তা হোলে দেখা যাচ্চে ভেদের দুঃখ থেকে ভেদের অকল্যাণ থেকে মুক্তিই হচ্চে মুক্তি। এমন কি, আমাদের দেশের ধর্ম্মসাধনার মূল কথাটা হচ্চে ঐ,—তাতে বলে—ভেদবুদ্ধিতেই অসত্য, সেই ভেদবুদ্ধি ঘুচিয়ে দিলেই সত্যের মধ্যে আমাদের পরিত্রাণ।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি বিধাতার পরীক্ষাশালায় সব পরীক্ষার্থীর একই প্রশ্ন নয়। ভেদ এক রকম নয়। এক পায়ে খড়ম আরেক পায়ে বুট, সে এক রকমের ভেদ; এক পা বড়ো আরেক পা ছোটো, সে আরেক রকমের ভেদ; পায়ের হাড় ভেঙে গিয়ে পায়ের এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের বিচ্ছেদ, সে অন্য রকমের ভেদ; এই সব রকম ভেদই স্বাধীন-শক্তি-যোগে চলাফেরা করায় বাধা দেয়। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভেদের প্রতিকার ভিন্ন রকমের। খড়ম-পায়ের কাছ থেকে তার প্রশ্নের উত্তর চুরি ক'রে নিয়ে ভাঙা-পা নিজের ব'লে চালাতে গেলে তার বিপদ্ আরো বাড়িয়ে তুল্‌তে পারে।

ঐ যে পূর্ব্বেই বলেছি একদা ইংরেজ-জাতের মধ্যে ভেদের যে ছিন্নতা ছিল সেটাকে একটা রাষ্ট্রনৈতিক শেলাইয়ের কল দিয়ে তারা পাকা ক'রে জুড়েছে। কিন্তু যেখানে কাপড়টা তৈরিই হয়নি, সুতোগুলো কতক আলাদা হয়ে কতক জটা পাকিয়ে পড়ে আছে, সেখানে রাষ্ট্রনৈতিক শেলাইয়ের কলের কথা ভাবাই চলে না, সেখানে আরো গোড়ায় যেতে

হয়, সেখানে সমাজনৈতিক তাঁতে চড়িয়ে বহু সুতোকে এক অখণ্ড কাপড়ে পরিণত করা চাই। তাতে বিলম্ব হবে, কিন্তু শেলাইয়ের কলে কিছুতেই বিলম্ব সারা যায় না।

শিবঠাকুরের তিনটি বধূ সম্বন্ধে ছড়ায় বল্‌ছে :—

এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান,
এক কন্যে না পেয়ে বাপের বাড়ী যান।

তিন কন্যেরই আহারের সমান প্রয়োজন ছিল,—কিন্তু দ্বিতীয় কন্যেটি যে সহজ উপায়ে আহার করেছিলেন, বিশেষ কারণে তৃতীয় কন্যের সেটা আয়ত্তাধীন ছিল না; অতএব উদর এবং আহার-সমস্যার পূরণ তিনি অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত উপায়ে কর্‌তে বাধ্য হয়েছিলেন,—বাপের বাড়ি ছুটেছিলেন। প্রথম কন্যের ক্ষুধানিবৃত্তি সম্বন্ধে পুরাবৃত্তের বিবরণটি অস্পষ্ট। আমার বিশ্বাস, তিনি আয়োজন মাত্র করেছিলেন, আর মধ্যমাটি তার ফলভোগ ক'রে পরিতৃপ্ত হয়েছেন। ইতিহাসে এরকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

আমাদের এই জন্মভূমিটি শিবঠাকুরের মধ্যমা প্রেয়সী নন, সে-কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে। বহু শতাব্দী ধরে বারবার তার পরিচয় পাওয়া গেল। কাজেই লক্ষ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে মধ্যমার পথটি তাঁর পথ হোতেই পারে না। হয় তিনি রাঁধেন নি অথচ ভোজের দাবী করেছেন, শেষে শিব-ঠাকুরের ধমক খেয়ে সনাতন বাপের বাড়ির দিকে চল্‌তে চল্‌তে বেলা বইয়ে দিয়েছেন নয়তো রেঁধেছেন, বেড়েছেন, কিন্তু খাবার বেলায় দেখেছেন আরেকজন পাত শূন্য ক'রে দিয়েছে। অতএব তাঁর পক্ষে সমস্যা হচ্চে, যে কারণে এমনটা ঘটে, আর যে কারণে তিনি কথায় কথায় শিব-ঠাকুরকে চটিয়ে তোলেন, সেটা সর্ব্বাগ্রে দূর ক'রে

দেওয়া ;—আব্দার ক'রে বল্লেই হবে না যে, মেজ-বউ যেমন ক'রে খাচ্চে আমি ঠিক তেমনি ক'রে খাব।

আমরা সর্ব্বদাই ব'লে থাকি বিদেশী আমাদের রাজা, এই দুঃখ ঘুচলেই আমাদের সব দুঃখ ঘুচবে। বিদেশী রাজা আমি পছন্দ করিনে। পেট-জোড়া পিলেও আমার পছন্দসই নয়। কিন্তু অনেকদিন থেকে দেখ্‌ছি পিলেটি আমার সম্মতির অপেক্ষা না ক'রে আপনি এসে পেট জুড়ে বসেছে। বহুযত্নে অন্তরের প্রকোষ্ঠে তাকে পালন করলেও বিপদ্ আবার রাগের মাথায় ঘুষি মেরে তাকে ফাটিয়ে দিলেও সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা বলেন, তোমাদের আশে পাশে চারদিকেই ম্যালেরিয়াবাহিনী ডোবা, সেইগুলো ভরাট না করলে তোমার পিলের ভরাট ছুটবে না। মুস্কিলের ব্যাপার এই যে, পিলের উপরেই আমাদের যত রাগ, ডোবার উপরে নয়। আমরা বলি, আমাদের সনাতন ডোবা, ওগুলি যদি লুপ্ত হয় তা হোলে ভূতকালের পবিত্র পদচিহ্নের গভীরতাই লোপ পাবে। সেই গভীরতা বর্ত্তমানের অবিরল অশ্রুধারায় কানায় কানায় পূর্ণ হয় হোক, কিন্তু আমাদের লোকালয় চিরদিন যেন ডোবায় ডোবায় শতধা হয়ে থাকে।

পাঠকেরা অধৈর্য্য হয়ে বল্‌বেন, আর ভূমিকা নয়, এখন আমাদের বিশেষ সমস্যাটা কী ব'লেই ফেলো। বল্‌তে সঙ্কোচ হচ্চে; কারণ, কথাটা অত্যন্ত বেশি সহজ। শুনে সবাই অশ্রদ্ধা ক'রে বল্‌বেন—ও তো সবাই জানে। এইজন্যেই রোগের পরিচয় সম্বন্ধে ডাক্তার-বাবু অনিদ্রা না ব'লে যদি ইন্‌সম্‌নিয়া বলেন, তা হোলে মনে হয় তাঁকে ষোলো টাকা ফি দেওয়া ষোলো আনা সার্থক হোলো। আসল কথা, আমরা এক নই, আমাদের নিজেদের মধ্যে ভেদের অন্ত নেই। প্রথমেই বলেছি—ভেদটাই দুঃখ, ঐটেই পাপ। সে ভেদ বিদেশীর সঙ্গেই

হোক আর স্বদেশীর সঙ্গেই হোক। সমাজটাকে একটা ভেদবিহীন বৃহৎ দেহের মতো ব্যবহার করতে পারি কখন? যখন তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে বোধশক্তি ও কর্ম্মশক্তির প্রাণগত যোগ থাকে; যখন তার পা কাজ করলে হাত তার ফল পায়, হাত কাজ করলে পা তার ফল পায়। কল্পনা করা যাক, সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিছাড়া ভুলে দেহের আকৃতিধারী এমন একটা অপদার্থ তৈরি হয়েছে যার প্রত্যেক বিভাগের চারদিকে নিষেধের বেড়া; যার ডান-চোখে বাঁ-চোখে, ডান-হাতে বাঁ-হাতে ভাসুর ভাদ্রবৌয়ের সম্পর্ক, যার পায়ের শিরার রক্ত বুকের কাছে উঠতে গেলেই দাব্‌ড়ানি খেয়ে ফিরে যায়, যার তর্জ্জনীটা কড়ে-আঙুলের সঙ্গে এক পংক্তিতে কাজ করতে গেলে প্রায়শ্চিত্তের দায়িক হয়, যার পায়ে তেল মালিশের দরকার হোলে ডান-হাত হরতাল ক'রে বসে। এই অত্যন্ত নড়বড়ে পদার্থটা অন্য পাড়ার দেহটার মতো সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পায় না। সে দেখে অন্য দেহটা জুতো জামা পরে লাঠি ছাতা নিয়ে পথে অপথে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। তখন সে ভাবে যে, ঐ দেহটার মতো জুতো জামা লাঠি ছাতা জুটলেই আমার সব দুঃখ ঘুচ্‌বে। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তার ভুলের পরে নিজের ভুল যোগ ক'রে দিয়ে সংশোধন চলে না। জুতো পেলেও তার জুতো খসে পড়্‌বে, ছাতি পেলেও তার ছাতি হাওয়ায় দেবে উড়িয়ে, আর মনের মতো লাঠি যদি সে কোনোমতে জোগাড় করতে পারে অন্য পাড়ার দেহটি সে লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে তার নড়বড়ে জীবলীলার প্রহসনটাকে হয়তো ট্র্যাজেডিতে সমাপ্ত ক'রে দিতে পারে। এখানে জুতো জামা ছাতি লাঠির অভাবটাই সমস্যা নয়, প্রাণগত ঐক্যের অভাবটাই সমস্যা। কিন্তু বিধাতার উক্ত দেহরূপী বিদ্রূপটি হয়তো ব'লে থাকে যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনৈক্যের কথাটা এখন চাপা থাক, আপাতত সবার আগে

যদি কোনো গতিকে একটা জামা জোগাড় ক'রে নিয়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকতে পারি তাহোলে সেই জামাটার ঐক্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঐক্য আপনা-আপনি ঘটে উঠ্‌বে। আপনিই ঘটবে এ কথা বলা হচ্চে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। এই ফাঁকি সর্ব্বনেশে : কেন না, নিজকৃত ফাঁকিকে মানুষ ভালোবাসে, তাকে যাচাই ক'রে দেখ্‌তেই প্রবৃত্তি হয় না।

মনে আছে, আমার বয়স যখন অল্প ছিল তখন দেশে দুই বিরোধী-পক্ষের মধ্যে একটা তর্ক প্রায় শোনা যেত,—আমরা কি নেশন, না, নেশন নই। কথাটা সম্পূর্ণ বুঝ্‌তুম তা বল্‌তে পারিনে, কিন্তু আমরা নেশন নই এ-কথা যে-মানুষ বল্‌ত রাজা হোলে তাকে জেলে দিতুম, সমাজপতি হোলে তার ধোবা নাপিত বন্ধ করতুম। তার প্রতি অহিংস্র-ভাব রক্ষা করা আমার পক্ষে কঠিন হোত। তখন এ সম্বন্ধে একটা বাঁধা তর্ক এই ছিল যে, সুইজর্‌ল্যাণ্ডে তিন ভিন্ন জাত পাশাপাশি রয়েছে তবুও তো তারা এক নেশন, তবে আর কী! শুনে ভাবতুম,—যাক্, ভয় নেই। কিন্তু মুখে ভয় নেই বল্‌লেও আসলে ভয় ঘোচে কই। ফাঁসির আসামীকে তার মোক্তার যখন বলেছিল—"ভয় কী, দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়ো" তখন সে সান্ত্বনা পায়নি ; কেননা দুর্গা বল্‌তে সে রাজি কিন্তু ঐ ঝুলে পড়াটাতেই আপত্তি। সুইজর্‌ল্যাণ্ডের লোকেরাও নেশন, আর আমরাও নেশন, এ কথা কেবল তর্কে সাব্যস্ত ক'রে সান্ত্বনাটা কী,—ফলের বেলায় দেখি আমরা ঝুলে পড়েছি আর তারা মাটির উপর খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। রাধিকা চালুনীতে ক'রে জল এনে কলঙ্ক ভঞ্জন করেছিলেন। যে হতভাগিনী নারী রাধিকা নয় তারও চালুনীটা আছে, কিন্তু তার কলঙ্ক ভঞ্জন হয় না, উল্টোই হয়। মূলে যে প্রভেদ থাকাতে ফলের এই প্রভেদ, সেই কথাটাই ভাববার কথা। সুইজর্‌ল্যাণ্ডে ভেদ যতগুলোই থাক, ভেদবুদ্ধি তো নেই। সেখানে পরস্পরের মধ্যে রক্ত-

বিমিশ্রণে কোনো বাধা নেই ধর্ম্মে বা আচারে বা সংস্কারে। এখানে সে বাধা এত প্রচণ্ড যে, অসবর্ণ বিবাহের আইনগত বিঘ্ন দূর করবার প্রস্তাব হবামাত্র হিন্দুসমাজপতি উদ্বেগে ঘর্ম্মাক্তকলেবর হয়ে হর্‌তাল কর্‌বার ভয় দেখিয়েছিলেন। সকলের চেয়ে গভীর আত্মীয়তার ধারা নাড়ীতে বয়, মুখের কথায় বয় না। যাঁরা নিজেদের এক মহাজাত ব'লে কল্পনা করেন, তাঁদের মধ্যে সেই নাড়ীর মিলনের পথ ধর্ম্মের শাসনে চিরদিনের জন্যে যদি অবরুদ্ধ থাকে, তাহোলে তাঁদের মিলন কখনই প্রাণের মিলন হবে না, সুতরাং সকলে এক হয়ে প্রাণ দেওয়া তাঁদের পক্ষে সহজ হোতে পার্‌বে না। তাঁদের প্রাণ যে এক প্রাণ নয়। আমার কোনো বন্ধু ভারতের প্রত্যন্ত-বিভাগে ছিলেন। সেখানে পাঠান্‌ দস্যুরা মাঝে মাঝে হিন্দু লোকালয়ে চড়াও হয়ে স্ত্রী হরণ ক'রে থাকে। একবার এই রকম ঘটনায় আমার বন্ধু কোনো স্থানীয় হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সমাজের উপর এমন অত্যাচার তোমরা সহ্য করো কেন? সে নিতান্ত উপেক্ষার সঙ্গে বল্‌লে, "উয়ো তো বেনিয়াকী লড়্‌কী।" "বেনিয়াকী লড়কী" হিন্দু, আর যে ব্যক্তি তার হরণ-ব্যাপারে উদাসীন সেও হিন্দু, উভয়ের মধ্যে শাস্ত্রগত যোগ থাকতে পারে কিন্তু প্রাণগত যোগ নেই। সেইজন্যে একের আঘাত অন্যের মর্ম্মে গিয়ে বাজে না। জাতীয় ঐক্যের আদিম অর্থ হচ্চে জন্মগত ঐক্য, তার চরম অর্থও তাই।

যেটা অবাস্তব, কোনোমতেই তার উপরে কোনো বড়ো সিদ্ধির পত্তন করা যায় না। মানুষ যখন দায়ে পড়ে, তখন আপনাতে আপনি ফাঁকি দিয়ে আপনার কাছ থেকে কাজ উদ্ধার কর্‌বার চেষ্টা ক'রে থাকে। বিভ্রান্ত হয়ে মনে করে, নিজেকে বাম-হাতে ফাঁকি দিয়ে ডান-হাতে লাভ করা যেতেও পারে। আমাদের রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধনার

মূলে একটা মস্ত জাতীয় অবাস্তবতা আছে সে-কথা আমরা ভিতরে ভিতরে সবাই জানি—সেইজন্যে সেদিকটাকে আমরা অগোচরে রেখে তার উপরে স্বাজাত্যের যে জয়স্তম্ভ গড়ে তুলতে চাই তার মাল-মসলাটাকেই খুব প্রচুর ক'রে গোচর করতে ইচ্ছা করি। কাঁচা ভিৎকে মালমসলার বাহুল্য দিয়ে উপস্থিতমতো চাপা দিলেই সে তো পাকা হয়ে ওঠে না। বরঞ্চ একদিন সেই বাহুল্যেরই গুরুভারে ভিতের দুর্ব্বলতা ভীষণরূপে সপ্রমাণ হয়ে পড়ে। খেলাফতের ঠেকো-দেওয়া সন্ধিবন্ধনের পর আজকের দিনে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মূলে ভুল থাকলে কোনো উপায়েই স্থূলে সংশোধন হোতে পারে না। এসব কথা শুনলে অধৈর্য্য হয়ে কেউ কেউ ব'লে ওঠেন, "আমাদের চারদিকে যে বিদেশী তৃতীয় পক্ষ শত্রুরূপে আছে সেই আমাদের মধ্যে ভেদ ঘটাচ্চে অতএব দোষ আমাদের নয়, দোষ তারই। ইতিপূর্ব্বে আমরা হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি নির্ব্বিরোধেই ছিলুম কিন্তু ইত্যাদি ইত্যাদি।" শাস্ত্রে বলে, কলি শনি ব্যাধি মানুষের ছিদ্র খোঁজে। পাপের ছিদ্র পেলেই তারা ভিতরে প্রবেশ ক'রে সর্ব্ব-নাশের পালা আরম্ভ ক'রে দেয়। বিপদটা বাইরের, আর পাপটা আমার, এই কারণে বিপদের প্রতি ক্রোধ ও পাপের প্রতি মমতা করাই হচ্চে সকল বিপদের সেরা।

জাহাজের খোলের মধ্যে ফাটল ছিল, যতদিন ঝড় তুফান ছিল না ততদিন সে জাহাজ খেয়া দিয়েছে। মাঝে মাঝে লোনা জল সেঁচতেও হয়েছিল, কিন্তু সে দুঃখটা মনে রাখবার মতো নয়। যেদিন তুফান উঠ্‌ল, সেদিন খোলের ফাটল বেড়ে বেড়ে জাহাজ-ডুবি আসন্ন হয়েছে। কাপ্তেন যদি বলে—যত দোষ ঐ তুফানের, অতএব সকলে মিলে ঐ তুফানটাকে উচ্চৈঃস্বরে গাল পাড়ি, আর

আমার ফাটলটি যেমন ছিল তেমনই থাক্; তা হোলে ঐ কাপ্তেনের মতো নেতাটি পারে নিয়ে যাবে না, তলায় নিয়ে যাবে। তৃতীয়পক্ষ যদি আমাদের শত্রুপক্ষই হয়, তাহোলে এই কথাটা মনে রাখ্‌তে হবে তারা তুফানরূপে আমাদের ফাটল মেরামতের কাজে লাগ্‌তে আসেনি। তারা ভয়ঙ্কর বেগে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে কোন্‌খানে আমাদের তলা কাঁচা। দুর্ব্বলাত্মাকে বাস্তবের কথাটা তারা ডাইনে বাঁয়ে চাপড় মেরে মেরে স্মরণ করিয়ে দেবে। বুঝিয়ে দেবে ডাইনের সঙ্গে বাঁয়ের যার মিল নেই রসাতলের রাস্তা ছাড়া আর সব রাস্তাই তার পক্ষে বন্ধ। এক-কথায় তারা শিরিষের আঠার ঢেউ নয়, তারা লবণাম্বু। যতক্ষণ তাদের উপর রাগারাগি ক'রে বৃথা মেজাজ খারাপ ও সময় নষ্ট করূছি ততক্ষণ যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে ফাটল বন্ধ করার কাজে লাগ্‌লে পরিত্রাণের আশা থাকে। বিধাতা যদি আমাদের সঙ্গে কৌতুক কর্‌তে চান, বর্ত্তমান তৃতীয় পক্ষের তুফানটাকে আপাতত দমিয়ে দিতেও পারেন—কিন্তু তুফানের সম্পূর্ণ বংশলোপ ক'রে সমুদ্রকে ডোবা বানিয়ে দেবেন আমাদের মতো ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুরও এতবড়ো আব্‌দার তিনি শুন্‌বেন না। অতএব কাপ্তেনদের কাছে দোহাই পাড়্‌ছি যেন তাঁরা কণ্ঠস্বরে ঝড়ের গর্জ্জনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে ফাটল-মেরামতের কথাটা একেবারে চাপা না দেন।

কাপ্তেনরা বলেন—সেদিকে যে আমাদের লক্ষ্য আছে তার একটা প্রমাণ দেখো যে, যদিও আমরা সনাতন-পন্থী তবু আমরা স্পর্শদোষ সম্বন্ধে দেশের লোকের সংস্কার দূর কর্‌তে চাই। আমি বলি এহ বাহ্য। স্পর্শদোষ তো আমাদের ভেদবুদ্ধির একটিমাত্র বাহ্য লক্ষণ। যে সনাতন ভেদবুদ্ধির বনস্পতি আমাদের পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে তার থেকে একটি কাঠি ভেঙে নিলেই তো পথ খোলসা হবে না।

আমি পূর্ব্বে অন্যত্র বলেছি, ধর্ম্ম যাদের পৃথক করে তাদের মেল্‌বার দরজায় ভিতর দিক্ থেকে আগল দেওয়া। কথাটা পরিষ্কার ক'রে বল্‌বার চেষ্টা করি। সকলেই ব'লে থাকে—ধর্ম্মশব্দের মূল অর্থ হচ্চে যা আমাদের ধারণ করে। অর্থাৎ আমাদের যে-সকল আশ্রয় ধ্রুব, তারা হচ্চে ধর্ম্মের অধিকারভুক্ত। তাদের সম্বন্ধে তর্ক নেই। এই-সকল আশ্রয়ের কোনো পরিবর্ত্তন ঘটে না। এদের সঙ্গে ব্যবহারে যদি চঞ্চলতা করি, কথায় কথায় যদি মত বদল ও পথ বদল করতে থাকি, তাহোলে বাঁচিনে।

কিন্তু সংসারের এমন একটা বিভাগ আছে যেখানে পরিবর্ত্তন চল্‌ছে, যেখানে আকস্মিকের আনাগোনার অন্ত নেই, সেখানে নূতন নূতন অবস্থার সম্বন্ধে নূতন ক'রে বারে বারে আপোষ-নিষ্পত্তি না করলে আমরা বাঁচিনে। এই নিত্য-পরিবর্ত্তনের ক্ষেত্রে ধ্রুবকে অধ্রুবের জায়গায়, অধ্রুবকে ধ্রুবের জায়গায় বসাতে গেলে বিপদ্ ঘটবেই। যে মাটির মধ্যে গাছ শিকড় চালিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, শিকড়ের পক্ষে সেই ধ্রুব মাটি খুব ভালো, কিন্তু তাই ব'লে ডালপালাগুলোকেও মাটির মধ্যে পুঁতে ফেলা কল্যাণকর নয়। পৃথিবী নিত্য আমাকে ধারণ করে, পৃথিবী ধর্ম্মের মতো ধ্রুব হোলেই আমার পক্ষে ভালো—তার নড়চড় হোতে থাকলেই সর্ব্বনাশ। আমার গাড়িটাও আমাকে ধারণ করে, সেই ধারণ ব্যাপারটাকে যদি ধ্রুব ক'রে তুলি, তাহোলে গাড়ি আমার পক্ষে পৃথিবী হবে না, পিঁজরে হবে। অবস্থা বুঝে আমাকে পুরোণো গাড়ি বেচতে হয় বা মেরামত করতে হয়, নতুন গাড়ি কিনতে হয় বা ভাড়া করতে হয়, কখনো বা গাড়িতে ঢুকতে হয়, কখনো বা গাড়ি থেকে বেরতে হয়, আর গাড়িটা কাৎ হবার ভাব দেখালে তার থেকে লাফিয়ে পড়্‌বার জন্যে বিধান নেবার পূর্ব্বে ভাটপাড়ায় সইস পাঠাতে

হয় না। ধর্ম্ম যখন বলে—মুসলমানের সঙ্গে মৈত্রী করো, তখন কোনো তর্ক না ক'রেই কথাটাকে মাথায় ক'রে নেব। ধর্ম্মের এ কথাটা আমার কাছে মহাসমুদ্রের মতোই নিত্য। কিন্তু ধর্ম্ম যখন বলে—মুসলমানের ছোঁওয়া অন্ন গ্রহণ করবে না, তখন আমাকে প্রশ্ন করতেই হবে—কেন করব না? একথাটা আমার কাছে ঘড়ার জলের মতো অনিত্য. তাকে রাখ্‌ব কি ফেল্‌ব সেটার বিচার যুক্তির দ্বারা। যদি বলো, এসব কথা স্বাধীন বিচারের অতীত, তাহোলে শাস্ত্রের সমস্ত বিধানের সাম্‌নে দাঁড়িয়েই বল্‌তে হবে,—বিচারের যোগ্য বিষয়কে যারা নির্বিচারে গ্রহণ করে তাদের প্রতি সেই দেবতার ধিক্কার আছে "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন। তারা পাণ্ডাকে দেবতার চেয়ে বেশি ভয় ও শ্রদ্ধা করে, এমনি ক'রে তারা দেবপূজার অপমান করতে কুণ্ঠিত হয় না।

সংসারের যে ক্ষেত্রটা বুদ্ধির ক্ষেত্র সেখানে বুদ্ধির যোগেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্য মিলন সম্ভবপর। সেখানে অবুদ্ধির উৎপাত বিষম বাধা। সে যেন মানুষের বাসার মধ্যে ভূতুড়ে কাণ্ড। কেন, কী বৃত্তান্ত, ব'লে ভূতের কোনো জবাবদিহী নেই। ভূত বাসা তৈরি করে না, বাসা-ভাড়া দেয় না, বাসা ছেড়েও যায় না। এত বড়ো জোর তার কিসের? না, সে বাস্তব নয়, অথচ আমার ভীরু মন তাকে বাস্তব ব'লে মেনে নিয়েছে। প্রকৃত বাস্তব যে, সে বাস্তবের নিয়মে সংযত, যদি বা সে বাড়ি-ভাড়া নাও কবুল করে, অন্তত সরকারী ট্যাক্সো দিয়ে থাকে। অবাস্তবকে বাস্তব ব'লে মান্‌লে তাকে জ্ঞানের কোনো নিয়মে পাওয়া যায় না। সেইজন্যে কেবল বুক দুরদুর করে, গা ছমছম করে, আর বিনা বিচারে মেনেই চলি। যদি কেউ প্রশ্ন করে "কেন", জবাব দিতে পারিনে, কেবল পিঠের দিকে বুড়োআঙুলটা দেখিয়ে দিয়ে বলি

"ঐ যে।" তার পরেও যদি বলে "কই যে?" তাকে নাস্তিক ব'লে তাড়া ক'রে যাই। মনে ভাবি, গোঁয়ারটা বিপদ্ ঘটালে বুঝি,—ভূতকে অবিশ্বাস করলে যদি সে ঘাড় মট্‌কে দেয়! তবুও যদি প্রশ্ন ওঠে "কেন?" তাহোলে উত্তরে বলি, "আর যেখানেই কেন খাটাও, এখানে খাটাতে এসো না বাপু, মানে মানে বিদায় হও। মর্‌বার পরে তোমাকে পোড়াবে কে সে ভাবনাটা ভেবে রেখে দিয়ো।"

চিত্তরাজ্যে যেখানে বুদ্ধিকে মানি সেখানে আমার স্বরাজ; সেখানে আমি নিজেকে মানি, অথচ সেই মানার মধ্যে সর্ব্বদেশের ও চিরকালের মানবচিত্তকে মানা আছে। অবুদ্ধিকে যেখানে মানি সেখানে এমন একটা সৃষ্টিছাড়া শাসনকে মানি যা না আমার না সর্ব্বমানবের। সুতরাং সে একটা কারাগার, সেখানে কেবল আমার মতো হাত-পা-বাঁধা এক-কারায় অবরুদ্ধ অকাল-জরাগ্রস্তদের সঙ্গেই আমার মিল আছে, বাইরের কোটি কোটি স্বাধীন লোকদের সঙ্গে কোনও মিল নেই। বৃহতের সঙ্গে এই ভেদ থাকাটাই হচ্চে বন্ধন। কেননা পূর্ব্বেই বলেছি ভেদটাই সকলদিক থেকে আমাদের মূল বিপদ ও চরম অমঙ্গল। অবুদ্ধি হচ্চে ভেদবুদ্ধি, কেননা চিত্তরাজ্যে সে আমাদের সকল মানবের থেকে পৃথক ক'রে দেয়, আমরা একটা অদ্ভুতের খাঁচায় ব'সে কয়েকটা শেখানো বুলি আবৃত্তি ক'রে দিন কাটাই।

জীবনযাত্রায় পদে পদেই অবুদ্ধিকে মানা যাদের চিরকালের অভ্যাস, চিত্রগুপ্তের কোনো একটা হিসাবের ভুলে হঠাৎ তারা স্বরাজের স্বর্গে গেলেও তাদের ঢেঁকিলীলার শাস্তি হবে না, সুতরাং পর-পদপীড়নের তালে তালে তারা মাথা কুটে মর্‌বে, কেবল মাঝে মাঝে পদযুগলের পরিবর্ত্তন হবে এইমাত্র প্রভেদ।

যন্ত্রচালিত বড়ো বড়ো কারখানায় মানুষকে পীড়িত ক'রে যন্ত্রবৎ

করে ব'লে আমরা আজকাল সর্ব্বদাই তাকে কটূক্তি ক'রে থাকি। এই উপায়ে পশ্চিমের সভ্যতাকে গাল পাড়ছি জেনে মনে বিশেষ সান্ত্বনা পাই। কারখানায় মানুষের এমন পঙ্গুতা কেন ঘটে; যে-হেতু সেখানে তার বুদ্ধিকে ইচ্ছাকে কর্ম্মকে একটা বিশেষ সঙ্কীর্ণ ছাঁচে ঢালা হয়, তার পূর্ণ বিকাশ হোতে পারে না। কিন্তু লোহা দিয়ে গড়া কলের কারখানাই একমাত্র কারখানা নয়। বিচারহীন বিধান লোহার চেয়ে শক্ত, কলের চেয়ে সঙ্কীর্ণ। যে বিপুল ব্যবস্থাতন্ত্র অতি নিষ্ঠুর শাসনের বিভীষিকা সর্ব্বদা উদ্যত রেখে বহুযুগ ধরে বহুকোটি নরনারীকে যুক্তিহীন ও যুক্তিবিরুদ্ধ আচারের পুনরাবৃত্তি করতে নিয়ত প্রবৃত্ত রেখেছে সেই দেশ-জোড়া মানুষ-পেষা জাঁতা-কল কি কলহিসাবে কারো চেয়ে খাটো। বুদ্ধির স্বাধীনতাকে অশ্রদ্ধা ক'রে এতবড়ো সুসম্পূর্ণ সুবিস্তীর্ণ চিত্তশূন্য বজ্রকঠোর বিধিনিষেধের কারখানা মানুষের রাজ্যে আর কোনোদিন আর কোথাও উদ্ভাবিত হয়েছে ব'লে আমি তো জানিনে। চট-কল থেকে যে পাটের বস্তা তৈরি হয়ে বেরোয়, জড়ভাবে বোঝা গ্রহণ করবার জন্যেই তার ব্যবহার। মানুষ-পেষা কল থেকে ছাঁটা-কাটা যে-সব অতি ভালোমানুষ পদার্থের উৎপত্তি হয় তারাও বাহিরের বোঝা বইতেই আছে। একটা বোঝা খালাস হোতেই আরেকটা বোঝা তাদের অধিকার ক'রে বসে।

প্রাচীন ভারত একদিন যখন বিধাতার কাছে বর চেয়েছিলেন তখন বলেছিলেন—"স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু"—"য একঃ অবর্ণঃ"—যিনি এক, যিনি বর্ণ-ভেদের অতীত, তিনি আমাদের শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন। তখন ভারত ঐক্য চেয়েছিলেন কিন্তু পোলিটিকাল বা সামাজিক কলে-গড়া ঐক্যের বিড়ম্বনা চান নি। "বুদ্ধ্যা শুভয়া" শুভবুদ্ধির দ্বারাই মিলতে চেয়েছিলেন, অন্ধতার লম্বা শিকলের দ্বারা নয়, বিচারহীন বিধানের কঠিন কানমলার দ্বারা নয়।

সংসারে আকস্মিকের সঙ্গে মানুষকে সর্ব্বদাই নতুন ক'রে বোঝা-পড়া করতেই হয়। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির সেই কাজটাই খুব বড়ো কাজ। আমরা বিশ্ব সৃষ্টিতে দেখ্‌তে পাই, আকস্মিক—বিজ্ঞানে যাকে variation বলে—আচম্‌কা এসে পড়ে। প্রথমটা সে থাকে একঘরে', কিন্তু বিশ্বনিয়ম তাকে বিশ্বছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে সবার ক'রে নেন, অথচ সে এক নূতন বৈচিত্র্যের প্রবর্ত্তন করে! মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে, মানুষের সমাজে, আকস্মিক প্রায়ই অনাহূত এসে পড়ে। তার সঙ্গে যে-রকম ব্যবহার করলে এই নূতন আগন্তুকটি চারদিকের সঙ্গে সুসঙ্গত হয়, অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধিকে, রুচিকে, চারিত্রকে, আমাদের কাণ্ডজ্ঞানকে পীড়িত অবমানিত না করে, সতর্ক বুদ্ধি দ্বারাতেই সেটা সাধন করতে হয়। মনে করা যাক একদা এক ফকীর বিশেষ প্রয়োজনে রাস্তার মাঝখানে খুঁটি পুঁতে তাঁর ছাগলটাকে বেঁধে হাট করতে গিয়েছিলেন। হাটের কাজ সারা হোলো, ছাগলটারও একটা চরম সদ্গতি হয়ে গেল। উচিত ছিল এই আকস্মিক খুঁটিটাকে সর্ব্বকালীনের খাতিরে রাস্তার মাঝখান থেকে উদ্ধার করা। কিন্তু উদ্ধার করবে কে? অবুদ্ধি করে না, কেন না, তার কাজ হচ্চে যা আছে তাকেই চোখ বুজে স্বীকার করা;—বুদ্ধিই করে, যা নূতন এসেছে তার সম্বন্ধে সে বিচারপূর্ব্বক নূতন ব্যবস্থা করতে পারে। যে দেশে, যা আছে তাকেই স্বীকার করা, যা ছিল তাকেই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা সনাতন পদ্ধতি, সে দেশে খুঁটিটা শত শত বৎসর ধরে রাস্তার মাঝখানেই রয়ে গেল। অবশেষে একদিন খামকা কোথা থেকে একজন ভক্তিগদ্গদ মানুষ এসে তার গায়ে একটু সিঁদুর লেপে তার উপর একটা মন্দির তুলে বসল। তার পর থেকে বছর বছর পঞ্জিকাতে ঘোষণা দেখা গেল—শুক্লপক্ষের কার্ত্তিক-সপ্তমীতে যে ব্যক্তি খুঁটীশ্বরীকে এক সের ছাগদুগ্ধ ও তিন তোলা

রজত দিয়ে পূজা দেয় তার সেই পূজা ত্রিকোটি কুলমুদ্ধরেৎ। এম্‌নি ক'রে অবুদ্ধির রাজত্বে আকস্মিক খুঁটি সমস্তই সনাতন হয়ে ওঠে, লোক-চলাচলের রাস্তায় চলার চেয়ে বাঁধা প'ড়ে থাকাটা সহজ হয়ে ওঠে। যাঁরা নিষ্ঠাবান তাঁরা বলেন, আমরা বিধাতার বিশেষ সৃষ্টি, অন্য কোনো জাতের সঙ্গে আমাদের মেলে না, অতএব রাস্তা বন্ধ হোলেও আমাদের চলে কিন্তু খুঁটি না থাক্‌লে আমাদের ধর্ম্ম থাকে না। যারা খুঁটীশ্বরীকে মানেও না, এমন কি, যারা বিদেশী ভাবুক, তারাও বলে, "আহা এ'কেই তো বলে আধ্যাত্মিকতা ; নিজের জীবনযাত্রার সমস্ত সুযোগ-সুবিধাই এরা মাটি কর্‌তে রাজি, কিন্তু মাটি থেকে একটা খুঁটি এক ইঞ্চি পরিমাণও ওপ্‌ড়াতে চায় না।" সেই সঙ্গে এও বলে, "আমাদের বিশেষত্ব অন্য রকমের, অতএব আমরা এদের অনুকরণ কর্‌তে চাইনে, কিন্তু এরা যেন হাজার খুঁটিতে ধর্ম্মের বেড়াজালে এই রকম বাঁধা হয়ে অত্যন্ত শান্ত সমাহিত হয়ে পড়ে থাকে। কারণ, এটি দূর থেকে দেখতে বড়ো সুন্দর।"

সৌন্দর্য্য নিয়ে তর্ক করতে চাইনে। সেটা রুচির কথা। যেমন ধর্ম্মের নিজের অধিকারে ধর্ম্ম বড়ো, তেমনি সুন্দরের নিজের অধিকারে সুন্দর বড়ো। আমার মতো অর্ব্বাচীনেরা বুদ্ধির অধিকারের দিক থেকে প্রশ্ন করবে, এমনতরো খুঁটি-কণ্টকিত পথ দিয়ে কখনো স্বাতন্ত্র্যসিদ্ধির রথ কি এগোতে পারে ? বুদ্ধির অভিমানে বুক বেঁধে নব্যতন্ত্রী প্রশ্ন করে বটে, কিন্তু রাত্রে আর ঘুম হয় না। যে-হেতু, গৃহিণীরা স্বস্ত্যয়নের আয়োজন ক'রে বলেন, "ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর, কী জানি কোন্ খুঁটি কোন্ দিন বা দৃষ্টি দেয়। তোমরা চুপ ক'রে থাকো না। কলিকালে খুঁটি নাড়া দেবার মতো ডান্‌পিটে ছেলের তো অভাব নেই।" শুনে আমাদের মতো নিছক আধুনিকদেরও বুক ধুকধুক করতে থাকে,

কেননা রক্তের ভিতর থেকে সংস্কারটাকে তো ছেঁকে ফেল্‌তে পারিনে। কাজেই পরের দিন ভোর-বেলাতেই এক সেরের বেশি ছাগদুগ্ধ তিন তোলার বেশি রজত খরচ ক'রে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

এই তো গেল আমাদের সবচেয়ে প্রধান সমস্যা। যে বুদ্ধির রাস্তায় কর্ম্মের রাস্তায় মানুষ পরস্পরে মিলে সমৃদ্ধির পথে চল্‌তে পারে সেইখানে খুঁটি গেড়ে থাকার সমস্যা; যাদের মধ্যে সর্ব্বদা আনাগোনার পথ সকল রকমে খোলসা রাখতে হবে তাদের মধ্যে অসংখ্য খুঁটির বেড়া তুলে পরস্পরের ভেদকে বহুধা ও স্থায়ী ক'রে তোলার সমস্যা; বুদ্ধির যোগে যেখানে সকলের সঙ্গে যুক্ত হোতে হবে, অবুদ্ধির অচল বাধায় সেখানে সকলের সঙ্গে চিরবিচ্ছিন্ন হবার সমস্যা; খুঁটিরূপিণী ভেদবুদ্ধির কাছে ভক্তিভরে বিচার-বিবেককে বলিদান করবার সমস্যা! ভাবুক লোকে এই সমস্যার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ছলছল নেত্রে বলেন, আহা, এখানে ভক্তিটাই হোলো বড়ো কথা এবং সুন্দর কথা, খুঁটিটা তো উপলক্ষ্য; আমাদের মতো আধুনিকেরা বলে, এখানে বুদ্ধিটাই হোলো বড়ো কথা, সুন্দর কথা, খুঁটিটাও জঞ্জাল, ভক্তিটাও জঞ্জাল।—কিন্তু আহা, গৃহিণী যখন অশুভ-আশঙ্কায় করজোড়ে গলবস্ত্র হয়ে দেবতার কাছে নিজের ডান-হাত বাঁধা রেখে আসেন, তার কি অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য! আধুনিক বলে, সেখানে ডান-হাত উৎসর্গ করা সার্থক, যেখানে তাতে নেই অন্ধতা, যেখানে তাতে আছে সাহস, সেখানেই তার মাধুর্য্য;—কিন্তু যেখানে অশুভ-আশঙ্কা মূঢ়তা-রূপে দীনতা-রূপে তার কুশ্রী-কবলে সেই মাধুর্য্যকে গিলে খাচ্চে, সুন্দর সেখানে পরাস্ত, কল্যাণ সেখানে পরাহত।

আমাদের আর-একটি প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান এত দুঃসাধ্য তার কারণ দুই পক্ষই মুখ্যত আপন আপন ধর্ম্মের দ্বারাই অচলভাবে আপনাদের সীমা-নির্দ্দেশ করেছে। সেই ধর্ম্মই তাদের

মানববিশ্বকে শাদা-কালো ছক কেটে দুই সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত করেছে, আত্ম ও পর। সংসারে সর্ব্বত্রই আত্মপরের মধ্যে কিছু-পরিমাণে স্বাভাবিক ভেদ আছে। সেই ভেদের পরিমাণটা অতিমাত্র হোলেই তাতে অকল্যাণ হয়। বুশম্যান জাতীয় লোক পরকে দেখবামাত্র তাকে নির্ব্বিশেষে বিষবাণ দিয়ে মারে। তার ফল হচ্চে পরের সঙ্গে সত্য মিলনে মানুষের যে-মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হয় বুশম্যানের তা হোতে পারেনি, সে চূড়ান্ত বর্ব্বরতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। এই ভেদের মাত্রা যে-জাতির মধ্যে অন্তরের দিক থেকে যতই কমে এসেছে সেই জাতি ততই উচ্চ-শ্রেণীর মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হোতে পেরেছে। সে-জাতি সকলের সঙ্গে যোগে চিন্তার কর্ম্মের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করতে পেরেছে।

হিন্দু নিজেকে ধর্ম্মপ্রাণ ব'লে পরিচয় দেয়, মুসলমানও তাই দেয়। অর্থাৎ ধর্ম্মের বাহিরে উভয়েরই জীবনের অতি অল্প অংশই অবশিষ্ট থাকে। এই কারণে এরা নিজ নিজ ধর্ম্ম দ্বারাই পরস্পরকে ও জগতের অন্য সকলকে যথাসম্ভব দূরে ঠেকিয়ে রাখে। এই যে দূরত্বের ভেদ এরা নিজেদের চারি দিকে অত্যন্ত মজবুৎ ক'রে গেঁথে রেখেছে, এতে ক'রে সকল মানুষের সঙ্গে সত্য-যোগে মনুষ্যত্বের যে প্রসার হয় তা এদের মধ্যে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ধর্ম্মগত ভেদবুদ্ধি সত্যের অসীম স্বরূপ থেকে এদের সঙ্কীর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছে। এইজন্যেই মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে নিত্য-সত্যের চেয়ে বাহ্য-বিধান কৃত্রিম-প্রথা এদের মধ্যে এত প্রবল হয়ে উঠেছে।

পূর্ব্বেই বলেছি—মানব-জগৎ এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের দ্বারাই আত্ম ও পর এই দুই ভাগে অতিমাত্রায় বিভক্ত হয়েছে। সেই পর চিরকাল পর হয়ে থাক্ হিন্দুর এই ব্যবস্থা, সেই পর, সেই ম্লেচ্ছ বা অন্ত্যজ কোনো ফাঁকে তার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে না পড়ে এই তার

ইচ্ছা। মুসলমানের তরফে ঠিক এর উল্টো। ধর্ম্মগণ্ডীর বহির্বর্ত্তী পরকে সে খুব তীব্র ভাবেই পর ব'লে জানে, কিন্তু সেই পরকে সেই কাফেরকে বরাবরকার মতো ঘরে টেনে এনে আটক করতে পারলেই সে খুসী। এদের শাস্ত্রে কোনো একটা খুঁটে বের-করা শ্লোক কী বলে, সেটা কাজের কথা নয়, কিন্তু লোকব্যবহারে এদের এক পক্ষ শত শত বৎসর ধ'রে ধর্ম্মকে আপন দুর্গম দুর্গ ক'রে পরকে দূরে ঠেকিয়ে আত্মগত হয়ে আছে, আর অপর পক্ষ ধর্ম্মকে আপন ব্যূহ বানিয়ে পরকে আক্রমণ ক'রে তাকে ছিনিয়ে এনেছে। এতে ক'রে এদের মনঃপ্রকৃতি দুই রকম ছাঁদের ভেদবুদ্ধিতে একেবারে পাকা হয়ে গেছে। বিধির বিধানে এমন দুই দল ভারতবর্ষে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রধান স্থান অধিকার ক'রে নিয়েছে ;—আত্মীয়তার দিক থেকে মুসলমান হিন্দুকে চায় না, তাকে কাফের ব'লে ঠেকিয়ে রাখে, আত্মীয়তার দিক থেকে হিন্দুও মুসলমানকে চায় না, তাকে ম্লেচ্ছ ব'লে ঠেকিয়ে রাখে।

একটা জায়গায় দুই পক্ষ ক্ষণে ক্ষণে মেল্‌বার চেষ্টা করে সে হচ্চে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে। শিবঠাকুরের ছড়াটা যদি আজ সম্পূর্ণ পাওয়া যেত তাহোলে দেখা যেত ঐ যে প্রথমা কন্যাটি রাঁধেন বাড়েন অথচ খেতে পান না, আর সেই যে তৃতীয়া কন্যাটি না খেয়ে বাপের বাড়ি যান, এদের উভয়ের মধ্যে একটা সন্ধি ছিল, সে হচ্চে ঐ মধ্যমা কন্যাটির বিরুদ্ধে। কিন্তু যেদিন মধ্যমা কন্যা বাপের বাড়ি চলে যেত সেদিন অবশিষ্ট দুই সতীন, এই দুই পোলিটিকাল allyদের মধ্যে চুলোচুলি বেধে উঠত। পদ্মার ঝড়ের সময় দেখেছি কাক ফিঙে উভয়েই চরের মাটির উপর চঞ্চু আট্‌কাবার চেষ্টায় একেবারে গায়ে গায়ে পাখা ঝট্‌পট্‌ করেছে। তাদের এই সাযুজ্য দেখে তাড়াতাড়ি মুগ্ধ হবার দরকার নেই। ঝড়ের সময় যতক্ষণ এদের সন্ধি স্থায়ী হয়েছে তার চেয়ে বহুদীর্ঘকাল

এরা পরস্পরকে ঠোকর মেরে এসেছে। বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান মেলেনি। কেননা, বাংলার অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গ করার দুঃখটা তাদের কাছে বাস্তব ছিল না। আজ অসহকার আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যোগ দিয়েছে, তার কারণ রুম-সাম্রাজ্যের অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গীকরণের দুঃখটা তাদের কাছে বাস্তব। এমনতরো মিলনের উপলক্ষটা কখনই চিরস্থায়ী হোতে পারে না। আমরা সত্যত মিলিনি, আমরা একদল পূর্ব্বমুখ হয়ে, অন্যদল পশ্চিমমুখ হয়ে কিছুক্ষণ পাশাপাশি পাখা ঝাপটেছি। আজ সেই পাখার ঝাপট বন্ধ হোলো, এখন উভয় পক্ষের চঞ্চু এক-মাটি কামড়ে না থেকে পরস্পরের অভিমুখে সবেগে বিক্ষিপ্ত হচ্চে। রাষ্ট্রনৈতিক অধিনেতারা চিন্তা করছেন আবার কী দিয়ে এদের চঞ্চু দুটোকে ভুলিয়ে রাখা যায়। আসল ভুলটা রয়েছে অস্থিতে মজ্জাতে, তাকে ভোলাবার চেষ্টা ক'রে ভাঙা যাবে না। কম্বল চাপা দিয়ে যে মনে ভাবে বরফটাকে গরম ক'রে তোলা গেল সে একদিন দেখতে পায় তাতে ক'রে তার শৈত্যটাকে স্থায়ী করা গেছে।

হিন্দুতে মুসলমানে কেবল যে এই ধর্ম্মগত ভেদ তা নয়, তাদের উভয়ের মধ্যে একটা সামাজিক শক্তির অসমকক্ষতা ঘটেচে। মুসলমানের ধর্ম্মসমাজের চিরাগত নিয়মের জোরেই তার আপনার মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্য জমে উঠেছে, আর হিন্দুর ধর্ম্মসমাজের সনাতন অনুশাসনের প্রভাবেই তার আপনার মধ্যে একটা প্রবল অনৈক্য ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। এর ফল এই যে, কোনোও বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও হিন্দু নিজেকেই মারে, আর প্রয়োজন থাক্‌লেও হিন্দু অন্যকে মারতে পারে না। আর মুসলমান কোনো বিশেষ প্রয়োজন না ঘটলেও নিজেকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে, আর প্রয়োজন ঘটলে অন্যকে বেদম মার দিতে পারে। তার কারণ এ নয় মুসলমানের গায়ে জোর আছে,

হিন্দুর নেই, ; তার আসল কারণ, তাদের সমাজের জোর আছে, হিন্দুর নেই। একদল আভ্যন্তরিক বলে বলী, আর একদল আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতায় নির্জ্জীব। এদের মধ্যে সমকক্ষভাবে আপোষ ঘটবে কী ক'রে? অত্যন্ত দুর্য্যোগের মুখে ক্ষণকালের জন্যে তা সম্ভব, কিন্তু যেদিন অধিকারের ভাগ-বাটোয়ারার সময় উপস্থিত হয় সেদিন সিংহের ভাগটা বিসদৃশ রকম বড়ো হয়ে ওঠে, তার কারণটা তার থাবার মধ্যে। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধে যখন সমস্ত ইংরেজ জাতের মুখশ্রী পাংশুবর্ণ হয়ে উঠেছিল, তখন আমাদের মতো ক্ষীণপ্রাণ জাতকেও তারা আদর ক'রে সহায়তার জন্যে ডেকেছিল। শুধু তাই নয়, ঘোর বিষয়ী লোকেরও যেমন শ্মশান-বৈরাগ্যে কিছুক্ষণের জন্যে নিষ্কাম বিশ্বপ্রেম জন্মায়, তেমনি যুদ্ধশেষের কয়েক দণ্ড পরেও রক্ত-আহুতি-যজ্ঞে তাদের সহযোগী ভারতীয়দের প্রতি তাদের মনে দাক্ষিণ্যেরও সঞ্চার হয়েছিল। যুদ্ধের ধাক্কাটা এল নরম হয়ে, আর তার পরেই দেখা দিল জালিয়ান-বাগে দানবলীলা, আর তার পরে এল কেনিয়ায় সাম্রাজ্যের সিংহদ্বারে ভারতীয়দের জন্যে অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা। রাগ করি বটে, কিন্তু সত্য সমকক্ষ না হয়ে উঠ্‌লে সমকক্ষের ব্যবহার পাওয়া যায় না। এই কারণেই মহাত্মাজি খুব একটা ঠেলা দিয়ে প্রজাপক্ষের শক্তিটাকে রাজ-পক্ষের অনুভবযোগ্য ক'রে তোল্‌বার চেষ্টা করেছেন। উভয়পক্ষের মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তিই তাঁর লক্ষ্য ছিল। এই আপোষ-নিষ্পত্তি সবল-দুর্ব্বলের একান্ত ভেদ থাক্‌লে হোতেই পারে না। আমরা যদি ধর্ম্মবলে রাজার সিংহাসনে ভূমিকম্প ঘটাতে পারতুম, তা হোলে রাজার বাহুবল একটা ভালো রকম রফা করবার জন্যে আপনিই আমাদের ডাক পাড়্‌ত। ভারতবর্ষে হিন্দুতে মুসলমানে প্রতিনিয়তই পরস্পর রফা-নিষ্পত্তির কারণ ঘটবে। অসমকক্ষতা থাক্‌লে সে নিষ্পত্তি নিয়তই বিপত্তির আকার ধারণ

করবে। ঝরণার জল পানের অধিকার নিয়ে একদা বাঘ ও মেষের মধ্যে একটা আপোষের কন্‌ফারেন্স বসেছিল। ঈশপের কথামালায় তার ইতিহাস আছে। উপসংহারে প্রবলতর চতুষ্পদটি তর্কের বিষয়টাকে কী রকম অত্যন্ত সরল ক'রে এনেছিল সে-কথা সকলেরই জানা আছে। ভারতবর্ষের কল্যাণ যদি চাই তা হোলে হিন্দুমুসলমানে কেবল যে মিলিত হোতে হবে তা নয়, সমকক্ষ হোতে হবে। সেই সমকক্ষতা তাল-ঠোকা পালোয়ানির ব্যক্তিগত সমকক্ষতা নয়, উভয়পক্ষের সামাজিক শক্তির সমকক্ষতা।

মালাবারে মোপ্‌লাতে-হিন্দুতে যে কুৎসিত কাণ্ড ঘটেছিল সেটা ঘটেছিল খিলাফৎ-সূত্রে হিন্দুমুসলমানের সন্ধির ভরা জোয়ারের মুখেই। যে দুই পক্ষে বিরোধ, তারা সুদীর্ঘকাল থেকেই ধর্ম্মের ব্যবহারকে নিত্য-ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে এসেছে। নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম মুসলমানকে ঘৃণা করেছে, মোপ্‌লা-মুসলমানের ধর্ম্ম নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করেছে। আজ এই দুই পক্ষের কন্‌গ্রেস্-মঞ্চঘটিত ভ্রাতৃভাবের জীর্ণ মসলার দ্বারা তাড়াতাড়ি অল্প কয়েক দিনের মধ্যে খুব মজবুৎ ক'রে পোলিটিকাল সেতু বানাবার চেষ্টা বৃথা। অথচ আমরা বারবারই ব'লে আস্‌ছি আমাদের সনাতন ধর্ম্ম যেমন আছে তেম্‌নিই থাক্‌, আমরা অবাস্তবকে দিয়েই বাস্তব ফল লাভ করব, তার পরে ফললাভ হোলে আপনিই সমস্ত গলদ সংশোধন হয়ে যাবে। বাজিমাৎ ক'রে দিয়ে তার পরে চালের কথা ভাবব, আগে স্বরাট্ হব, তার পরে মানুষ হব।

মালাবার-উৎপাত সম্বন্ধে এই তো গেল প্রথম কথা। তার পরে দ্বিতীয় কথা হচ্চে হিন্দুমুসলমানের অসমকক্ষতা। ডাক্তার মুঞ্জে এই উপদ্রবের বিবরণ আলোচনা ক'রে দক্ষিণের হিন্দুসমাজগুরু শঙ্করাচার্য্যের কাছে একটি রিপোর্ট্ পাঠিয়েছেন ; তাতে বলেছেন :—

"The Hindus of Malabar are generally speaking mild and docile, and have come to entertain such a mortal fear of the Moplas that the moment any such trouble arises, the only way of escape the Hindus can think of, is to run for life leaving their children and womenfolk behind, to take care of themselves as best as they could, thinking perhaps honestly that if the Moplas attack them without any previous molestation God, the Almighty and the Omniscient, is there to teach them a lesson and even to take a revenge on their behalf."

ডাক্তার মুঞ্জের এ-কথাটির মানে হচ্চে এই যে হিন্দু ঐহিককে ঐহিকের নিয়মে ব্যবহার করতে অভ্যাস করেনি, সে নিত্যে অনিত্যে খিঁচুড়ি পাকিয়ে বুদ্ধিটাকে দিয়েছে জলে। বুদ্ধির জায়গায় বিধি, এবং আত্মশক্তির জায়গায় ভগবান্‌কে দাঁড় করিয়ে দিয়ে এরা আত্মাবমাননায় স্বয়ং ভগবানের অবমাননা করে ব'লেই দুঃখ পায়, সে কথা মনের জড়ত্ব-বশতই বোঝে না।

ডাক্তার মুঞ্জের রিপোর্টের আরেকটা অংশে তিনি বল্‌ছেন, আটশো বৎসর আগে মালাবারের হিন্দু রাজা ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীদের পরামর্শে তাঁর রাজ্যে আরবদের বাস-স্থাপনের জন্যে বিশেষভাবে সুবিধা ক'রে দিয়েছিলেন। এমন কি, হিন্দুদের মুসলমান-করবার কাজে তিনি আরবদের এতদূর প্রশ্রয় দিয়েছিলেন যে তাঁর আইন-মতে প্রত্যেক জেলে-পরিবার থেকে একজন হিন্দুকে মুসলমান হোতেই হোত। এর প্রধান কারণ ধর্ম্মপ্রাণ রাজা ও তাঁর মন্ত্রীরা সমুদ্র-যাত্রা ধর্ম্মবিরুদ্ধ ব'লেই মেনে নিয়ে-

ছিলেন; তাই, মালাবারের সমুদ্রতীরবর্ত্তী রাজ্য রক্ষার ভার সেই-সকল মুসলমানের হাতেই ছিল, সমুদ্রযাত্রার বৈধতা সম্বন্ধে যারা বুদ্ধিকে মান্‌ত, মনুকে মান্‌ত না। বুদ্ধিকে না মেনে অবুদ্ধিকে মানাই যাদের ধর্ম্ম, রাজাসনে বসেও তারা স্বাধীন হয় না। তারা কর্ম্মের মধ্যাহ্নকালেও সুপ্তির নিশীথ রাত্রি বানিয়ে তোলে। এই জন্যেই তাদের

"ঠিক দুপ্‌প'র বেলা

ভূতে মারে ঢেলা।"

মালাবারের রাজা একদা নিজে রাজার মুখোস মাত্র প'রে অবুদ্ধিকে রাজাসন ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই অবুদ্ধি মালাবারের হিন্দু-সিংহাসনে এখনো রাজা আছে। তাই হিন্দু এখনো মার খায় আর উপরের দিকে তাকিয়ে বলে—ভগবান্ আছেন। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে আমরা অবুদ্ধিকে রাজা ক'রে দিয়ে তার কাছে হাত জোড় ক'রে আছি। সেই অবুদ্ধির রাজত্বকে, সেই বিধাতার বিধি-বিরুদ্ধ ভয়ঙ্কর ফাঁকটাকে কখনো পাঠান কখনো মোগল কখনো ইংরেজ এসে পূর্ণ ক'রে বস্‌ছে। বাইরের থেকে এদের মারটাকেই দেখ্‌তে পাচ্ছি, কিন্তু এরা হোলো উপলক্ষ্য। এরা এক একটা ঢেলা মাত্র, এরা ভূত নয়।—আমরা মধ্যাহ্নকালের আলোতেও বুদ্ধির চোখ বুজিয়ে দিয়ে অবুদ্ধির ভূতকে ডেকে এনেছি, সমস্ত তারই কর্ম্ম। তাই ঠিক দুপপ'র বেলায় যখন জাগ্রত বিশ্বসংসার চিন্তা কর্‌ছে, কাজ কর্‌ছে, তখন পিছন দিক থেকে কেবল আমাদেরই পিঠের উপর

ঠিক দুপপ'র বেলা

ভূতে মারে ঢেলা।

আমাদের লড়াই ভূতের সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবুদ্ধির সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবাস্তবের সঙ্গে। সেই আমাদের চারিদিকে ভেদ এনেছে, সেই আমাদের কাঁধের উপর পরবশতাকে চড়িয়ে দিয়েছে—

সেই আমাদের এতদূর অন্ধ ক'রে দিয়েছে যে যখন চীৎকার-শব্দে ঢেলাকে গাল পেড়ে গলা ভাঙ্‌ছি তখন সেই ভূতটাকে পরমাত্মীয় পরমারাধ্য ব'লে, তাকেই আমাদের সমস্ত বাস্তুভিটে দেবত্র ক'রে ছেড়ে দিয়েছি। ঢেলার দিকে তাকালে আমাদের পরিত্রাণের আশা থাকে না, কেননা জগতে ঢেলা অসংখ্য, ঢেলা পথে ঘাটে, ঢেলা একটা ফুরোলে হাজারটা আসে, কিন্তু ভূত একটা। সেই ভূতটাকে ঝেড়ে ফেল্‌তে পার্‌লে ঢেলা-গুলো পায়ে পড়ে থাকে, গায়ে পড়ে না। ভারতবর্ষের সেই পুরাতন প্রার্থনাকে আজ আবার সমস্ত প্রাণমন দিয়ে উচ্চারণ কর্‌বার সময় এসেছে, শুধু কণ্ঠ দিয়ে নয়, চিন্তা দিয়ে কর্ম্ম দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে, পরস্পরের প্রতি ব্যবহার দিয়ে,—"য একঃ অবর্ণঃ" যিনি এক এবং সকল বর্ণভেদের অতীত, "স ন বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু" তিনিই আমাদের শুভবুদ্ধি দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত করুন ॥

১৩৩০

সমাধান

সমস্যার দিকে কেউ যদি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে, অমনি দেশের কৃতী অকৃতী সকলে সেই ব্যক্তিকেই সমাধানের জন্য দায়িক ক'রে জবাব চেয়ে বসে। তারা বলে—আমরা তো একটা তবু যাহোক কিছু সমাধানে লেগেছি, তুমিও এম্‌নি একটা সমাধান খাড়া করো, দেখা যাক্ তোমারি বা কত বড়ো যোগ্যতা।

আমি জানি, কোনও ঔষধ-সত্রে এক বিলাতী ডাক্তার ছিলেন। তাঁর কাছে এক বৃদ্ধ এসে করুণস্বরে যেম্‌নি বলেছে, "জ্বর", অম্‌নি তিনি ব্যস্ত হয়ে তখনি তাকে একটা অত্যন্ত তিতো জ্বরঘ্নরস গিলিয়ে দিলেন—সে লোকটা হাঁপিয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু আপত্তি কর্‌বার সময় মাত্র পেল না। সেই সঙ্কটের সময়ে আমি যদি ডাক্তারকে বাধা দিয়ে বলতুম, জ্বর ওর নয়, জ্বর ওর মেয়ের—তা হোলে কি ডাক্তার রেগে আমাকে বল্‌তে পার্‌তেন যে "তবে তুমিই চিকিৎসা করো না; আমি তো তবু যা হয় একটা কোনো ওষুধ যাকে হয় একজনকে খাইয়েছি, তুমি তো কেবল ফাঁকা সমালোচনাই কর্‌লে।" আমার এইটুকু মাত্র বল্‌বার কথা যে, "আসল সমস্যাটা হচ্চে, বাপের জ্বর নয় মেয়ের জ্বর, অতএব বাপকে ওষুধ খাওয়ালে এ সমস্যার সমাধান হবে না।"

কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সুবিধার কথাটা এই যে, আমি যেটাকে সমস্যা ব'লে নির্ণয় কর্‌ছি, সে আপন সমাধানের ইঙ্গিত আপনিই প্রকাশ কর্‌ছে।—অবুদ্ধির প্রভাবে আমাদের মন দুর্ব্বল, অবুদ্ধির প্রভাবে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন; শুধু বিচ্ছিন্ন নই, পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ; অবুদ্ধির

প্রভাবে বাস্তব জগৎকে বাস্তবভাবে গ্রহণ করতে পারিনে ব'লেই জীবনযাত্রায় আমরা প্রতিনিয়ত পরাহত; অবুদ্ধির প্রভাবে স্ববুদ্ধির প্রতি আস্থা হারিয়ে আন্তরিক স্বাধীনতার উৎসমুখে আমরা দেশজোড়া পরবশতার পাথর চাপিয়ে বসেছি। এইটেই যখন আমাদের সমস্যা তখন এর সমাধান 'শিক্ষা' ছাড়া আর কিছুই হোতে পারে না।

আজকাল আমরা এই একটা বুলি ধরেছি, ঘরে যখন আগুন লেগেছে তখন শিক্ষাদীক্ষা সব ফেলে রেখে সর্ব্বাগ্রে আগুন নেবাতে কোমর বেঁধে দাঁড়ানো চাই; অতএব সকলকেই চর্‌কায় সুতো কাট্‌তে হবে। আগুন লাগ্‌লে আগুন নেবানো চাই এ-কথাটা আমার মতো মানুষের কাছেও দুর্ব্বোধ নয়। এর মধ্যে দুরূহ ব্যাপার হচ্চে, কোন্‌টা আগুন সেইটে স্থির করা; তারপরে স্থির করতে হবে কোন্‌টা জল। ছাইটাকেই আমরা যদি আগুন বলি তাহোলে ত্রিশকোটি ভাণ্ডাকুলো লাগিয়েও সে আগুন নেবাতে পার্‌ব না। নিজের চর্‌কার সুতো, নিজের তাঁতের কাপড় আমরা যে ব্যবহার করতে পার্‌ছিনে সেটা আগুন নয়, সেটা ছাইয়ের একটা অংশ অর্থাৎ আগুনের চরম ফল। নিজের তাঁত চালাতে থাক্‌লেও এ আগুন জ্বল্‌তে থাক্‌বে। বিদেশী আমাদের রাজা এটাও আগুন নয় এটা ছাই; বিদেশীকে বিদায় করলেও আগুন জ্বল্‌বে—এমন কি স্বদেশী রাজা হোলেও দুঃখদহনের নিবৃত্তি হবে না। এমন নয় যে, হঠাৎ আগুন লেগেছে, হঠাৎ নিবিয়ে ফেল্‌ব। হাজার বছরের উর্দ্ধকাল যে আগুন দেশটাকে হাড়ে মাসে জ্বালাচ্চে, আজ স্বহস্তে সুতো কেটে কাপড় বুন্‌লেই সে আগুন দুদিনে বশ মান্‌বে এ-কথা মেনে নিতে পারিনে। আজ দুশো-বছর আগে চর্‌কা চলেছিল, তাঁতও বন্ধ হয়নি, সেই সঙ্গে আগুনও দাউ-দাউ ক'রে জ্বল্‌ছিল। সেই আগুনের জ্বালানি-কাঠটা হচ্চে ধর্ম্মে কর্ম্মে অবুদ্ধির অন্ধতা।

যেখানে বর্ব্বর অবস্থায় মানুষ ছাড়া-ছাড়া হয়ে থাকে, সেখানে বনে জঙ্গলে ফল মূল খেয়ে চলে; কিন্তু যেখানে বহুলোকের সমাবেশে সভ্যতার বিচিত্র উদ্যম প্রকাশ পেতে চায়, সেখানে ব্যাপক ক্ষেত্র জুড়ে বেশ ভালোরকম ক'রে চাষ করা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। সকল বড়ো সভ্যতারই অন্নরূপের আশ্রয় হচ্চে কৃষিক্ষেত্র। কিন্তু সভ্যতার একটা বুদ্ধিরূপ আছে, সে তো অন্নের চেয়ে বড়ো বই ছোটো নয়। ব্যাপক-ভাবে সর্ব্বসাধারণের মনের ক্ষেত্র কর্ষণ ক'রে বিচিত্র ও বিস্তীর্ণভাবে বুদ্ধিকে ফলিয়ে তুলতে পার্‌লে তবেই সে সভ্যতা মনস্বী হয়। কিন্তু যেখানে অধিকাংশ লোক মূঢ়তায় আবিষ্ট হয়ে অন্ধসংস্কারের নানা বিভীষিকায় সর্ব্বদা ত্রস্ত হয়ে গুরু-পুরোহিত-গণৎকারের দরজায় অহরহ ছুটোছুটি ক'রে মর্‌ছে সেখানে এমন কোনো সর্ব্বজনীন স্বাধীনতামূলক রাষ্ট্রিক বা সামাজিক ব্যবস্থাতন্ত্র ঘট্‌তেই পারে না যার সাহায্যে অধি-কাংশ মানুষ নিজের অধিকাংশ ন্যায্য প্রাপ্য পেতে পারে। আজ-কালকার দিনে আমরা সেই রাষ্ট্রনীতিকেই শ্রেষ্ঠ বলি যার ভিতর দিয়ে সর্ব্বজনের স্বাধীন বুদ্ধি স্বাধীন শক্তি নিজেকে প্রকাশ কর্‌বার উপায় পায়। কোনো দেশেই আজ পর্য্যন্ত তার সম্পূর্ণ আদর্শ দেখিনি। কিন্তু আধুনিক য়ুরোপে আমেরিকায় এই আদর্শের অভিমুখে প্রয়াস দেখ্‌তে পাই। এই প্রয়াস কখন্ থেকে পাশ্চাত্য দেশে বললাভ করেছে? যখন থেকে সেখানে জ্ঞান ও শক্তি-সাধনার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বহুলপরিমাণে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে। যখন থেকে সংসারযাত্রার ক্ষেত্রে মানুষ নিজের বুদ্ধিকে স্বীকার কর্‌তে সাহস করেছে তখন থেকেই জন-সাধারণ রাজা গুরু জড়প্রথা ও অন্ধসংস্কারগত শাস্ত্রবিধির বিষম চাপ কাটিয়ে উঠে মুক্তির সর্ব্বপ্রকার বাধা আপন বুদ্ধির যোগে দূর কর্‌তে চেষ্টা করেছে। অন্ধ বাধ্যতা দ্বারা চালিত হবার চিরাভ্যাস নিয়ে মুক্তির

বিপুল দায়িত্ব কোনো জাতি কখনো ভালো ক'রে বুঝ্‌তেই পারবে না, বহন করা তো দূরের কথা। হঠাৎ এক সময়ে যাঁকে তারা অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন ব'লে বিশ্বাস করে তাঁর বাণীকে দৈববাণী ব'লে জেনে তারা ক্ষণকালের জন্যে একটা দুঃসাধ্য সাধনও করতে পারে, অর্থাৎ যে আত্ম-শক্তি তাদের নিজের মধ্যে থাকা উচিত ছিল সেইটাকে বাইরে কোথাও খাড়া ক'রে কোনো এক সময়ে কোনো একটা কাজ তারা মরীয়া হয়ে চালিয়ে নিতে পারে। নিত্য ব্যবহারের জন্যে যে আগুন জ্বালাবার কাজটা তাদের নিজের বুদ্ধির হাতেই থাকা উচিত ছিল কোনো একদিন সেই কাজটা কোনও আগ্নেগিরির আকস্মিক উচ্ছ্বাসের সহায়তায় তারা সাধন ক'রে নিতে পারে। কিন্তু ক্বচিৎ-বিস্ফুরিত অগ্নিগিরির উপরেই যাদের ঘরের আলো জ্বালাবার ভার, নিজেদের বুদ্ধিশক্তির উপর নয়, মুক্তির নিত্যোৎসবে তাদের প্রদীপ জ্বল্‌বে না এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। অতএব যে শিক্ষার চর্চায় তারা আগুন নিজে জ্বালাতে পারে, নিজে জ্বালানো অসাধ্য নয় এই ভরসা লাভ করতে পারে, সেই শিক্ষা পাওয়াই ঘরের অন্ধকার দূর হওয়ার একমাত্র সদুপায়।

এমন লোককে জানা আছে, যে মানুষ জন্ম-বেকার, মজ্জাগত অবসাদে কাজে তার গা লাগে না। পৈতৃক সম্পত্তি তার পক্ষে পরম বিপত্তি, তাও প্রায় উজাড় হয়ে এল। অর্থ না হোলে তার চলে না, কিন্তু উপার্জ্জনের দ্বারা অর্থসঞ্চয়ের পথ এত দীর্ঘ, এত বন্ধুর, যে, সে-পথের সাম্‌নে বসে ব'সে পথটাকে হ্রস্ব করবার দৈব উপায় চিন্তায় আধ-বোজা চোখে সর্ব্বদা নিযুক্ত, তাতে কেবল তার চিন্তাই বেড়ে চলেছে, পথ কম্‌ছে না। এমন সময় সন্ন্যাসী এসে বল্‌লে, তিন মাসের মধ্যেই সহজ উপায়ে তোমাকে লক্ষপতি ক'রে দিতে পারি। এক মুহূর্ত্তে তার জড়তা ছুটে গেল। এই তিনটে মাস সন্ন্যাসীর কথামতো

সে দুঃসাধ্য সাধন করতে লাগল। এই জড়পদার্থের মধ্যে সহসা একটা প্রচুর উদ্যম দেখে সকলেই সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তিতে বিস্মিত হয়ে গেল। কেউ বুঝলে না, এটা সন্ন্যাসীর শক্তির লক্ষণ নয়, ঐ মানুষটারই অশক্তির লক্ষণ। আত্মশক্তির পথে চলতে যে বুদ্ধি যে অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, যে মানুষের তা নেই, তাকে অলৌকিক-শক্তি-পথের আভাস দেবামাত্রই সে তার জড়শয্যা থেকে লাফ দিয়ে ওঠে। তা না হোলে আমাদের দেশে এত তাগা-তাবিজ বিক্রি হবে কেন? যারা রোগ তাপ বিপদ্ আপদ্ থেকে রক্ষা পাবার বুদ্ধিসঙ্গত উপায়ের পরে মানসিক জড়ত্ব-বশত আস্থা রাখে না, তাগা-তাবিজ স্বস্ত্যয়ন তন্ত্র মন্ত্র মানতে তারা প্রভূত ত্যাগ এবং অজস্র সময় ও চেষ্টা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হয় না। একথা ভুলে যায় যে, এই তাগা-তাবিজ-গ্রস্তদেরই রোগ তাপ বিপদ্ আপদের অবসান দেবতা বা অপদেবতা কারো কৃপাতেই ঘটে না, এই তাগা-তাবিজ-গ্রস্তদেরই ঘরে অকল্যাণের উৎস শত-ধারায় চিরদিন উৎসারিত।

যে-দেশে বসন্ত-রোগের কারণটা লোকে বুদ্ধির দ্বারা জেনেছে এবং সে কারণটা বুদ্ধির দ্বারা নিবারণ করেছে, সে-দেশে বসন্ত মারীরূপ ত্যাগ ক'রে দৌড় মেরেছে। আর যে-দেশের মানুষ মা-শীতলাকে বসন্তের কারণ ব'লে চোখ বুজে ঠিক ক'রে ব'সে থাকে, সে দেশে মা-শীতলাও থেকে যান, বসন্তও যাবার নাম করে না। সেখানে মা-শীতলা হচ্চেন মানসিক পরবশতার একটি প্রতীক, বুদ্ধির স্বরাজচ্যুতির কদর্য্য লক্ষণ।

আমার কথার একটা মস্ত জবাব আছে। সে হচ্চে এই যে, দেশের একদল লোক তো বিদ্যাশিক্ষা করেছে। তারা তো পরীক্ষা পাস করবার বেলায় জাগতিক নিয়মের নিত্যতা অমোঘতা সম্বন্ধে ব্যাকরণ-

বিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষায় সাক্ষ্য দিয়ে ডিগ্রি নিয়ে আসে। কিন্তু আমাদের দেশে এই ডিগ্রিধারীদেরই ব্যবহারে কি আত্মবুদ্ধির পরে, বিশ্ববিধির পরে, বিশ্বাস সপ্রমাণ হচ্চে? তারাও কি বুদ্ধির অন্ধতায় সংসারে সকলরকমেরই দৈন্য বিস্তার করে না?

স্বীকার করতেই হয়, তাদের অনেকের মধ্যেই বুদ্ধি-মুক্তির জোর বড়ো বেশি দেখতে পাইনে; তারাও উচ্ছৃঙ্খলভাবে যা-তা মেনে নিতে প্রস্তুত, অন্ধভক্তিতে অদ্ভুত পথে অকস্মাৎ চালিত হোতে তারা উন্মুখ হয়ে আছে; আধিভৌতিক ব্যাপারের আধিদৈবিক ব্যাখ্যা করতে তাদের কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই; তারাও নিজের বুদ্ধি-বিচারের দায়িত্ব পরের হাতে সমর্পণ করতে লজ্জা বোধ করে না, আরাম বোধ করে।

তার একটা প্রধান কারণ এই যে, মূঢ়তার বিপুল ভারাকর্ষণ জিনিষটা ভয়ঙ্কর প্রবল। নিজের সতর্ক বুদ্ধিকে সর্ব্বদা জাগ্রত রাখতে সচেষ্ট শক্তির প্রয়োজন হয়। যে-সমাজ দৈব গুরু ও অপ্রাকৃত প্রভাবের পরে আস্থাবান্ নয়, যে সমাজ বুদ্ধিকে বিশ্বাস করতে শিখেছে, সে সমাজে পরস্পরের উৎসাহে ও সহায়তায় মানুষের মনের শক্তি সহজেই নিরলস থাকে। আমাদের দেশে শিক্ষা-প্রণালীর দোষে একে তো শিক্ষা অগভীর হয়, তার উপরে সেই শিক্ষার ব্যাপ্তি নিরতিশয় সঙ্কীর্ণ। এইজন্যে সর্ব্বজনের সম্মিলিত মনের শক্তি আমাদের মনকে অগ্রসরতার দিকে, আত্মশক্তির দিকে উন্মুখ ক'রে রাখতে পারে না। সে সহজেই অলস হয়ে পড়ে এবং প্রচলিত বিশ্বাস ও চিরাগত প্রথার হাতে গা ঢেলে দিয়ে ছুটি পায়। তার পরে অশিক্ষিতদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ ঘটে এই যে, তারা আপন অন্ধবিশ্বাসে বিনাদ্বিধায় সহজ ঘুম ঘুমোয়, আমরা নিজেকে ভুলিয়ে আফিংয়ের ঘুম ঘুমোই; আমরা কুতর্ক ক'রে লজ্জা নিবারণ করতে চেষ্টা করি, জড়তা বা ভীরুত্ববশত যে কাজ করি

তার একটা সুনিপুণ বা অনিপুণ ব্যাখ্যা বানিয়ে দিয়ে সেটাকে গর্ব্বের বিষয় ক'রে দাঁড় করাতে চাই। কিন্তু ওকালতির জোরে দুর্গতিকে চাপা দেওয়া যায় না।

দেশকে মুক্তি দিতে গেলে দেশকে শিক্ষা দিতে হবে এ কথাটা হঠাৎ এত অতিরিক্ত মস্ত ব'লে ঠেকে যে এ'কে আমাদের সমস্যার সমাধান ব'লে মেনে নিতে মন রাজি হয় না।

দেশের মুক্তি কাজটা খুব বড়ো অথচ তার উপায়টা খুব ছোটো হবে একথা প্রত্যাশা করার ভিতরেই একটা গলদ আছে। এই প্রত্যাশার মধ্যেই রয়ে গেছে ফাঁকির পরে বিশ্বাস; বাস্তবের পরে নয়, নিজের শক্তির পরে নয়।

১৩৩০

শূদ্রধর্ম্ম

মানুষ জীবিকার জন্যে নিজের সুযোগমতো নানা কাজ ক'রে থাকে। সাধারণত সেই কাজের সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ নেই, অর্থাৎ তা'র কর্ত্তব্যকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মূল্য দেওয়া হয় না।

ভারতবর্ষে একদিন জীবিকাকে ধর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। তাতে মানুষকে শান্ত করে। আপনার জীবিকার ক্ষেত্রকে তা'র সমস্ত সঙ্কীর্ণতাসমেত মানুষ সহজে গ্রহণ করতে পারে।

জীবিকানির্ব্বাচন-সম্বন্ধে ইচ্ছার দিকে যাদের কোনো বাধা নেই, অধিকাংশ স্থলে ভাগ্যে তাদের বাধা দেয়। যে মানুষ রাজমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখে কাজের বেলায় তাকে রাজার ফরাসের কাজ করতে হয়। এমন অবস্থায় কাজের ভিতরে ভিতরে তা'র বিদ্রোহ থামতে চায় না।

মুস্কিল এই যে, রাজ-সংসারে ফরাসের কাজের প্রয়োজন আছে, কিন্তু রাজমন্ত্রীর পদেরই সম্মান। এমন কি, যে-স্থলে তা'র পদই আছে, কর্ম্ম নেই, সেখানেও সে তা'র খেতাব নিয়ে মানের দাবী করে। ফরাস এদিকে খেটে খেটে হয়রান্ হয় আর মনে মনে ভাবে, তা'র প্রতি দৈবের অবিচার। পেটের দায়ে অগত্যা দীনতা স্বীকার করে, কিন্তু ক্ষোভ মেটে না।

ইচ্ছার স্বাধীনতার স্বপক্ষে ভাগ্যও যদি যোগ দিত, সব ফরাসই যদি রাজমন্ত্রী হয়ে উঠ্‌ত, তাহোলে মন্ত্রণার কাজ যে ভালো চল্‌ত তা নয়, ফরাসের কাজও একেবারেই বন্ধ হয়ে যেত।

দেখা যাচ্চে ফরাসের কাজ অত্যাবশ্যক, অথচ ফরাসের পক্ষে তা অসন্তোষজনক। এমন অবস্থায় বাধ্য হয়ে কাজ করা অপমানকর।

ভারতবর্ষ এই সমস্যার মীমাংসা করেছিল বৃত্তিভেদকে পুরুষানুক্রমে পাকা ক'রে দিয়ে। রাজশাসনে যদি পাকা করা হোত তাহোলে তার মধ্যে দাসত্বের অবমাননা থাক্‌ত এবং ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহের চেষ্টা কখনই থাম্‌ত না। পাকা হোলো ধর্ম্মের শাসনে। বলা হোলো, এক-একটা জাতির এক-একটা কাজ তা'র ধর্ম্মেরই অঙ্গ।

ধর্ম্ম আমাদের কাছে ত্যাগ দাবী করে। সেই ত্যাগে আমাদের দৈন্য নয়, আমাদের গৌরব। ধর্ম্ম আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলকেই কিছু না কিছু ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছে। ব্রাহ্মণকেও অনেক ভোগ বিলাস ও প্রলোভন পরিত্যাগ কর্‌বার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, তা'র সঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রচুর সম্মান পেয়েছিল। না পেলে সমাজে সে নিজের কাজ কর্‌তেই পার্‌ত না। শূদ্রও যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছে, কিন্তু সমাদর পায়নি। তবুও, সে কিছু পাক্ আর না পাক্, ধর্ম্মের খাতিরে হীনতা স্বীকার করার মধ্যেও তা'র একটা আত্মপ্রসাদ আছে।

বস্তুত জীবিকানির্ব্বাহকে ধর্ম্মের শ্রেণীতে ভুক্ত করা তখনি চলে যখন নিজের প্রয়োজনের উপরেও সমাজের প্রয়োজন লক্ষ্য থাকে। ব্রাহ্মণ ভাতে-ভাত খেয়ে বাহ্য দৈন্য স্বীকার ক'রে নিয়ে সমাজের আধ্যাত্মিক আদর্শকে সমাজের মধ্যে বিশুদ্ধ যদি রাখে তবে তার দ্বারা তার জীবিকা-নির্ব্বাহ হোলেও সেটা জীবিকানির্ব্বাহের চেয়ে বড়ো, সেটা ধর্ম্ম। চাষী যদি চাষ না করে, তবে একদিনও সমাজ টেঁকে না। অতএব চাষী আপন জীবিকাকে যদি ধর্ম্ম ব'লে স্বীকার করে, তবে কথাটাকে মিথ্যা বলা যায় না। অথচ এমন মিথ্যা সান্ত্বনা তাকে কেউ দেয়নি যে, চাষকরার কাজ ব্রাহ্মণের কাজের সঙ্গে সম্মানে সমান। যেসব কাজে মানুষের

উচ্চতর বৃত্তি থাটে, মানবসমাজে স্বভাবতই তা'র সম্মান শারীরিক কাজের চেয়ে বেশি, একথা সুস্পষ্ট।

যেদেশে জীবিকা অর্জ্জনকে ধর্ম্মকর্ম্মের সামিল ক'রে দেখে না, সেদেশেও নিম্নশ্রেণীর কাজ বন্ধ হোলে সমাজের সর্ব্বনাশ ঘটে। অতএব সেখানেও অধিকাংশ লোককেই সেই কাজ কর্‌তেই হবে। সুযোগের সঙ্কীর্ণতাবশত সে-রকম কাজ কর্‌বার লোকের অভাব ঘটে না, তাই সমাজ টিঁকে আছে। আজকাল মাঝে-মাঝে যখন সেখানকার শ্রমজীবীরা সমাজের সেই গরজের কথাটা মাথা নাড়া দিয়ে সমাজের নিষ্কর্ম্মা, বা পরাসক্ত বা বুদ্ধিজীবীদের জানান্ দেয় তখন সমাজে একটা ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। তখন কোথাও বা কড়া রাজশাসন, কোথাও বা তাদের আরজি মঞ্জুরির দ্বারা সমাজ রক্ষার চেষ্টা হয়।

আমাদের দেশে বৃত্তিভেদকে ধর্ম্মশাসনের অন্তর্গত ক'রে দেওয়াতে এ রকম অসন্তোষ ও বিপ্লবচেষ্টার গোড়া নষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতে ক'রে জাতিগত কর্ম্মধারাগুলির উৎকর্ষ সাধন হয়েছে কি না ভেবে দেখবার বিষয়।

যে সকল কাজ বাহ্য অভ্যাসের নয়, যা বুদ্ধি-মূলক বিশেষ ক্ষমতার দ্বারাই সাধিত হোতে পারে, তা ব্যক্তিগত না হয়ে বংশগত হোতেই পারে না। যদি তাকে বংশে আবদ্ধ করা হয়, তাহোলে ক্রমেই তা'র প্রাণ মরে গিয়ে বাইরের ঠাট্‌টাই বড়ো হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণের যে-সাধনা আন্তরিক তার জন্যে ব্যক্তিগত শক্তি ও সাধনার দর্‌কার; যেটা কেবল-মাত্র আনুষ্ঠানিক, সেটা সহজ। আনুষ্ঠানিক আচার বংশানুক্রমে চল্‌তে চল্‌তে তার অভ্যাসটা পাকা ও দম্ভটা প্রবল হোতে পারে, কিন্তু তার আসল জিনিষটি মরে যাওয়াতে আচারগুলি অর্থহীন বোঝা হয়ে উঠে' জীবনপথের বিঘ্ন ঘটায়। উপনয়ন প্রথা একসময়ে আর্য্যদ্বিজদের পক্ষে

সত্য পদার্থ ছিল,—তার শিক্ষা, দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য্য, গুরুগৃহবাস সমস্তই তখনকার কালের ভারতবর্ষীয় আর্য্যদের মধ্যে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলিকে গ্রহণ করবার পক্ষে উপযোগী ছিল। কিন্তু যে-সকল উচ্চ আদর্শ আধ্যাত্মিক, যার জন্যে নিয়ত জাগরূক চিৎশক্তির দরকার সে তো মৃত পদার্থের মতো কঠিন আচারের পৈতৃক সিন্ধুকের মধ্যে বন্ধ ক'রে রাখ্‌বার নয় সেইজন্যেই স্বভাবতই উপনয়ন প্রথা এখন প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার কারণ উপনয়ন যে-আদর্শের বাহন ও চিহ্ন সেই আদর্শই গেছে সরে। ক্ষত্রিয়েরও সেই দশা, কোথায় যে সে, তাকে খুঁজে পাওয়া শক্ত। যারা ক্ষত্রিয়বর্ণ ব'লে পরিচিত জাতকর্ম্ম বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সময়েই তারা ক্ষত্রিয়ের কতকগুলি পুরাতন আচার পালন করে মাত্র।

এদিকে শাস্ত্রে বলছেন স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। এ-কথাটার প্রচলিত অর্থ এই দাঁড়িয়েছে যে, যে-বর্ণের শাস্ত্রবিহিত যে-ধর্ম্ম তাকে তাই পালন করতে হবে। এ-কথা বললেই তার তাৎপর্য্য এই দাঁড়ায় যে, ধর্ম্ম-অনুশাসনের যে-অংশটুকু অন্ধভাবে পালন করা চলে, তাই প্রাণপণে পালন করতে হবে, তার কোনো প্রয়োজন থাক্ আর নাই থাক্, তাতে অকারণে মানুষের স্বাধীনতার খর্ব্বতা ঘটে ঘটুক তার ক্ষতি হয় হোক্। অন্ধ আচারের অত্যাচার অত্যন্ত বেশি, তার কাছে ভালো-মন্দর আন্তরিক মূল্যবোধ নেই। তাই যে-শুচিবায়ুগ্রস্ত মেয়ে কথায় কথায় স্নান করতে ছোটে, সে নিজের চেয়ে অনেক ভালো লোককে বাহ্যশুচিতার ওজনে ঘৃণাভাজন মনে করতে দ্বিধা বোধ করে না। বস্তুত তার পক্ষে আন্তরিক সাধনার কঠিনতর প্রয়াস অনাবশ্যক। এইজন্যে অহঙ্কার ও অন্যের প্রতি অবজ্ঞায় তার চিত্তের অশুচিতা ঘটে। এই কারণে আধুনিককালে যারা বুদ্ধিবিচার জলাঞ্জলি দিয়ে সমাজকর্ত্তাদের

মতে স্বধর্ম্মপালন করে, তাদের ঔদ্ধত্য এতই দুঃসহ, অথচ এত নিরর্থক।

অথচ জাতিগত স্বধর্ম্ম পালন করা খুবই সহজ যেখানে সেই স্বধর্ম্মের মধ্যে চিত্তবৃত্তির স্থান নেই। বংশানুক্রমে হাঁড়ি তৈরি করা, বা ঘানির থেকে তেল বের করা বা উচ্চতর বর্ণের দাস্যবৃত্তি করা কঠিন নয়—বরং তাতে মন যতই মরে যায়, কাজ ততই সহজ হয়ে আসে। এই সকল হাতের কাজেরও নূতনতর উৎকর্ষ সাধন করতে গেলে চিত্ত চাই। বংশানুক্রমে স্বধর্ম্ম পালন করতে গিয়ে তার উপযুক্ত চিত্তও বাকি থাকে না, মানুষ কেবল যন্ত্র হয়ে একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। যাই হোক্, আজ ভারতে বিশুদ্ধভাবে স্বধর্ম্মে টিঁকে আছে কেবল শূদ্রেরা। শূদ্রত্বে তাদের অসন্তোষ নেই। এইজন্যেই ভারতবর্ষের নিমকে-জীর্ণ দেশে-ফেরা ইংরেজ-গৃহিণীর মুখে অনেকবার শুনেছি, স্বদেশে এসে ভারতবর্ষের চাকরের অভাব তারা বড়ো বেশি অনুভব করে। ধর্ম্মশাসনে পুরুষানুক্রমে যাদের চাকর বানিয়েছে তাদের মতো চাকর পৃথিবীতে কোথায় পাওয়া যাবে? লাথিঝাঁটা-বর্ষণের মধ্যেও তারা স্বধর্ম্মরক্ষা করতে কুণ্ঠিত হয় না। তারা তো কোনোকালে সম্মানের দাবী করেনি, পায়ওনি, তারা কেবল শূদ্রধর্ম্ম অত্যন্ত বিশুদ্ধভাবে রক্ষা ক'রেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছে। আজ যদি তারা বিদেশী শিক্ষায় মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হয়, তবে সমাজপতি তাদের স্পর্দ্ধা সম্বন্ধে আক্রোশ প্রকাশ করে।

স্বধর্ম্মরত শূদ্রের সংখ্যাই ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি, তাই একদিক থেকে দেখ্‌তে গেলে ভারতবর্ষ শূদ্রধর্ম্মেরই দেশ। তার নানা প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া গেছে। এই অতি প্রকাণ্ড শূদ্রধর্ম্মের জড়ত্বের ভারাকর্ষণে ভারতের সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মাথা হেঁট হয়ে আছে।

বুদ্ধিসাধ্য জ্ঞানসাধ্য চারিত্র-শক্তিসাধ্য যে-কোনো মহাসম্পদ্‌লাভের সাধনা আমরা আজ করতে চাই তা এই প্রবল শূদ্রত্বভার ঠেলে তবে করতে হবে,—তার পরে সেই সম্পদ্‌কে রক্ষা করবার ভারও এই অসীম অন্ধতার হাতে সমর্পণ করা ছাড়া আর উপায় নেই। এই কথাই আমাদের ভাববার কথা।

এই শূদ্রপ্রধান ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড়ো দুর্গতির যে ছবি দেখতে পাই, সেই পরম আক্ষেপের কথাটা বলতে বসেছি।

প্রথমবারে যখন জাপানের পথে হংকঙের বন্দরে আমাদের জাহাজ লাগল, দেখলুম সেখানে ঘাটে একজন পাঞ্জাবি পাহারাওয়ালা অতি তুচ্ছ কারণে একজন চৈনিকের বেণী ধরে তাকে লাথি মারলে। আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। নিজের দেশে রাজভৃত্যের লাঞ্ছনধারীকর্ত্তৃক স্বদেশীর এরকম অত্যাচার-দুর্গতি অনেক দেখেছি, দূর সমুদ্রতীরে গিয়েও তাই দেখলুম। দেশবিদেশে এরা শূদ্রধর্ম্মপালন করছে। চীনকে অপমানিত করবার ভার প্রভুর হয়ে এরা গ্রহণ করেছে। সে সম্বন্ধে এরা কোনো বিচার করতেই চায় না, কেননা এরা শূদ্রধর্ম্মের হাওয়ায় মানুষ। নিমকের সহজ দাবী যতদূর পৌঁছায় এরা সহজেই তাকে বহুদূরে লঙ্ঘন ক'রে যায়, তাতে আনন্দ পায়, গর্ব্ব বোধ করে।

চীনের কাছ থেকে ইংরেজ যখন হংকঙ্‌ কেড়ে নিতে গিয়েছিল তখন এরাই চীনকে মেরেছে। চীনের বুকে এদেরই অস্ত্রের চিহ্ন অনেক আছে—সেই চীনের বুকে যে চীন আপন হৃদয়ের মধ্যে ভারতবর্ষের বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন ধারণ করেছিল, সেই ইৎসিং হিউয়েন্‌-সাঙের চীন।

মানব-বিশ্বের আকাশে আজ যুদ্ধের কালো মেঘ চারদিকে ঘনিয়ে

এসেছে। এদিকে প্যাসিফিকের তীরে ইংরেজের তীক্ষ্ণ চঞ্চু খরনখর-দারুণ শ্যেনতরণীর নীড় বাঁধা হচ্চে। পশ্চিম মহাদেশে দিকে দিকে রব উঠেছে যে, এসিয়ার অস্ত্রশালায় শক্তিশেল তৈরি চল্‌ছে, য়ুরোপের মর্ম্মের প্রতি তার লক্ষ্য। রক্তমোক্ষণক্লান্ত পীড়িত এসিয়াও ক্ষণে ক্ষণে অস্থিরতার লক্ষণ দেখাচ্চে। পূর্ব্বমহাদেশের পূর্ব্বতম প্রান্তে জাপান জেগেছে, চীনও তার দেওয়ালের চারদিকে সিঁধ কাটার শব্দে জাগ্‌বার উপক্রম কর্‌ছে। হয়তো একদিন এই বিরাট্‌কায় জাতি তার বন্ধন ছিন্ন ক'রে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা কর্‌বে, হয়তো একদিন তা'র আফিমে আবিষ্ট দেহ বহুকালের বিষ ঝেড়ে ফেলে আপনার শক্তি উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌বে। চীনের থলিঝুলি যারা ফুটো কর্‌তে লেগেছিল, তারা চীনের এই চৈতন্যলাভকে য়ুরোপের বিরুদ্ধে অপরাধ ব'লেই গণ্য কর্‌বে। তখন এসিযার মধ্যে এই শূদ্রভারতবর্ষের কী কাজ? তখন সে য়ুরোপের কামারশালায় তৈরি লোহার শিকল কাঁধে ক'রে নির্ব্বিচারে তার প্রাচীন বন্ধুকে বাঁধ্‌তে যাবে। সে মার্‌বে, সে মর্‌বে। কেন মার্‌বে, কেন মর্‌বে একথা প্রশ্ন কর্‌তে তার ধর্ম্মে নিষেধ। সে বল্‌বে স্বধর্ম্মে হননং শ্রেয়ঃ, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। ইংরেজসাম্রাজ্যের কোথাও সে সম্মান চায়ও না, পায়ও না—ইংরেজের হয়ে সে কুলিগিরির বোঝা ব'য়ে মরে, যে-বোঝার মধ্যে তার অর্থ নেই, পরমার্থ নেই, ইংরেজের হয়ে পরকে সে তেড়ে মার্‌তে যায়, যে-পর তা'র শত্রু নয়, কাজ সিদ্ধ হবামাত্র আবার তাড়া খেয়ে তোষাখানার মধ্যে ঢোকে। শূদ্রের এই তো বহু যুগের দীক্ষা। তার কাজে স্বার্থও নেই, সম্মানও নেই, আছে কেবল স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ এই বাণী। নিধনের অভাব হচ্চে না; কিন্তু তার চেয়েও মানুষের বড়ো দুর্গতি আছে, যখন সে পরের স্বার্থের বাহন হয়ে পরের সর্ব্বনাশ করাকেই অনায়াসে কর্ত্তব্য ব'লে মনে করে।

অতএব এতে আশ্চর্যোর কথা নেই যে, যদি দৈবক্রমে কোনোদিন ব্রিটানিয়া ভারতবর্ষকে হারায় তা হোলে নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌বে, "I miss my best servant."

১৩৩২

বৃহত্তর ভারত *

যবদ্বীপ যাবার পূর্ব্বাহ্নে যে অভিনন্দন আপনারা আমাকে দিলেন তাতে আমার মনে বল সঞ্চার করবে। আমরা চারদিকের দাবীর দ্বারা আমাদের প্রাণশক্তি আবিষ্কার করি। যার যা দেবার তা বাইরের নেবার ইচ্ছা থেকে আমরা দিতে সক্ষম হই। দাবীর আকর্ষণ যদি থাকে তবে আপনি সহজ হয়ে যায় দেওয়ার পথ।

বাইরে যেখানে দাবী সত্য হয়, অন্তরে সেখানেই দানের শক্তি উদ্বোধিত হয়ে ওঠে। দানের সামগ্রী আমাদের থাক্‌লেও আমরা দিতে পারিনে সমাজে যতক্ষণ প্রত্যাশা না সজীব হয়ে ওঠে। আজ একটা আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে জেগেছে, যে-আকাঙ্ক্ষা ভারতের বাইরেও ভারতকে বড়ো ক'রে সন্ধান করতে চায়। সেই আকাঙ্ক্ষাই বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে রূপ গ্রহণ করেছে। সেই আকাঙ্ক্ষাই আপন প্রত্যাশা নিয়ে আমাকে অভিনন্দন করছে। এই প্রত্যাশা আমার চেষ্টাকে সার্থক করুক।

বর্ব্বরজাতীয় মানুষের প্রধান লক্ষণ এই যে, তার আত্মবোধ সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ। তার চৈতন্যের আলো উপস্থিত কালে ও বর্ত্তমান অবস্থার ঘেরটুকুকেই আলোকিত ক'রে রাখে ব'লে সে আপনাকে তার চেয়ে বড়ো ক্ষেত্রে জানে না। এইজন্যেই জ্ঞানে কর্ম্মে সে দুর্ব্বল। সংস্কৃত শ্লোকে বলে, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" অর্থাৎ ভাবনাই হচ্চে সাধনার সৃষ্টিশক্তির মূলে। নিজের সম্বন্ধে, নিজের দেশ সম্বন্ধে

---

* বৃহত্তর ভারত পরিষদ কর্তৃক অনুষ্ঠিত বিদায়-সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে।

বড়ো ক'রে ভাবনা করবার দরকার আছে, নইলে কর্ম্মে জোর পৌছয় না, এবং অতিক্ষীণ আশা ও অতি ক্ষুদ্র সিদ্ধি নিয়ে অকৃতার্থ হোতে হয়। নিজের কাছে নিজের পরিচয়টাকে বড়ো করবার চেষ্টাই সভ্যজাতির ইতিহাসগত চেষ্টা। নিজের পরিচয়কে সঙ্কীর্ণ দেশকালের ভূমিকা থেকে মুক্তিদানই হচ্চে এই চেষ্টার লক্ষ্য।

যখন বালক ছিলুম ঘরের কোণের বাতায়নে ব'সে দেশের প্রাকৃতিক রূপকে অতি ছোটো পরিধির মধ্যেই দেখেছি। বাইরের দিক থেকে দেশের এমন কোনো মূর্ত্তি দেখিনি যার মধ্যে দেশের ব্যাপক আবির্ভাব আছে। বিদেশী বণিকের হাতে-গড়া কলকাতা সহরের মধ্যে ভারতের এমন কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না যা সুগভীর ও সুদূর-বিস্তৃত। সেই শিশুকালে কোণের মধ্যে অত্যন্ত বেশি অবরুদ্ধ ছিলাম ব'লেই ভারতবর্ষের বৃহৎ স্বরূপ চোখে দেখবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল।

এমন সময়ে আমার আট নয় বছর বয়সে গঙ্গাতীরের এক বাগানে কিছু কালের জন্যে বাস করতে গিয়েছিলাম। গভীর আনন্দ পেলাম। গঙ্গানদী ভারতের একটি বৃহৎ পরিচয়কে বহন করে। ভারতের বহুদেশ বহুকাল ও বহুচিত্তের ঐক্যধারা তার স্রোতের মধ্যে বহমান। এই নদীর মধ্যে ভারতের একটি পরিচয়-বাণী আছে। হিমাদ্রির স্কন্ধ থেকে পূর্ব্ব সমুদ্র পর্য্যন্ত লম্বমান এই গঙ্গানদী। সে যেন ভারতের যজ্ঞোপবীতের মতো, ভারতের বহুকালক্রমাগত জ্ঞান ধর্ম্ম তপস্যার স্মৃতিযোগ-সূত্র।

তার পর আর কয়েক বৎসর পরেই পিতা আমাকে সঙ্গে ক'রে হিমালয় পর্ব্বতে নিয়ে যান। আমার পিতাকে এই প্রথম নিকটে দেখেছি, আর হিমালয় পর্ব্বতকে। উভয়ের মধ্যেই ভাবের মিল ছিল। হিমালয় এমন একটি চিরন্তন রূপ, যা সমগ্র ভারতের; যা একদিকে

দুর্গম, আর একদিকে সর্ব্বজনীন। আমার পিতার মধ্যেও ভারতের সেই বিদ্যা চিন্তায় পূজায় কর্ম্মে প্রত্যহ প্রাণময় হয়ে দেখা যাচ্ছিল যা সর্ব্বকালীন, যার মধ্যে প্রাদেশিকতার কার্পণ্যমাত্র নেই।

তারপর অল্প বয়সে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়্‌তে সুরু করলাম। তখন আলেকজান্দার থেকে আরম্ভ ক'রে ক্লাইভের আমল পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতবর্ষ বারবার কী রকম পরাস্ত অপমানিত হয়ে এসেছে এই কাহিনীই দিনক্ষণ তারিখ ও নামমালা সমেত প্রত্যহ কণ্ঠস্থ করেছি। এই অগৌরবের ইতিহাস-মরুতে রাজপুতদের বীরত্ব কাহিনীর ওয়েসিস্ থেকে যেটুকু ফসল সংগ্রহ করা সম্ভব তাই নিয়ে স্বজাতির মহত্ত্ব পরিচয়ের দারুণ ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করা হোত। সকলেই জানেন সে সময়কার বাংলা কাব্য নাটক উপন্যাস কী রকম দুঃসহ ব্যগ্রতায় টডের রাজস্থান দোহন করতে বসেছিল। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় দেশের মধ্যে আমাদের পরিচয়-কামনা কী রকম উপবাসী হয়ে ছিল। দেশ বল্‌তে কেবল তো মাটির দেশ নয়, সে যে মানবচরিত্রের দেশ। দেশের বাহ্য প্রকৃতি আমাদের দেহটা গড়ে বটে, কিন্তু আমাদের মানবচরিত্রের দেশ থেকেই প্রেরণা পেয়ে আমাদের চরিত্র গড়ে ওঠে। সেই দেশটাকে যদি আমরা দীন ব'লে জানি তাহোলে বিদেশী বীরজাতির ইতিহাস প'ড়ে আমাদের দীনতাকে তাড়াবার শক্তি অন্তরের মধ্যে পাইনে।

ঘরের কোণে আবদ্ধ থেকে ভারতের দৃশ্যরূপটাকে বড়ো ক'রে দেখবার পিপাসা যেমন মনের মধ্যে প্রবল হয়েছিল, তেম্‌নি তখনকার পাঠ্য ভারত-ইতিহাসের অগৌরব অধ্যায়ের অন্ধকার কোণের মধ্যে ব'সে ব'সে ভারতের চারিত্রিক মহিমার বৃহৎ পরিচয় পাবার জন্য মনের মধ্যে একটা ক্ষুধার পীড়ন ছিল। বস্তুত এই অসহ্য ক্ষুধাই আমাদের মনকে তখন নানা হাস্যকর অত্যুক্তি ও অবাস্তবতা নিয়ে তৃপ্তির স্বপ্নমূলক

উপকরণ রচনায় প্রবৃত্ত করেছিল। আজও সেদিন যে একেবারে চ'লে গেছে তা বল্‌তে পারিনে।

যে তারার আলো নিবে গেছে, নিজের মধ্যেই সে সঙ্কুচিত। নিজের মধ্যে একান্ত বদ্ধ থাক্‌বার বাধ্যতাকেই বলে দৈন্য। এই দৈন্যের গণ্ডীর মধ্যেও তার প্রতি মুহূর্ত্তগত কাজ হয় তো কিছু আছে, কিন্তু উদার নক্ষত্রমণ্ডলীর সভায় তার সম্মানের স্থান নেই। সে অজ্ঞাত, অখ্যাত, পরিচয়হীন। এই অপরিচয়ের অবমাননাই কারাবাসের মতো। এর থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় আলোকের দ্বারা। অর্থাৎ এমন কোনো প্রকাশের দ্বারা যাতে ক'রে বিশ্বের সঙ্গে তাকে যোগযুক্ত করে, এমন সত্যের দ্বারা যা নিখিলের আদরণীয়।

আমাদের শাস্ত্রে বারবার বলেছে, যিনি নিজের মধ্যে সর্ব্বভূতকে এবং সর্ব্বভূতের মধ্যে নিজেকে জানেন তিনিই সত্যকে জানেন। অর্থাৎ অহং-সীমার মধ্যে আত্মার নিরুদ্ধ অবস্থা আত্মার সত্য অবস্থা নয়। ব্যক্তিগত মানুষের জীবনের সাধনায় এ যেমন একটা বড়ো কথা, নেশুনের ঐতিহাসিক সাধনাতেও সেইরকম। কোনো মহাজাতি কী ক'রে আপনাকে বিশ্বের কাছে পরিচিত কর্‌তে পারে এই তপস্যাই তার তপস্যা। যে পার্‌লে না বিধাতা তাকে বর্জ্জন কর্‌লেন। মানব-সভ্যতার সৃষ্টি-কার্য্যে তার স্থান হোলো না। রামচন্দ্র যখন সেতুবন্ধন করেছিলেন তখন কাঠবেড়ালীরও স্থান হয়েছিল সেই কাজে। সে তখন শুধু গাছের কোটরে নিজের খাদ্যান্বেষণে না থেকে আপনার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়েই দুই তটভূমির বিচ্ছেদ-সমুদ্রের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজে যোগ দিয়েছিল। সীতাকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করাই পৃথিবীতে সকল মহৎ সাধনার রূপক। সেই সীতাই ধর্ম্ম, সেই সীতা জ্ঞান, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি; সেই সীতা সুন্দরী, সেই সীতা সর্ব্বমানবের কল্যাণী।

নিজের কোটরের মধ্যে প্রভূত খাদ্য সঞ্চয়ের ঐশ্বর্য্য নিয়ে এই কাঠবেড়ালীর সার্থকতা ছিল না, কিন্তু সীতা-উদ্ধারের মহৎ কাজে সে যে নিজেকে নিবেদন করেছিল এইজন্যেই মানবদেবতা তার পিঠে আশীর্ব্বাদরেখা চিহ্নিত করেছিলেন। প্রত্যেক মহাজাতির পিঠে আমরা সেই চিহ্ন দেখতে চাই, সেই চিহ্নের দ্বারাই সে আপন কোটর-কোণের অতীত নিত্যলোকে স্থান লাভ করে।

ভারতবর্ষের যে বাণী আমরা পাই সে বাণী যে শুধু উপনিষদের শ্লোকের মধ্যে নিবদ্ধ তা নয়। ভারতবর্ষ বিশ্বের নিকট যে মহত্তম বাণী প্রচার করেছে, তা ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা, আত্মার দ্বারা,—সৈন্য দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, পীড়ন লুণ্ঠন দিয়ে নয়। গৌরবের সঙ্গে দস্যুবৃত্তিব কাহিনীকে বড়ো বড়ো অক্ষরে আপন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সে অঙ্কিত করেনি।

আমাদের দেশেও দিগ্বিজয়ের পতাকা হাতে পরজাতির দেশ জয় করবার কীর্ত্তি হয়তো সেকালে অনেকে লাভ ক'রে থাকবেন; কিন্তু ভারতবর্ষ, অন্য দেশের মতো ঐতিহাসিক জপমালায় ভক্তির সঙ্গে তাঁদের নাম স্মরণ করে না। বীর্য্যবান দস্যুদের নাম ভারতবর্ষের পুরাণে খ্যাত হয়নি।

অহংকেই যে-মানুষ পরম ও চরম সত্য ব'লে জানে সেই বিনাশ পায়; সকল দুঃখ সকল পাপের মূল এই অহমিকায়। বিশ্বের প্রতি মৈত্র-ভাবনাতেই এই অহংভাব লুপ্ত হয়, এই সত্যটি আত্মার আলোক। এই আলোক-দীপ্তি ভারতবর্ষ নিজের মধ্যে বদ্ধ রাখতে পারেনি। এই আলোকের আভাতেই ভারত আপন ভূখণ্ড-সীমার বাইরে আপনাকে প্রকাশ করেছিল। সুতরাং এইটিই হচ্চে ভারতের সত্য পরিচয়। এই পরিচয়ের আলোকেই যদি নিজের পরিচয়কে উজ্জ্বল করতে পারি

তাহোলেই আমরা ধন্য। আমরা যে ভারতবর্ষে জন্মলাভ করেছি সে এই মুক্তি মন্ত্রের ভারতবর্ষে, সে এই তপস্বীর ভারতবর্ষে। এই কথাটি যদি ধ্রুব ক'রে মনে রাখ্‌তে পারি তাহোলে আমাদের সকল কর্ম্ম বিশুদ্ধ হবে, তাহোলে আমরা নিজেকে বিশুদ্ধ ক'রে ভারতবাসী বল্‌তে পার্‌ব, সেজন্য আমাদের নতুন ক'রে ধ্বজা নির্ম্মাণ কর্‌তে হবে না।

ক্ষুধা হোলেই মানুষ অন্নের স্বপ্ন দেখে। আজকাল আমাদের দেশে পোলিটিক্যাল আত্মপরিচয়ের ক্ষুধাটাই নানাকারণে সব-চেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে। এইজন্যে নিরন্তর তারি ভোজটাই স্বপ্নে দেখ্‌ছি। তার চেয়ে বড়ো কথাগুলিকেও অপ্রাসঙ্গিক ব'লে উপেক্ষা কর্‌বার তর্জ্জন আজকাল প্রায় শোনা যায়।

কিন্তু এই পোলিটিক্যাল আত্মপরিচয়ের ধারা খুঁজ্‌তে গিয়ে বিদেশী ইতিহাসে গিয়ে পৌঁছতে হয়। সেই ব্যগ্রতার তাড়নায় আপনাকে স্বপ্নে-গড়া ম্যাট্‌সিনি, স্বপ্নে-গড়া গারিবাল্‌ডি, কাল্পনিক ওয়াশিংটন ব'লে ভাবনা করতে হয়। অর্থতত্ত্বেও তাই, এখানে আমাদের কারো কারো কল্পনা বল্‌শেভিজম্‌, কারো সিণ্ডিক্যালিজম, কারো বা সোশ্যালিজমের গোলোকধাঁধায় ঘুরে বেড়াচ্চে। এ সমস্তই মরীচিকার মতো, ভারতবর্ষের চিরকালীন জমির উপরে নেই—আমাদের দুর্ভাগ্য-তাপদগ্ধ হাল আমলের তৃষার্ত্ত দৃষ্টির উপরে স্বপ্ন রচনা কর্‌ছে। এই স্বপ্ন-সিনেমার কোণে কোণে মাঝে মাঝে "Made in Europe"-এর মার্কা ঝলক মেরে এর কারখানাঘরের বৃত্তান্তটি জানিয়ে দিয়ে যাচ্চে।

অজানা পথে অবাস্তবের পিছনে আমরা যেখানে ঘুরে বেড়াচ্চি সেখানে অভিভূতি-বিহ্বলতার মধ্যে আমাদের নিজের পরিচয় নেই। অথচ, পূর্ব্বেই বলেছি, নিজের ব্যক্তি-স্বরূপের সত্য পরিচয়ের ভিত্তির উপরেই আমরা সিদ্ধিকে গ'ড়ে তুল্‌তে পারি। পলিটিক্‌স্‌ ইকনমিক্‌সের

বাইরেও আমাদের গৌরব-লোক আছে একথা যদি আমরা জানি তবে সেইখানেই আমাদের ভবিষ্যৎকে আমরা সত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। বিশ্বাসহীনের মতো নিজের সত্যে অশ্রদ্ধা ক'রে হাওয়ায় হাওয়ায় আকাশ-কুসুম চাষ করবার চেষ্টা করলে ফল পাব না।

ভারতবর্ষ যে কোন্‌খানে সত্য, নিজের লোহার সিন্ধুকের মধ্যে তার দলিল সে রেখে যায়নি। ভারতবর্ষ যা দিতে পেরেছে তার দ্বারাই তার প্রকাশ। নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ যা তার কুলোয়নি তাতেই তার পরিচয়। অন্যকে সত্য ক'রে দিতে পারার মূলেই হচ্চে অন্যকে আপন ক'রে উপলব্ধি। আপন সীমার বাধা যে ভাঙ্‌তে পেরেছে, বাইরের দুর্গম ভৌগোলিক বাধাও সে লঙ্ঘন করতে পেরেছে। এইজন্যেই ভারতবর্ষের সত্যের ঐশ্বর্য্যকে জান্‌তে হোলে সমুদ্রপারে ভারতবর্ষের সুদূর দানের ক্ষেত্রে যেতে হয়। আজ ভারতবর্ষের ভিতরে ব'সে ধূলি-কলুষিত হাওয়ার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষকে যা দেখি তার চেয়ে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল ক'রে ভারতবর্ষের নিত্যকালের রূপ দেখতে পাব ভারতবর্ষের বাইরে থেকে।

চীনে গেলাম, দেখলাম জাত হিসাবে তারা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নাকে চোখে ভাষায় ব্যবহারে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো মিলই নেই। কিন্তু তাদের সঙ্গে এমন একটি গভীর আত্মীয়তার যোগ অনুভব করা গেল, যা ভারতবর্ষীয় অনেকের সঙ্গে করা কঠিন হয়ে উঠেছে। এই যোগ রাজশক্তির দ্বারা স্থাপন করা হয়নি, এই যোগ উদ্যত তরবারীর জোরেও নয়—এই যোগ কাউকে দুঃখ দিয়ে নয়, নিজে দুঃখস্বীকার ক'রে। অত্যন্ত পরের মধ্যেও যে-সত্যের বলে অত্যন্ত আত্মীয়তা স্বীকার করা সম্ভব হয় সেই সত্যের জোরেই চীনের সঙ্গে সত্য ভারতের চিরকালের যোগবন্ধন বাঁধা হয়েছে। এই সত্যের কথা

বিদেশী পলিটিক্সের ইতিহাসে স্থান পায়নি ব'লে আমরা এ'কে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করিনে। কিন্তু এ'কে বিশ্বাস করবার প্রমাণ ভারতের বাইরে সুদূর দেশে আজও রয়ে গেছে।

জাপানে প্রতিদিনের ব্যবহারে জাপানির সুগভীর ধৈর্য্য, আত্মসংযম, তার রসবোধের বিচিত্র পরিচয়ে যখন বিস্মিত হতেছিলাম তখন একথা কতবার শুনেছি যে, এইসকল গুণের প্রেরণা অনেকখানি বৌদ্ধধর্ম্মের যোগে ভারতবর্ষ থেকে এসেছে। সেই মূল প্রেরণা স্বয়ং ভারতবর্ষ থেকে আজ লুপ্তপ্রায় হোলো। সত্যের যে-বন্যা একদিন ভারতবর্ষের দুইকূল উপচিয়ে দেশে দেশে বয়ে গিয়েছিল, ভারতবর্ষের প্রবাহিনীতে আজ তা তলায় নেমে আস্‌ছে, কিন্তু তার জল-সঞ্চয় আজো দূরের নানা জলাশয়ে গভীর হয়ে আছে। এই কারণেই, সেইসকল জায়গা আধুনিক ভারতবাসীর পক্ষে তীর্থস্থান। কেননা ভারতবর্ষের ধ্রুব পরিচয় সেইসব জায়গাতেই।

মধ্যযুগে মুসলমান রাজশক্তির সঙ্গে হিন্দুদের ধর্ম্মবিরোধ ঘটেছিল। সেইসময়ে ধারাবাহিকভাবে সাধু-সাধকদের জন্ম হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অনেকে মুসলমান ছিলেন—যাঁরা আত্মীয়তার সত্যের দ্বারা ধর্ম্মবিরোধের মধ্যে সেতুবন্ধন করতে বসেছিলেন। তাঁরা পোলিটিশান ছিলেন না, প্রয়োজন-মূলক পোলিটিকাল ঐক্যকে তাঁরা সত্য ব'লে কল্পনাও করেননি। তাঁরা একেবারে সেই গোড়ায় গিয়েছিলেন যেখানে সকল মানুষের মিলনের প্রতিষ্ঠা ধ্রুব। অর্থাৎ তাঁরা ভারতের সেই মন্ত্রই গ্রহণ করেছিলেন যাতে আছে, যারা সকলকে আপনার মধ্যে এক ক'রে দেখে তারাই সত্য দেখে। তখনকার দিনের অনেক যোদ্ধা অনেক লড়াই করেছে, বিদেশী ছাঁচে-ঢালা ইতিহাসে তাঁদেরই নাম ও কীর্ত্তি লিখিত হয়েছে। এ-সব যোদ্ধারা আজ তাঁদের কৃত কীর্ত্তিস্তম্ভের ভগ্নশেষ

ধূলিস্তূপের মধ্যে মিশিয়ে আছেন—কিন্তু আজো ভারতের প্রাণ-স্রোতের মধ্যে সেইসকল সাধকের অমর বাণী-ধারা প্রবাহিত আছে। সেখান থেকে আমাদের প্রাণের প্রেরণা যদি আমরা নিতে পারি তাহোলে তারি জোরে আমাদের রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি কর্ম্মনীতি সবই বল পেয়ে উঠতে পারে।

সত্যবাণী যখন আমাদের প্রাণকে গভীর ভাবে উদ্বোধিত করে তখন সেই প্রাণ সকল দিকেই নিজের প্রকাশকে সার্থক করে। তখন সেই প্রাণ সৃষ্টির উদ্যমে পূর্ণ হয়ে ওঠে। চিত্তের উপর সত্যের সংঘাতের প্রমাণ হচ্চে এই সৃষ্টি-শক্তির সচেষ্টতা।

বৌদ্ধধর্ম্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন দেখি তারই প্রবর্ত্তনায় গুহা-গহ্বরে চৈত্যবিহারে বিপুল শক্তিসাধ্য শিল্পকলা অপর্য্যাপ্ত প্রকাশ পেয়ে গেছে, তখন বুঝতে পারি বৌদ্ধধর্ম্ম মানুষের অন্তরতম মনে এমন একটি সত্যবোধ জাগিয়েছে যা তার সমস্ত প্রকৃতিকে সফল করেছে, যা তার স্বভাবকে পঙ্গু করেনি। ভারতের বাহিরে ভারতবর্ষ যেখানে তার মৈত্রীর সোনার-কাঠি দিয়ে স্পর্শ করেছে সেখানেই শিল্পকলার কী প্রভূত ও পরমাশ্চর্য্য বিকাশ হয়েছে। শিল্পসৃষ্টি মহিমায় সে-সকল দেশ মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে।

অথচ সেখানকার লোকের সমজাতীয়দের দেখো, দেখবে, তারা নর-ঘাতক, তারা শিল্পসম্পদহীন। এমন সকল নিরালোক চিত্তে আলো জ্বাল্‌লে দয়াধর্ম্ম ত্যাগধর্ম্ম মৈত্রীধর্ম্মের মহতী বাণীর দ্বারা। সেখানকার লোকে সামান্য বেশভূষা ভাষার পরিবর্ত্তনের দ্বারা স্বাতন্ত্র্য পেয়েছে তা নয়; সৃষ্টি কর্‌বার সুপ্তশক্তি তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে—সে কী পরমাদ্ভুত সৃষ্টি। এইসকল দ্বীপেরই আশে পাশে আরো তো অনেক দ্বীপ আছে সেখানে আমরা “বরবুদর” দেখিনে কেন, সে-সব জায়গায়

আঙ্করবট-এর সমতুল্য বা সমজাতীয় কিছু নেই কেন। সত্যের জাগরণ-মন্ত্র যে সেখানে পৌঁছায়নি। মানুষকে অনুকরণে প্রবৃত্ত করার মধ্যে গৌরব নেই, কিন্তু মানুষের সুপ্ত শক্তিকে মুক্তিদান করার মতো এতবড়ো গৌরবের কথা আর কি কিছু আছে।

লোকে যখন দরিদ্র হয় তখন বাইরের দিকে গৌরব খুঁজে বেড়ায়। তখন কথা ব'লে গৌরব করতে চায়, তখন পুঁথি থেকে শ্লোক খুঁটে খুঁটে গৌরবের মাল-মসলা ভগ্নস্তূপ থেকে সঞ্চয় করতে থাকে। এমনি ক'রে সত্যকে ব্যবহার থেকে দূরে রেখে যদি গলার জোরে পুরাতন গৌরবের বড়াই করতে বসি তবে আমাদের ধিক্। অহঙ্কার করবার জন্যে সত্যের ব্যবহার সত্যের অবমাননা। আমার মনের একান্ত প্রার্থনা এই যে, সত্যবাণীকে কাঁধে ঝুলিয়ে জয়ঢাক ক'রে তাকে যেন বাজিয়ে না বেড়াই ; বাইরের লোককে চমক লাগাবার জন্যে যেন তাকে অলঙ্কার মাত্র না করি, যেন নিজেরই একান্ত আন্তরিক প্রয়োজনের জন্যেই তার সন্ধান ও সাধনা করতে পারি।

জাভায় যখন যাব তখন মনকে অহঙ্কারমুক্ত ক'রে সত্যের অমৃত-মন্ত্রের ক্রিয়াটি দেখে যেন নম্র হোতে পারি। সেই মৈত্রীর মহামন্ত্রটি নিজের মধ্যেই পাওয়া চাই তাহোলেই আমার চিত্তে যেখানে অরণ্য সেখানে মন্দির উঠবে, যেখানে মরুভূমি সেখানে সৌন্দর্যের রসবৃষ্টি হবে, জীবনের তপস্যা জয়যুক্ত হয়ে সার্থক হয়ে উঠবে।

১৩৩৪

হিন্দু-মুসলমান

(পত্র)

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগকে লিখিত

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

ঘোর বাদল নেমেছে। তাই আমার মনটা মানব-ইতিহাসের শতাব্দী-চিহ্নিত বেড়ার ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে। আকাশ-রঙ্গভূমিতে জলবাতাসের মাতনের যুগযুগান্তরবাহিত স্মৃতিস্পন্দন আজ আমার শিরায় শিরায় মেঘমল্লারের মীড় লাগিয়েছে। আমার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি কোথায় ভেসে গেল, সম্প্রতি আমি আমার সাম্‌নেকার ঐ সারবন্দী শালতাল মহুয়াছাতিমের দলে ভিড়ে গেছি। প্রাণরাজ্যে ওদের হোলো বনেদি বংশ, ওরা কোন্ আদিকালের রৌদ্রবৃষ্টির উত্তরাধিকার পুরোপুরি ভোগ করে চলেছে। ওরা মানুষের মতো আধুনিক নয়, সেইজন্যে ওরা চিরনবীন। মানবজাতির মধ্যে কেবল কবিরাই সভ্যতার অপব্যয়ের চোটে তাদের আদিকালের উত্তরাধিকার একেবারে ফুঁকে দিয়ে বসেনি। তাই তরুলতার আভিজাত্য কবিদের নিতান্ত মানুষ ব'লে অবজ্ঞা করে না। এই জন্যেই বর্ষে বর্ষে বর্ষার সময় আমাকে এমন করে উতলা করে দেয়, আমাকে সকল দায়িত্ববন্ধন থেকে বিবাগী ক'রে প্রাণের খেলাঘরে ডাক্‌তে থাকে—আমাদের মর্ম্মের মধ্যে যে ছেলেমানুষ আছে, যে হচ্চে আমাদের সবচেয়ে প্রাচীন পূর্ব্বজ, সেই আমার কর্ম্ম-শালাটি

দখল করে বসে। সেইজন্যেই বর্ষা পড়ে অবধি আমি হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সঙ্গে গাছপালার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে বসে গেছি, কাজকর্ম্ম ছেড়ে গান তৈরি করছি—সেই সূত্রে মানুষের মধ্যে আমি সব চেয়ে কম মানুষ হয়েছি—আমার মন ঘাসের মতো কাঁপছে, পাতার মতো ঝিল্‌মিল্‌ করছে। কালিদাস এই উপলক্ষ্যেই বলেছিলেন, "মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ।" অন্যথা-বৃত্তি হচ্চে মানববৃত্তির গণ্ডির বাইরের বৃত্তি। এই বৃত্তি আমাদের সেই সুদূরকালে নিয়ে যায় যখন প্রাণের খেলা চলছে, মনের মাষ্টারী সুরু হয় নি—আজ যেখানে ইস্কুলের মোটা থাম উঠেছে সেখানে যখন ঘাসের ফুলে ফুলে প্রজাপতি উড়ে উড়ে বেড়াচ্চে। যাই হোক, এই সময়টাতে ঘনমেঘে মধ্যাহ্ন ছায়া-বৃত, মাঠে মাঠে বাদল হাওয়া ভেঁপু বাজিয়ে চলেছে, আর ছোটো ছোটো চঞ্চল জলধারা ইস্কুলছাড়া ছাত্রীদের অকারণ হাসির মতো চারদিকে খিল্‌খিল্‌ করছে। আজ ৭ই আষাঢ় কৃষ্ণা একাদশী তিথি, আজ অম্বুবাচী আরম্ভ হোলো। নামটা সার্থক হয়েছে, সমস্ত প্রকৃতি আজ জলের ভাষায় মুখর হয়ে উঠ্‌ল। ঘনমেঘের চন্দ্রাতপের ছায়ায় আজ অম্বুবাচীর গীতিকবিতার আসর বসেছে—তৃণসভার গায়েনের দল ঝিল্লিরাও নিমন্ত্রণ পেয়েছে, আর তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে "মত্তদাদুরী।" এ আসরে আমার আসন পড়েনি যে তা মনেও কোরো না। মেঘের ডাকের জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে যাব, আমি এমন পাত্র নই। মেঘের পর মেঘের মতো আমারো গান চলেছে দিনের পর দিন—তার কোনো গুরুত্ব নেই, কোনো উদ্দেশ্য নেই—মেঘ যেমন "ধূমজ্যোতিঃ সলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ" সেও তেমনি নিরর্থক উপাদানে তৈরি। ঠিক যখন আমার জানলার ধারে বসে গুঞ্জন ধ্বনিতে গান ধরেছি—

আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে
আমার মনে ;
আমার ভাবনা যত উতল হোলো
অকারণে।

এমন সময় সমুদ্রপার হতে তোমার প্রশ্ন এল, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান কী? হঠাৎ মনে পড়ে গেল মানব সংসারে আমার কাজ আছে,—শুধু মেঘমল্লারে মেঘের ডাকের জবাব দিয়ে চল্‌বে না, মানব-ইতিহাসের যে সমস্ত মেঘমন্দ্র প্রশ্নাবলী আছে তারও উত্তর ভাবতে হবে। তাই অম্বুবাচীর আসর পরিত্যাগ করে বেরিয়ে আস্‌তে হোলো।

পৃথিবীতে দুটি ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্ম্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র :—সে হচ্চে খৃষ্টান আর মুসলমান-ধর্ম্ম। তারা নিজের ধর্ম্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্ম্মকে প্রতিহত করতে উদ্যত। এই-জন্যে তাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোনো উপায় নেই। খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে একটি সুবিধার কথা এই যে, তারা আধুনিক যুগের বাহন ; তাদের মন মধ্যযুগের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। ধর্ম্মমত একান্তভাবে তাদের সমস্ত জীবনকে পরিবেষ্টিত করে নেই। এইজন্যে অপরধর্ম্মাবলম্বীদেরকে তারা ধর্ম্মের বেড়ার দ্বারা সম্পূর্ণ বাধা দেয় না। য়ুরোপীয় আর খৃষ্টান এই দুটো শব্দ একার্থক নয়। "য়ুরোপীয় বৌদ্ধ" বা "য়ুরোপীয় মুসলমান" শব্দের মধ্যে স্বতোবিরুদ্ধতা নেই। কিন্তু ধর্ম্মের নামে যে-জাতির নামকরণ ধর্ম্মমতেই তাদের মুখ্য পরিচয়। "মুসলমান বৌদ্ধ" বা "মুসলমান খৃষ্টান" শব্দ স্বতই অসম্ভব। অপর পক্ষে হিন্দু জাতিও এক হিসাবে মুসলমানদেরই মতো। অর্থাৎ তারা ধর্ম্মের প্রাকারে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। বাহ্য-প্রভেদটা হচ্চে এই যে

অন্য ধর্মের বিরুদ্ধতা তাদের পক্ষে সকর্মক নয়—অহিন্দু সমস্ত ধর্মের সঙ্গে তাদের Non-violent non-cooperation। হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচারমূলক হওয়াতে তার বেড়া আরো কঠিন। মুসলমানধর্ম স্বীকার ক'রে মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সঙ্কীর্ণ। আহারে ব্যবহারে মুসলমান অপর-সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খিলাফৎ উপলক্ষ্যে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারে নি। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেছে। আমি যখন প্রথম আমার জমিদারী কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম, কাছারিতে মুসলমান প্রজাকে বস্‌তে দিতে হোলে জাজিমের একপ্রান্ত তুলে দিয়ে সেইখানে তাকে স্থান দেওয়া হোত। অন্য আচার অবলম্বীদের অশুচি ব'লে গণ্য করার মতো মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর কিছু নেই। ভারতবর্ষের এম্‌নি কপাল যে, এখানে হিন্দু মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে ;—ধর্ম্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয় আচারে প্রবল,—আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয় ধর্ম্মমতে প্রবল,—এক পক্ষের যে দিকে দ্বার খোলা, অন্যপক্ষের সেদিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিল্‌বে। এক সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীক পারসিক শক নানা জাতির অবাধ সমাগম ও সম্মিলন ছিল। কিন্তু মনে রেখো সে "হিন্দু" যুগের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে। হিন্দুযুগ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ,—এই যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকে সচেষ্টভাবে পাকা ক'রে গাঁথা হয়েছিল। দুর্লঙ্ঘ্য আচারের প্রাকার তুলে এ'কে দুষ্প্রবেশ্য ক'রে তোলা হয়েছিল। একটা কথা মনে ছিল না, কোনো প্রাণবান জিনিসকে একেবারে আটঘাট বন্ধ ক'রে সাম্‌লাতে গেলে তাকে মেরে ফেলা হয়। যাই

হোক মোট কথা হচ্চে, বিশেষ এক সময়ে বৌদ্ধযুগের পরে রাজপুত প্রভৃতি বিদেশীয় জাতিকে দলে টেনে বিশেষ অধ্যবসায়ে নিজেদেরকে পরকীয় সংস্রব ও প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করবার জন্যেই আধুনিক হিন্দুধর্ম্মকে ভারতবাসী প্রকাণ্ড একটা বেড়ার মতো করেই গড়ে তুলেছিল—এর প্রকৃতিই হচ্চে নিষেধ এবং প্রত্যাখ্যান। সকল প্রকার মিলনের পক্ষে এমন সুনিপুণ কৌশলে রচিত বাধা জগতে আর কোথাও সৃষ্টি হয় নি। এই বাধা কেবল হিন্দু মুসলমানে তা নয়। তোমার আমার মতো মানুষ যারা আচারে স্বাধীনতা রক্ষা করতে চাই, আমরাও পৃথক, বাধাগ্রস্ত। সমস্যা তো এই, কিন্তু সমাধান কোথায়। মনের পরিবর্ত্তনে, যুগের পরিবর্ত্তনে। য়ুরোপ সত্যসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন ক'রে মধ্যযুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁচেছে হিন্দুকে মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডীর বাইরে যাত্রা করতে হবে। ধর্ম্মকে কবরের মতো তৈরি করে তারি মধ্যে সমগ্র জাতিকে ভূতকালের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে নিহিত ক'রে রাখলে উন্নতির পথে চল্‌বার উপায় নেই, কারো সাঙ্গে কারো মেল্‌বার উপায় নেই। আমাদের মানস প্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনো রকমের স্বাধীনতাই পাব না। শিক্ষার দ্বারা সাধনার দ্বারা সেই মূলের পরিবর্ত্তন ঘটাতে হবে—ডানার চেয়ে খাঁচা বড়ো এই সংস্কারটাকেই বদ্‌লে ফেল্‌তে হবে তারপরে আমাদের কল্যাণ হোতে পারবে। হিন্দু মুসলমানের মিলন, যুগপরিবর্ত্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু একথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই; কারণ অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগপরিবর্ত্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ থেকে ডানা-মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব; যদি না আসি তবে "নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" ইতি ৭ই আষাঢ় ১৩২৯।

———

নারী

মানুষের সৃষ্টিতে নারী পুরাতনী। নরসমাজে নারীশক্তিকে বলা যেতে পারে আদ্যাশক্তি। এই সেই শক্তি যা জীবলোকে প্রাণকে বহন করে, প্রাণকে পোষণ করে।

পৃথিবীকে জীবের বাসযোগ্য করবার জন্যে অনেক যুগ গেছে ঢালাই পেটাই করা মিস্ত্রীর কাজে। সেটা আধখানা শেষ হোতে-না- হোতেই প্রকৃতি সুরু করলেন জীবসৃষ্টি, পৃথিবীতে এল বেদনা। প্রাণসাধনার সেই আদিম বেদনা প্রকৃতি দিয়েছেন নারীর রক্তে, নারীর হৃদয়ে। জীবপালনের সমস্ত প্রবৃত্তিজাল প্রবল ক'রে জড়িত করেছেন নারীর দেহ মনের তন্তুতে তন্তুতে। এই প্রবৃত্তি স্বভাবতই চিত্তবৃত্তির চেয়ে হৃদয়-বৃত্তিতেই স্থান পেয়েছে গভীর ও প্রশস্ত ভাবে। এই সেই প্রবৃত্তি, নারীর মধ্যে যা বন্ধনজাল গাঁথছে, নিজেকে ও অন্যকে ধরে রাখবার জন্যে প্রেমে স্নেহে সকরুণ ধৈর্য্যে। মানব-সংসারকে গড়ে তোলবার বেঁধে রাখবার এই আদিম বাঁধুনি। এই সেই সংসার যা সকল সমাজের সকল সভ্যতার মূলভিত্তি। সংসারের এই গোড়াকার বাঁধন না থাকলে মানুষ ছড়িয়ে পড়ত আকার-প্রকার-হীন বাষ্পের মতো; সংহত হয়ে কোথাও মিলনকেন্দ্র স্থাপন করতে পারত না। সমাজবন্ধনের এই প্রথম কাজটি মেয়েদের।

প্রকৃতির সমস্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া গভীর গোপন, তার স্বতঃপ্রবর্ত্তনা দ্বিধাবিহীন। সেই আদি প্রাণের সহজ প্রবর্ত্তন নারীর স্বভাবের মধ্যে। সেই জন্য নারীর স্বভাবকে মানুষ রহস্যময় আখ্যা দিয়েছে। তাই অনেক সময়ে অকস্মাৎ নারীর জীবনে যে সংবেগের উচ্ছ্বাস দেখতে পাওয়া যায় তা তর্কের অতীত—তা প্রয়োজন অনুসারে বিধিপূর্ব্বক খনন করা

জলাশয়ের মতো নয়, তা উৎসের মতো, যার কারণ আপন অহৈতুক রহস্যে নিহিত।

প্রেমের রহস্য, স্নেহের রহস্য অতি প্রাচীন; এবং দুর্গম। সে আপন সার্থকতার জন্যে তর্কের অপেক্ষা রাখে না। যেখানে তার সমস্যা সেখানে তার দ্রুত সমাধান চাই। তাই গৃহে নারী যেমনই প্রবেশ করেছে, কোথা থেকে অবতীর্ণ হোলো গৃহিণী, শিশু যেমনই কোলে এল, মা তখনই প্রস্তুত। জীবরাজ্যে পরিণত বুদ্ধি এসেছে অনেক পরে। সে আপন জায়গা খুঁজে পায় সন্ধান ক'রে, যুদ্ধ ক'রে। দ্বিধা মিটিয়ে চলতে তার সময় যায়। এই দ্বিধার সঙ্গে কঠিন দ্বন্দ্বেই সে সবলতা ও সফলতা লাভ করে। এই দ্বিধা-তরঙ্গের ওঠা-পড়ায় শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যায়, সাংঘাতিক ভ্রম জমে উঠে' বার বার মানুষের ইতিহাসকে দেয় পর্য্যস্ত ক'রে। পুরুষের সৃষ্টি বিনাশের মধ্যে তলিয়ে যায়, নূতন ক'রে বাঁধতে হয় তার কীর্ত্তির ভূমিকা। পাল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে পরীক্ষায় পুরুষের কর্ম্ম কেবলই দেহ পরিবর্ত্তন করে। অভিজ্ঞতার এই নিত্য পরিক্রমণে যদি তাকে অগ্রসর করে তবে সে বেঁচে যায়, যদি ত্রুটি-সংশোধনের অবকাশ না পায় তবে জীবন-বাহনের ফাটল বড়ো হয়ে উঠতে উঠতে তাকে টানে বিলুপ্তির কবলের মধ্যে। পুরুষের রচিত সভ্যতার আদিকাল থেকে এই রকম ভাঙা-গড়া চলছে। ইতিমধ্যে নারীর মধ্যে প্রেয়সী, নারীর মধ্যে জননী প্রকৃতির দৌত্যে স্থির প্রতিষ্ঠিত হয়ে আপন কাজ ক'রে চলেছে। এবং প্রবল আবেগের সংঘর্ষে আপন সংসারের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে অগ্নিকাণ্ড করেও আসছে। সেই প্রলয়াবেগ যেন বিশ্বপ্রকৃতির প্রলয়লীলারই মতো, ঝড়ের মতো, দাবদাহের মতো, আকস্মিক, আত্মঘাতী।

পুরুষ তার আপন জগতে বারে বারে নূতন আগন্তুক। আজ পর্য্যন্ত

কতবার সে গ'ড়ে তুলেছে আপন বিধি বিধান। বিধাতা তাকে তার জীবনের পথ বাঁধিয়ে দেন নি ; কত দেশে কত কালে তাকে আপন পথ বানিয়ে নিতে হোলো। এক কালের পথ বিপথ হয়ে উঠল আর এক কালে, উল্‌টিয়ে গেল তার ইতিহাস। করলে সে অন্তর্ধান।

নব নব সভ্যতার উলটপালটের ভিতর দিয়ে নারীর জীবনের মূলধারা চলেছে এক প্রশস্ত পথে। প্রকৃতি তাকে যে হৃদয়-সম্পদ দিয়েছেন নিত্য কৌতূহলপ্রবণ বুদ্ধির হাতে তাকে নূতন নূতন অধ্যবসায়ে পরখ করতে দেওয়া হয় নি। নারী পুরাতনী।

পুরুষকে নানা দ্বারে নানা আপিসে উমেদারিতে ঘোরায়। অধিকাংশ পুরুষই জীবিকার জন্যে এমন কাজ মানতে বাধ্য হয় যার প্রতি তার ইচ্ছার তার ক্ষমতার সহজ সম্মতি নেই। কঠিন পরিশ্রমে নানা কাজের শিক্ষা তার করা চাই—তাতে বারো আনা পুরুষই যথোচিত সফলতা পায় না। কিন্তু গৃহিণীরূপে জননীরূপে মেয়েদের যে কাজ, সে তার আপন কাজ, সে তার স্বভাবসঙ্গত।

নানা বিঘ্ন কাটিয়ে অবস্থার প্রতিকূলতাকে বীর্য্যের দ্বারা নিজের অনুগত ক'রে পুরুষ মহত্ত্ব লাভ করে। সেই অসাধারণ সার্থকতায় উত্তীর্ণ পুরুষের সংখ্যা অল্প। কিন্তু হৃদয়ের রসধারায় আপন সংসারকে শস্যশালী ক'রে তুলেছে এমন মেয়েকে প্রায় দেখা যায় ঘরে ঘরে। প্রকৃতির কাছ থেকে তারা পেয়েছে অশিক্ষিতপটুত্ব, মাধুর্য্যের ঐশ্বর্য্য তাদের সহজে লাভ করা। যে মেয়ের স্বভাবের মধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সহজ রসটি না থাকে কোনো শিক্ষায় কোনো কৃত্রিম উপায়ে সংসারক্ষেত্রে সে সার্থকতা পায় না।

যে সম্বল অনায়াসে পাওয়া যায় তার বিপদ আছে। বিপদের এক কারণ অন্যের পক্ষে তা লোভনীয়। সহজ ঐশ্বর্য্যবান দেশকে বলবান

নিজের একান্ত প্রয়োজনে আত্মসাৎ ক'রে রাখ্‌তে চায়। অনুর্ব্বর দেশের পক্ষে স্বাধীন থাকা সহজ। যে পাখীর ডানা সুন্দর ও কণ্ঠস্বর মধুর তাকে খাঁচায় বন্দী ক'রে মানুষ গর্ব্ব অনুভব করে; তার সৌন্দর্য্য সমস্ত অরণ্যভূমির এ-কথা সম্পত্তি-লোলুপরা ভুলে যায়। মেয়েদের হৃদয়-মাধুর্য্য ও সেবা-নৈপুণ্যকে পুরুষ সুদীর্ঘকাল আপন ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে কড়া পাহারায় বেড়া দিয়ে রেখেছে। মেয়েদের নিজের স্বভাবেই বাঁধন-মানা প্রবণতা আছে, সেই জন্যে এটা সর্ব্বত্রই এত সহজ হয়েছে।

বস্তুত জীবপালনের কাজটাই ব্যক্তিগত। সেটা নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বের কোঠায় প'ড়ে না—সেই কারণে তার আনন্দ বৃহৎ তত্ত্বের আনন্দ নয়; এমন কি মেয়েদের নৈপুণ্য যদিও বহন করেছে রস, কিন্তু সৃষ্টির কাজে আজও যথেষ্ট সার্থক হয় নি।

তার বুদ্ধি, তার সংস্কার, তার আচরণ নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার দ্বারা বহু যুগ থেকে প্রভাবান্বিত। তার শিক্ষা তার বিশ্বাস, বাহিরের বৃহৎ অভিজ্ঞতার মধ্যে সত্যতা লাভ করবার সম্পূর্ণ সুযোগ পায় নি। এই জন্যে নির্ব্বিচারে সকল অপদেবতাকেই সে অমূলক ভয় ও অযোগ্য ভক্তির অর্ঘ্য দিয়ে আসছে। সমস্ত দেশ জুড়ে যদি দেখ্‌তে পাই তবে দেখা যাবে এই মোহমুগ্ধতার ক্ষতি কত সর্ব্বনেশে, এর বিপুল ভার বহন ক'রে উন্নতির দুর্গম পথে এগিয়ে চলা কত দুঃসাধ্য। আবিলবুদ্ধি মূঢ়মতি পুরুষ দেশে যে কম আছে তা নয়, তারা শিশুকাল থেকে মেয়ের হাতে গড়া এবং তারাই মেয়েদের প্রতি সবচেয়ে অত্যাচারী। দেশে এই যে সব আবিল মনের কেন্দ্রগুলি দেখ্‌তে দেখ্‌তে চারিদিকে গড়ে উঠেছে, মেয়েদের অন্ধ বিচার-বুদ্ধির উপরেই তাদের প্রধান নির্ভর। চিত্তের বন্দীশালা এমনি ক'রে দেশে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে, এবং প্রতিদিন তার ভিত্তি হয়ে উঠ্‌ছে দৃঢ়।

এদিকে প্রায় পৃথিবীর সকল দেশেই মেয়েরা আপন ব্যক্তিগত সংসারের গণ্ডি পেরিয়ে আসছে। আধুনিক এশিয়াতেই তার লক্ষণ দেখ্‌তে পাই। তার প্রধান কারণ সর্ব্বত্রই সীমানা-ভাঙার যুগ এসে পড়েছে। যে-সকল দেশ আপন আপন ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক প্রাচীরের মধ্যে একান্ত বদ্ধ ছিল তাদের সেই বেড়া আজ আর তাদের তেমন ক'রে ঘিরে রাখ্‌তে পারে না,—তারা পরস্পর পরস্পরের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। স্বতই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়েছে, দৃষ্টিসীমা চিরাভ্যস্ত দিগন্ত পেরিয়ে গেছে। বাহিরের সঙ্গে সংঘাতে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটছে, নূতন নূতন প্রয়োজনের সঙ্গে আচার-বিচারের পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হয়ে পড়ছে।

আমাদের বাল্যকালে ঘরের বাইরে যাতায়াতের আবশ্যকে মেয়েদের ছিল পাল্‌কির যুগ। মানী ঘরে সেই পাল্‌কির উপরে পড়ত ঘেটাটোপ। বেথুন স্কুলে যে মেয়েরা সব-প্রথমে ভর্ত্তি হয়েছিলেন তার মধ্যে অগ্রণী ছিলেন আমার বড়োদিদি। তিনি দ্বারখোলা পাল্‌কিতে ইস্কুলে যেতেন, সেদিনকার সম্ভ্রান্তবংশের আদর্শকে সেটা অল্প পীড়া দেয় নি। সেই এক-বস্ত্রের দিনে সেমিজ-পরাটা নির্লজ্জতার লক্ষণ ছিল। শালীনতার প্রচলিত রীতি রক্ষা ক'রে রেলগাড়িতে যাতায়াত করা সহজ ব্যাপার ছিল না।

আজ সেই ঢাকা পাল্‌কির যুগ বহু দূরে চলে গেছে। মৃদুপদে যায় নি, দ্রুতপদেই গেছে। বাইরের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ পরিবর্ত্তন আপনিই ঘটেছে—এ নিয়ে কাউকে সভাসমিতি করতে হয় নি। মেয়েদের বিবাহের বয়স দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল, সেও হয়েছে সহজে। প্রাকৃতিক কারণে নদীতে জলধারার পরিমাণ যদি বেড়ে যায় তবে তার তটভূমির সীমা আপনিই হটে যেতে থাকে। মেয়েদের জীবনে আজ সকল দিক থেকেই স্বতই তার তটের সীমা দূরে চলে যাচ্ছে। নদী উঠছে মহানদী হয়ে।

এই যে বাহিরের দিকে ব্যবহারের পরিবর্ত্তন এ তো বাইরেই থেকে যায় না। অন্তর-প্রকৃতির মধ্যেও এর কাজ চলতে থাকে। মেয়েদের যে মনোভাব বদ্ধ সংসারের উপযোগী, মুক্ত সংসারে সে তো অচল হয়ে থাকতে পারে না। আপনিই জীবনের প্রশস্ত ভূমিকায় দাঁড়িয়ে তার মন বড়ো ক'রে চিন্তা করতে বিচার করতে আরম্ভ করে। তার পূর্ব্বতন সংস্কারগুলিকে যাচাই করার কাজ আপনিই সুরু হোতে থাকে। এই অবস্থায় সে নানা রকম ভুল করতে পারে, কিন্তু বাধায় ঠেকতে ঠেকতে সে ভুল উত্তীর্ণ হোতে হবে। সঙ্কীর্ণ সীমায় পূর্ব্বে মন যে-রকম ক'রে বিচার করতে অভ্যস্ত ছিল সে অভ্যাস আঁকড়ে থাকলে চারিদিকের সঙ্গে পদে পদে অসামঞ্জস্য আনতে থাকবে। এই অভ্যাস-পরিবর্ত্তনে দুঃখ আছে বিপদও আছে, কিন্তু সেই ভয় ক'রে আধুনিক কালের স্রোতকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।

গৃহস্থালির ছোটো পরিধির মধ্যে মেয়েদের জীবন যখন আবদ্ধ ছিল তখন মেয়েলি মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি নিয়ে সহজেই তাদের কাজ চলে যেত। এজন্যে তাদের বিশেষ শিক্ষার দরকার ছিল না ব'লেই একদিন স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে এতই বিরুদ্ধতা এবং প্রহসনের সৃষ্টি হয়েছে। তখন পুরুষেরা নিজে যে-সব সংস্কারকে উপেক্ষা করত, যে-সব মত বিশ্বাস করত না, যে-সকল আচরণ পালন করত না, মেয়েদের বেলায় সেগুলিকে সযত্নে প্রশ্রয় দিয়েছে। তার মূলে তার সেই মনোবৃত্তি ছিল, যে-মনোবৃত্তি একেশ্বর শাসনকর্ত্তাদের। তারা জানে অজ্ঞানের, অন্ধ সংস্কারের আবহাওয়ায় যথেচ্ছ-শাসনের সুযোগ রচনা করে, মনুষ্যোচিত স্বাধিকার বিসর্জ্জন দিয়েও সন্তুষ্টচিত্তে থাকবার পক্ষে এই মুগ্ধ অবস্থাই অনুকূল অবস্থা। আমাদের দেশের অনেক পুরুষের মনে আজও এই ভাব আছে। কিন্তু কালের সঙ্গে সংগ্রামে তাদের হার মানতেই হবে।

কালের প্রভাবে মেয়েদের জীবনের ক্ষেত্র এই যে স্বতই প্রসারিত হয়ে চলেছে, এই যে মুক্তসংসারের জগতে মেয়েরা আপনিই এসে পড়ছে, এত ক'রে আত্মরক্ষা এবং আত্মসম্মানের জন্যে তাদের বিশেষ ক'রে বুদ্ধির চর্চ্চা বিদ্যার চর্চ্চা একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠল। তাই দেখতে দেখতে এর বাধা দূর হয়ে চলেছে। নিরক্ষরতার লজ্জা আজ ভদ্রমেয়েদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো লজ্জা; পূর্ব্বকালে মেয়েদের ছাতা জুতো ব্যবহারের যে লজ্জা ছিল এ তার চেয়ে বেশি; বাটনা-বাটা কোটনা-কোটা সম্বন্ধে অনৈপুণ্যের অখ্যাতি তার কাছে কিছুই নয়। অর্থাৎ গার্হস্থ্য-বাজারদরেই মেয়েদের দর, এমন কথা আজকের দিনে বিয়ের বাজারেও ষোলো আনা খাটছে না। যে-বিদ্যার মূল্য সার্ব্বভৌমিক, যা আশু প্রয়োজনের ঐকান্তিক দাবী ছাড়িয়ে চলে যায়, আজ পাত্রীর মহার্ঘতা যাচাইয়ের জন্যে অনেক পরিমাণে সেই বিদ্যার সন্ধান নেওয়া হয়।

এই প্রণালীতেই আমাদের দেশের আধুনিক মেয়েদের মন ঘরের সমাজ ছাড়িয়ে প্রতিদিন বিশ্বসমাজে উত্তীর্ণ হচ্চে।

প্রথম যুগে একদিন পৃথিবী আপন তপ্ত নিঃশ্বাসের কুয়াশায় অবগুণ্ঠিত ছিল, তখন বিরাট আকাশের গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে আপন স্থান সে উপলব্ধি করতেই পারে নি। অবশেষে একদিন তার মধ্যে সূর্য্যকিরণ প্রবেশের পথ পেল। তখনই সেই মুক্তিতে আরম্ভ হোলো পৃথিবীর গৌরবের যুগ। তেমনিই একদিন আর্দ্র হৃদয়ালুতার ঘন বাষ্পাবরণ আমাদের মেয়েদের চিত্তকে অত্যন্ত কাছের সংসারে আবিষ্ট ক'রে রেখেছিল। আজ তা ভেদ ক'রে সেই আলোকরশ্মি প্রবেশ করছে, যা মুক্ত আকাশের, যা সর্ব্বলোকের। বহু দিনের যে-সব সংস্কার-জড়িমাজালে তাদের চিত্ত আবদ্ধ বিজড়িত ছিল, যদিও আজ তা সম্পূর্ণ কেটে যায়নি

তবু তার মধ্যে অনেকখানি ছেদ ঘটেছে। কতখানি যে, তা আমাদের মতো প্রাচীন বয়স যাদের তারাই জানে।

আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মেয়েরা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন এই বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব তাদের স্বীকার করতেই হবে, নইলে তাদের লজ্জা, তাদের অকৃতার্থতা।

আমার মনে হয় পৃথিবীতে নূতন যুগ এসেছে। অতি দীর্ঘকাল মানবসভ্যতার ব্যবস্থা-ভার ছিল পুরুষের হাতে। এই সভ্যতার রাষ্ট্রতন্ত্র, অর্থনীতি, সমাজশাসনতন্ত্র গড়েছিল পুরুষ। মেয়েরা তার পিছনে প্রকাশহীন অন্তরালে থেকে কেবল করেছিল ঘরের কাজ। এই সভ্যতা হয়ে ছিল একঝোঁকা। এই সভ্যতায় মানবচিত্তের অনেকটা সম্পদের অভাব ঘটেছে; সেই সম্পদ মেয়েদের হৃদয়ভাণ্ডারে কৃপণের জিম্মায় আটকা পড়ে ছিল। আজ ভাণ্ডারের দ্বার খুলেছে।

তরুণ যুগের মানুষহীন পৃথিবীতে পঙ্কস্তরের উপর যে অরণ্য ছিল বিস্তৃত, সেই অরণ্য বহু লক্ষ বৎসর ধ'রে প্রতিদিন সূর্য্যতেজ সঞ্চয় ক'রে এসেছে আপন বৃক্ষরাজির মজ্জায়। সেই সব অরণ্য ভূগর্ভে তলিয়ে গিয়ে রূপান্তরিত অবস্থায় বহুযুগ প্রচ্ছন্ন ছিল। সেই পাতালের দ্বার যেদিন উদ্‌ঘাটিত হোলো, অকস্মাৎ মানুষ শত শত বৎসরের অব্যবহৃত সূর্য্যতেজকে পাথুরে কয়লার আকারে লাভ করল আপন কাজে, তখনি নূতন বল নিয়ে বিশ্ববিজয়ী আধুনিক যুগ দেখা দিল।

একদিন এ যেমন ঘটেছে সভ্যতার বাহিরের সম্পদ নিয়ে, আজ তেমনই অন্তরের সম্পদের একটি বিশেষ খনিও আপন সঞ্চয়কে বাহিরে প্রকাশ করল। ঘরের মেয়েরা প্রতিদিন বিশ্বের মেয়ে হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই উপলক্ষে মানুষের সৃষ্টিশীল চিত্তে এই যে নূতন চিত্তের যোগ, সভ্যতায় এ আর-একটি তেজ এনে দিলে। আজ এর ক্রিয়া প্রত্যক্ষে

অপ্রত্যক্ষে চলছে। একা পুরুষের গড়া সভ্যতায় সে ভারসামঞ্জস্যের অভাব প্রায়ই প্রলয় বাধাবার লক্ষণ আনে, আজ আশা করা যায় ক্রমে সে যাবে সাম্যের দিকে। প্রচণ্ড ভূমিকম্প বার বার ধাক্কা লাগাচ্চে পুরাতন সভ্যতার ভিত্তিতে। এই সভ্যতায় বিপত্তির কারণ অনেক দিন থেকে সঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ছিল অতএব ভাঙনের কাজ কেউ বন্ধ করতে পারবে না। একটি মাত্র বড়ো আশ্বাসের কথা এই যে, কল্পান্তের ভূমিকায় নূতন সভ্যতা গড়বার কাজে মেয়েরা এসে দাঁড়িয়েছে—প্রস্তুত হচ্চে তারা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই। তাদের মুখের উপর থেকেই যে কেবল ঘোমটা খসল তা নয়—যে-ঘোমটার আবরণে তারা অধিকাংশ জগতের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল সেই মনের ঘোমটাও তাদের খসছে। যে-মানবসমাজে তারা জন্মেছে, সেই সমাজ আজ সকল দিকেই সকল বিভাগেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল তাদের দৃষ্টির সম্মুখে। এখন অন্ধসংস্কারের কারখানায় গড়া পুতুলগুলো নিয়ে খেলা করা আর তাদের সাজবে না। তাদের স্বাভাবিক জীবপালিনী বুদ্ধি কেবল ঘরের লোককে নয় সকল লোককে রক্ষার জন্মে কায়মনে প্রবৃত্ত হবে।

আদিকাল থেকে পুরুষ আপন সভ্যতা-দুর্গের ইঁটগুলো তৈরি করেছে নিরন্তর নরবলির রক্তে; তারা নির্ম্মমভাবে কেবলই ব্যক্তিবিশেষকে মেরেছে কোনো একটা সাধারণ নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে; ধনিকের ধন উৎপন্ন হয়েছে শ্রমিকের প্রাণ শোষণ ক'রে; প্রতাপশালীর প্রতাপের আগুন জ্বালানো রয়েছে অসংখ্য দুর্ব্বলের রক্তের আহুতি দিয়ে, রাষ্ট্র-স্বার্থের রথ চালিয়েছে প্রজাদের তাতে রজ্জুবদ্ধ ক'রে। এ সভ্যতা ক্ষমতার দ্বারা চালিত, এতে মমতার স্থান অল্প। শিকারের আমোদকে জয়যুক্ত ক'রে এ সভ্যতা বধ ক'রে এসেছে অসংখ্য নিরীহ নিরুপায় প্রাণী; এ সভ্যতায় জীবজগতে মানুষকে সকলের চেয়ে নিদারুণ ক'রে তুলেছে

মানুষের পক্ষে এবং অন্য জীবের পক্ষে। বাঘের ভয়ে বাঘ উদ্বিগ্ন হয় না, কিন্তু এ সভ্যতায় পৃথিবী জুড়ে মানুষের ভয়ে মানুষ কম্পান্বিত। এই রকম অস্বাভাবিক অবস্থাতেই সভ্যতা আপন মুষল আপনি প্রসব করতে থাকে। আজ তাই সুরু হোলো। সঙ্গে সঙ্গে ভীত মানুষ শান্তির কল বানাবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত কিন্তু কলের শান্তি তাদের কাজে লাগবে না, শান্তির উপায় যাদের অন্তরে নেই। ব্যক্তি-হননকারী সভ্যতা টিকতে পারে না।

সভ্যতা-সৃষ্টির নূতন কল্প আশা করা যাক। এ আশা যদি রূপ ধারণ করে তবে এবারকার এই সৃষ্টিতে মেয়েদের কাজ পূর্ণ পরিমাণে নিযুক্ত হবে সন্দেহ নেই। নবযুগের এই আহ্বান আমাদের মেয়েদের মনে যদি পৌঁছে থাকে তবে তাঁদের রক্ষণশীল মন যেন বহু যুগের অস্বাস্থ্যকর আবর্জ্জনাকে একান্ত আসক্তির সঙ্গে বুকে চেপে না ধরে। তাঁরা যেন মুক্ত করেন হৃদয়কে, উজ্জ্বল করেন বুদ্ধিকে, নিষ্ঠা প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপস্যায়। মনে রাখেন, নির্ব্বিচার অন্ধরক্ষণশীলতা সৃষ্টিশীলতার বিরোধী। সামনে আসছে নূতন সৃষ্টির যুগ। সেই যুগের অধিকার লাভ করতে হোলে মোহমুক্ত মনকে সর্ব্বতোভাবে শ্রদ্ধার যোগ্য করতে হবে, অজ্ঞানের জড়তা এবং সকল প্রকার কাল্পনিক ও বাস্তবিক ভয়ের নিম্নগামী আকর্ষণ থেকে টেনে আপনাকে উপরের দিকে তুলতে হবে। ফললাভের কথা পরে আসবে—এমন কি, না আসতেও পারে, কিন্তু যোগ্যতা লাভের কথা সর্ব্বাগ্রে।

২ অক্টোবর, ১৯৩৬

শান্তিনিকেতন

[নিখিলবঙ্গ মহিলা কর্ম্মীসম্মিলন উপলক্ষ্যে লিখিত]